ধর্ম্মজীবন

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত

উপদেশাবলী।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক

বিবৃত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রবাসী কার্য্যালয়,
২১০।৩।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

১৩২০।

কলিকাতা।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিসন প্রেসে

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভূমিকা।

১৮৯৫ সাল হইতে কয়েক বৎসর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলাম তাহার অধিকাংশ পূর্ব্বে "ধর্ম্মজীবন" নামে নানা খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এবারে যে কয়েক খণ্ডে শেষ হইবে, তাহার প্রথম খণ্ড এই। এখন আমার শরীর রুগ্ন ও ভগ্ন, তাহা না হইলে আরও সন্তোষজনক রূপে মুদ্রিত করিতে পারিতাম; তাহা হইল না। ইতি

১০ই অক্টোবর, ১৯১৩ }
কলিকাতা। }

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

সূচি পত্র।

ধর্ম্মজীবন।

তমেব বদত্বাতিমৃত্যুমেতি।

উপনিষদে এই বচনটী আছে, তাহা ঃ—

"যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ।
যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"।

অর্থ—"যে তেজোময়, অমৃতময়, সর্ব্বান্তর্য্যামী পুরুষ আকাশে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছেন, যে তেজোময়, অমৃতময়, সর্ব্বান্তর্য্যামী পুরুষ আত্মাতে ওতপ্রোত ভাবে বাস করিতেছেন, তাঁহাকে জানিয়াই মানব মৃত্যুকে অতিক্রম করে, অর্থাৎ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়, মুক্তির অন্য পথ নাই।"

জগতে মানবের মুক্তি লাভের যত প্রকার পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে জ্ঞানমার্গ তন্মধ্যে একটী প্রধান। উপনিষদ্‌কার ঋষিগণ এই পথাবলম্বী ছিলেন। এই পথাবলম্বিগণ বলিয়া থাকেন, যে প্রকৃত জ্ঞানই মোক্ষের সোপান; জীব অজ্ঞতা-বশতঃ অনাত্মাকে আত্মজ্ঞান, ও অনিত্যকে নিত্য জ্ঞান করিয়া সংসার-বন্ধনে বদ্ধ হয়। প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিলে, নিত্যানিত্য-বিবেক উজ্জ্বল হয়, মানব সকল প্রকার আসক্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে, এবং অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। এই জ্ঞানমার্গাবলম্বিদিগের ভাব কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

এই দেহ জড়জগৎকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছে,

জড় জগতের দ্বারা বেষ্টিত আছে, এবং জড় জগতের দ্বারা পোষিত হইতেছে। জড়কে পরিত্যাগ করিয়া এ দেহ থাকিতে পারে না; ইহার গতিবিধি, চেষ্টা, প্রভৃতি সমুদায় জড়েরই সাহায্যে। গমনে বায়ুমণ্ডলের প্রয়োজন; শ্রবণে আকাশের প্রয়োজন; দর্শনে আলোকমণ্ডলের প্রয়োজন; এইরূপ সর্ব্ব-বিষয়েই জড়জগৎ এই দেহের আশ্রয়, পোষক, ও প্রতিপালক। জড়জগৎ যে স্বরূপতঃ কি তাহা আমরা অবগত নহি। রূপরসগন্ধস্পর্শাত্মক ইন্দ্রিয়-সংস্কার সকলের অতীত জড় বলিয়া কিছু আছে কি না, তাহা জ্ঞানিগণের আলোচনার বিষয়, এবং এ বিষয়ে তাঁহারা একমত নহেন। জড়ের স্বরূপ ও প্রকৃতি যাহাই হউক, জড়ের সত্তা ও গুণাবলী আমাদের জ্ঞানে সর্ব্বদাই প্রতিভাত হইতেছে, এবং আমাদিগকে সংসারের কার্য্যসাধনে নিরন্তর সহায়তা করিতেছে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা জড়জগৎ নিরন্তর আমাদের মনের নিকট অভিব্যক্ত হইতেছে।

দেহ যেমন জড়জগৎকে আশ্রয় করিয়া আছে, এবং জড় জগতের দ্বারাই পোষিত হইতেছে, আত্মাও সেইরূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া আছে এবং তাহার দ্বারা পোষিত হইতেছে। জড় যেমন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের নিকট অভিব্যক্ত হইতেছে, পরমাত্মাও তেমনি আমাদের অন্তরিন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসিয়া জীবাত্মার নিকট অভিব্যক্ত হইতেছেন।

ভৌতিক পদার্থ সকল সমভাবে সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অভিব্যক্ত হয় না। কোনও কোনও পদার্থ একমাত্র ইন্দ্রিয়ের

দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, কোনও কোনও পদার্থ ইন্দ্রিয়দ্বয়ের সংস্পর্শে আসিয়া অভিব্যক্ত হয়, ইত্যাদি। যথা, পঞ্চভূতের মধ্যে ক্ষিতি, —রূপ, রস, গন্ধ, ও স্পর্শের দ্বারা আমাদের চিত্তের নিকটে অভিব্যক্ত হয়; অপ্,—রূপ, রস, ও স্পর্শের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়; তেজ,—রূপ ও স্পর্শের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, মরুৎ, স্পর্শের দ্বারা, আকাশ, শব্দের দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। সেইরূপ পরমাত্মা আমাদের আত্মার চারি ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের নিকট অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। সে চারি ইন্দ্রিয়, জ্ঞান, প্রীতি, বিবেক ও ইচ্ছা-শক্তি। এই চারিদ্বার দিয়াই সেই স্বপ্রকাশ পরম পুরুষ আমাদিগের নিকটে আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

এখানে এক গুরুতর প্রশ্ন উঠিতেছে—পরমাত্মা আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারেন কি না? কোন কোনও পণ্ডিতের মত এই ঃ—পরমাত্মসত্তা ও পরমাত্মস্বরূপ আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। যেমন যদি কেহ বলে, বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধের অতিরিক্ত আর একটী পরিসর আছে, তবে যেমন তাহাকে বলিতে হয়, যে যদি এরূপ কোনও পরিসর থাকে, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই, কারণ তাহার গ্রহণোপযোগী কোনও ইন্দ্রিয় নাই; সেইরূপ পরমাত্মার সম্বন্ধেও এই কথা বলিতে হয়—যদি এরূপ কেহ থাকেন, থাকিতে পারেন, কিন্তু আমাদের তাঁহাকে জানিবার কোনও উপায় নাই। তাঁহারা বলেন, আমাদের আত্মজ্ঞান সকল জ্ঞানের ভূমি; আমরা আত্মাতে যাহা দেখি না, তাহা কি প্রকারে অন্যত্র জানিতে

পারি? আমাদের আত্মজ্ঞান পরিমিতের জ্ঞান, এই পরিমিত জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া অপরিমিত ও অনন্তকে কি প্রকারে জানিতে পারি? তবে বলিতে হয়, তিনি অনন্ত ব্রহ্ম নহেন, কিন্তু আমাদের প্রকৃতির অনুরূপ স্বরূপ-সম্পন্ন আর এক মহাশক্তিশালী জীব। এ কথা স্বীকার্য্য, তাঁহার স্বরূপের সহিত আমাদের স্বরূপের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য না থাকিলে, আমরা তাঁহাকে জানিতে পারিতাম না, সাদৃশ্য আছে বলিয়াই জানিবার পথ আছে; কিন্তু এই সাদৃশ্যে তাঁহার অনন্তত্বের কোন ব্যাঘাত হয় না, বরং ইহাতেই প্রেম ভক্তি সম্ভব হইয়াছে।

যাহা হউক এই মহাতর্কারণ্যে প্রবিস্ট না হইয়াও সংক্ষেপে এই কথা বলা যাইতে পারে, যে আমরা দুই প্রকারে ব্রহ্মসত্তার ধ্যান করিতে পারি। প্রথম, ইহা আমরা সকলেই অনুভব করি, যে এই ব্রহ্মাণ্ডেই ব্রহ্মসত্তার ও ব্রহ্মশক্তির পরিসমাপ্তি নহে। আমাদের একটী সঙ্গীতে আছে, "প্রকাশে জগৎ তাঁর মহিমার কণিকা।" ইহা অতীব সত্য কথা। ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার সত্তা ও শক্তির অতি ক্ষুদ্রতম অংশই প্রকাশ করিতেছে। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা ব্যক্ত তাহা আমাদের নিকট ব্রহ্মসত্তা বা লীলাময় ঈশ্বর, আর যে ব্রহ্মসত্তা ব্রহ্মাণ্ডের অতীত ও অপ্রকট তাহাকে ব্রহ্মচৈতন্য বলা যাউক। এই ব্রহ্মচৈতন্য আমাদের বোধাতীত, আমরা ব্রহ্মাণ্ডবিহারী লীলাময় ঈশ্বরকেই জানিতেছি এবং তিনিই আমাদের উপাসনার গম্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, অসীম নভোমণ্ডলের যে অংশ আমাদের দৃষ্টিরেখার অন্তর্ভুত, তাহাই আমা-

দের জ্ঞানের বিচারাধীন, আর যে অংশ আমাদের দৃষ্টিরেখার অতীত, তাহা ইহার বহির্ভূত।

তবে সৃষ্টিলীলাতে যিনি অভিব্যক্ত তিনিই আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত। যেমন পরিমিত জড় বস্তুর আশ্রয় ব্যতীত দূরত্ব জ্ঞান হয় না, অসীম আকাশে দুইটী পরিমিত পদার্থকে দুইটী বিন্দুস্বরূপ না ধরিলে যেমন দূরত্বের পরিমাণ হয় না, তেমনি অসীম সত্তাসাগরে প্রকট লীলার সাহায্য না লইলে, তাঁহার স্বরূপের পরিচয় হয় না।

আবার এই জ্ঞান সম্বন্ধে আর একটী কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। "বোধ" ও "ধারণা" এই উভয়ের মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। এরূপ অনেক বিষয় আছে, যাহার বোধ মাত্র হয় কিন্তু ধারণা হয় না। ধারণা শব্দের অর্থ মনের সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা। ইহা ক্ষুদ্রে ভিন্ন সম্ভব নহে। আমরা সকলেই শুনিয়াছি, পৃথিবীর পরিধি এগার হাজার ক্রোশ। এই এগার হাজার ক্রোশ কিরূপ তাহা কি কেহ ধারণা করিতে পারেন? অর্থাৎ তাহার একটী সমগ্র ছবি কি মনের মধ্যে অঙ্কিত করিতে পারেন? কেহই পারেন না। তবে কি বলিবেন, পৃথিবীর পরিমাণ কত আমরা জানি না, তাহার বোধও নাই? তাহা কিরূপে বলিব? যদি কিছু মাত্র বোধ না থাকিবে তবে কিরূপে জানিলাম, উহার পরিধি এগার হাজার ক্রোশ? পৃথিবীর পরিমাণ সম্বন্ধে যেমন আমাদের বোধ আছে কিন্তু ধারণা নাই, তেমনি ঈশ্বর স্বরূপ সম্বন্ধে বোধ আছে, ধারণা নাই। তাঁহার স্বরূপ আংশিকরূপে

আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় মাত্র, কিন্তু ধারণা হয় না। এই কারণে উপনিষদ্‌কার ঋষিগণ বলিয়াছেন ঃ—

"নাহং মন্যে সুবেদেতি নোন বেদেতি বেদ চ।
যোন স্তদ্বেদ তদ্বেদ নোন বেদেতি বেদ চ॥"

অর্থ,—আমি যে ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছি এমন কথা বলি না, কিছু যে না জানি এমন কথাও বলি না; তাঁহাকে জানি অথচ জানি না, ইহার মর্ম্ম আমাদের মধ্যে যিনি বুঝিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে জানিয়াছেন।

এখানে আর একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে, আমরা ঈশ্বরকে কিরূপে জানি? সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে? আমাদের আত্মজ্ঞানই সাক্ষাৎ জ্ঞান; আমরা বস্তুতঃ সাক্ষাৎভাবে কেবল আপনাকেই জানি। জড়ের যে জ্ঞান তাহা আত্মজ্ঞানে প্রতিবিম্বিত জ্ঞান; অপর আত্মার যে জ্ঞান, তাহা আকার, ইঙ্গিত চেষ্টাদি দ্বারা অনুমান-লব্ধ জ্ঞান। ঈশ্বর জ্ঞান কি সাক্ষাৎ জ্ঞান, অথবা সৃষ্টিলীলা দর্শনে অনুমান-লব্ধ পরোক্ষ জ্ঞান? সৃষ্টিলীলা দর্শনে স্রষ্টার অনুমান—যদি ইহাই ঈশ্বর-জ্ঞানের একমাত্র সোপান হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরজ্ঞানকে অতিশয় সংশয়াকুল ভূমির উপরে দণ্ডায়মান থাকিতে হয়। এই জন্য চিন্তাশীল সাধকেরা বলিয়া থকেন যে আত্মজ্ঞানের মূলেই ঈশ্বর জ্ঞান নিহিত। যে জ্ঞান-ক্রিয়ার দ্বারা আমরা আত্মাকে জানি, সেই জ্ঞান-ক্রিয়া দ্বারাই পরমাত্মাকে জনি। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ মনে কর, প্রত্যেক জড়পদার্থ আকাশকে আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু যে প্রত্যক্ষের দ্বারা জড়ের জ্ঞান হয়, তদ্দ্বারাই

আকাশেরও জ্ঞান হয়। আকাশকে চিন্তাক্ষেত্র হইতে দূরে রাখিয়া আমরা জড়ের চিন্তা করিতে পারি না। জড়ের স্বরূপ চিন্তা করিতে গেলেই "আকাশে স্থিত" এ চিন্তাও তাহার অন্তর্নিহিত থাকে। সেইরূপ যে জ্ঞান-দৃষ্টি দ্বারা আমরা আত্মস্বরূপ লক্ষ্য করি, সেই দৃষ্টিই আমাদের নিকট পরমাত্মসত্তাকে প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব পরমাত্মজ্ঞান কেবলমাত্র অনুমান লব্ধ নহে, আত্মজ্ঞানের মূলে নিহিত, সুতরাং অব্যবহিত। তবে আত্মজ্ঞানে আমরা যাঁহাকে আত্মার প্রতিষ্ঠা-ভূমিরূপে দর্শন করি, অনুমান আবার সেই আত্মপ্রত্যয়কে দৃঢ় করিয়া তাঁহার জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিয়া থাকে। আত্মার মূলে আমরা যাঁহাকে সৎ বলিয়া প্রতীতি করি, সৃষ্টিলীলার মধ্যে তাঁহারই স্বরূপের অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। এইরূপ অন্তরে বাহিরে সাক্ষ্য পাইয়া আমরা ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হই। এইজন্য উপনিষদ্‌কার ঋষি বলিলেন—"যিনি বাহিরে আকাশে, তিনি অন্তরে হিরণ্ময় পরম কোষে।"

এক্ষণে দেখ জ্ঞানের দিক্ দিয়া সৃষ্টিলীলার মধ্যে সৃষ্টিকর্ত্তাকে দেখিতে গিয়া কি দেখিতে পাই? প্রথমে দেখি, তিনি "সত্যং"। প্রকৃত সত্যের তিনটী লক্ষণ; ইহা স্বয়ম্ভূ, নিত্য ও স্বতন্ত্র। কারণ যাহার উৎপত্তি অপরের স্থিতিসাপেক্ষ, তাহা উক্ত আদি বস্তুরই বিবর্ত্তিত রূপান্তর মাত্র, স্বতন্ত্র সত্তা নহে; সুতরাং সত্যও নহে। সেইরূপ যাহা স্বয়ম্ভূ হইয়াও বিনাশশীল, তাহাও ঠিক সত্য নহে, তাহার সত্তা বায়ুতাড়িত শরদভ্রের ন্যায় ক্ষণিক। তৃতীয়তঃ, যাহার স্থিতি ও বিনাশ

অপরের স্থিতি ও বিনাশ সাপেক্ষ তাহাও ঠিক সত্য নহে।

এই অর্থে কেবল পরমাত্মাই প্রকৃত সত্য, আর সমুদায় তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আপেক্ষিক ভাবে সত্য। কি জড়ের বিবিধ বিবর্ত্তন ও বিকার, কি চেতনের বিবিধ ক্রিয়', সর্ব্বত্রই অনি্যতার ছবি মুদ্রিত রহিয়াছে। এই সকল অনিত্যরূপ ও বিকারের মূলে নিত্যবস্তু কিছু বিদ্যমান আছে কি না? আত্মদৃষ্টি দ্বারা আমরা দেখিতে পাই, যে পরিবর্ত্তনশীল, ক্ষণিক মানসিক অবস্থা সকলের মূলে এক অদ্ভুত আত্মবোধ নিহিত রহিয়াছে। ঐ আত্মবোধ সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে অপরিবর্ত্তিত থাকিতেছে। আমার এক মুহূর্ত্তের চিন্তা, এক মুহূর্ত্তের সুখ দুঃখ, অপর মুহূর্ত্তে থাকিতেছে না যে সকল সূত্র দ্বারা আত্মার জীবন-বস্ত্র প্রতিমুহূর্ত্তে বয়ন করা হইতেছে, তাহার সকল গুলিই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, অথচ সমগ্র বস্ত্রখানির একত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যাইতেছে! আমার সকলি চলিয়া যাইতেছে, অথচ আমি অপরিবর্ত্তিত থাকিতেছি। ইহা কি অদ্ভুত তত্ত্ব! মণি সকল সূত্র দ্বারা একত্র-সম্বদ্ধ না হইয়া যখন পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে, তখন তাহাদের নাম মণিমালা হয় না; যখন তাহারা সূত্র দ্বারা একত্র সম্বদ্ধ হয় তখন তাহারা একত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদিগকে মণিমালা বলে; সেইরূপ একই সূত্র যাহা আমাদের চিন্তা ও ভাব সকলের মূলে নিহিত থাকিয়া সকলকে একত্বে গ্রথিত করিতেছে। এইরূপে আত্মার মধ্যেই অনিত্যতার ভিতরে নিত্যতার

পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আমাদের জ্ঞান বহির্জগতেও অনিত্যের মধ্যে নিত্যকে অন্বেষণ করে। সেখানেও আমরা জগতের অনিত্য ধর্ম্ম ও বিকার সকলের মূলে এক নিত্য সত্তাকে লক্ষ্য করিয়া থাকি, যাহাতে তাবৎ পদার্থ "সূত্রে মণিগণা ইব" সূত্র দ্বারা গ্রথিত মণিগণের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে।

অতএব জ্ঞানের প্রথম সিদ্ধান্ত এই, যে এক নিত্য সত্তা আশ্রয় ও আধার রূপে জড়ে ও চেতনে নিহিত রহিয়াছে। উপনিষদ্‌কার ঋষিগণ অনুভব করিলেন, যে এই নিত্য সত্তাকে জ্ঞান দ্বারা অবগত হইলে, মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে অর্থাৎ মুক্তি লাভ করিতে পারে।

মৃত্যুকে অতিক্রম করা কাহাকে বলে? মৃত্যু আমাদের পক্ষে এত ভয়ানক কেন? ইহা এত পীড়াদায়ক কেন? যদি আমরা সংসারের পদার্থ সকলের সহিত আবদ্ধ না থাকিতাম তাহা হইলে কি মৃত্যু এত যন্ত্রণাদায়ক হইত? চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, আসক্তিই মৃত্যুর ভয়ানকত্বের প্রধান কারণ। মানুষ যাহাতে আসক্ত তাহা হইতে সবলে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিলে, সে স্বভাবতঃই যাতনা পায়। এই সুখদুঃখময় জীবনের প্রতি এবং ইহার ভোগ্য সামগ্রী সকলের প্রতি আমাদের এমন গূঢ় আসক্তি থাকে যে, জীবনের এই সকল সুখ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া আমাদের পক্ষে অতীব ক্লেশজনক। এই আসক্তিকেই জ্ঞানিগণ মোহ বলিয়া থাকেন। এই মোহের প্রকৃতি অতি বিচিত্র! একজন অশীতিপর বৃদ্ধা, নিরাশ্রয় ও অনাথ, দুরন্ত শীতবাতে ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে, শত খণ্ড চীর

বস্ত্র দ্বারা তাহার অঙ্গাচ্ছাদন হয় না, দিনান্তে অন্ন যোটে না, লোকের দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া খায়, অপরের পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্টের দ্বারা জীবন ধারণ করে। সে যে কেন এ সংসারে থাকিতে চায়, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না! এক সময়ে পুত্রকন্যাতে তাহার ঘর পূর্ণ ছিল, একে একে সকলে তাহাকে ফেলিয়া গিয়াছে, সে একাকিনী জগতে পড়িয়া আছে, অথচ দেখি, জীবনের প্রতি তাহার এমন আসক্তি যে, ক্ষুদ্র এক কাষ্ঠখণ্ডের জন্য ঘোর কলহ উপস্থিত করিতেছে, অশান্তির অগ্নি জ্বালিয়া তাহাতে দগ্ধ হইতেছে। যে দোকানদার অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্ত্রী পুত্রকে সুখী করিবে বলিয়া দোকান করিতে গিয়াছিল, সে হয়ত দুইটি পয়সার জন্য স্ত্রীর মাথা ফাটাইয়া দিতেছে। ইহা দেখিয়া জ্ঞানিগণ শোক করিয়া বলেন, হায়! জীব কি প্রকার মোহে নিমগ্ন! সংস্কৃত কবি ক্ষোভ করিয়া বলিয়াছেন,

"দুঃখীয়তি সুখহেতোঃ কো মূঢ়ঃ সেবকাদন্যঃ"

"পরের সেবক যে, সে ভিন্ন আর কোন্ মূর্খ ব্যক্তি সুখের উদ্দেশে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে?" অথচ মোহের অধীন হইয়া অসংখ্য জীব, সুখের আশায় দুঃখ ভোগ করিতেছে।

এই আসক্তি বা মোহবশতঃই মৃত্যু আমাদের নিকট এত যন্ত্রণাদায়ক। যাঁহার আসক্তি নাই, যিনি এই মর্ত্ত্যধামের পদার্থ সকলে আবদ্ধ নহেন, যাঁহার জীবন-তৃষ্ণা বিগত হইয়াছে, তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়াছেন, অর্থাৎ মৃত্যু তাঁহাকে আর যন্ত্রণা দিতে পারে না।

জীবনের প্রতি আসক্ত ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যু কি প্রকার পীড়াদায়ক তাহা একটী সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে। এদেশে বালিকাদিগকে শৈশবে বিবাহ দিবার রীতি আছে। সেই সকল সুকুমারমতি শিশুকে ধরিয়া যখন পতিগৃহে প্রেরণ করিতে হয়, তখন তাহাদের ক্রন্দন-ধ্বনিতে দিক্ সকল প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। ইহা আমরা অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ঐ সকল বালিকার এত যন্ত্রণা পাইবার কারণ কি? কারণ এই—তাহাদের পিতা মাতা, ভাই ভগিনী, খেলিবার সঙ্গী সঙ্গিনী, খেলার ঘর প্রভৃতি যত কিছু ভালবাসার পদার্থ, সমুদায় পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, এবং তাহাদিগকে এরূপ একস্থানে লইয়া চলিল, যে স্থানের কথা ভাবিলে এমন এক খানিও মুখ মনে পড়ে না, যাহা স্মরণ হইলে প্রীতির উদয় হয়। সেইরূপ এই জগতে আসক্ত জীবের পক্ষে মৃত্যু অতীব যন্ত্রণাদায়ক।

এক্ষণে প্রশ্ন এই—আসক্তি বা মোহ কেন জন্মে? তদুত্তরে জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন, যে মানব অনিত্য বস্তুকে নিত্য জ্ঞান করে বলিয়াই মোহের উৎপত্তি হয়। যাহা ক্ষণিক, ভঙ্গুর ও নশ্বর, তাহাকে মানুষ ভ্রান্তিবশতঃ অবিনশ্বর মনে করে, সেই জন্যই এই ঘোর কুহকের মধ্যে পড়িয়া যায়। সুতরাং মানব-হৃদয়ে যদি নিত্যানিত্য-বিবেকের উদ্রেক করা যায়, তাহা হইলে তাহারা আর মোহে আবদ্ধ হয় না। এরূপ মতের মধ্যে কিঞ্চিৎ ভ্রম আছে, তাহা পরে প্রদর্শন করা যাইবে। কিন্তু আপাততঃ জ্ঞান-মার্গাবলম্বিদিগের যুক্তি যাহা তাহাই প্রদর্শন করা যাইতেছে।

নিত্যানিত্য-বিবেক দুই প্রকারে মানবচিত্তে জন্মিতে পারে। প্রথম, পার্থিব পদার্থ সমূহের অসারতা ও অনিত্যতা প্রতিপাদন দ্বারা ; দ্বিতীয়তঃ, অনিত্যের মধ্যে নিত্য হইয়া যিনি আছেন, তাঁহাকে জানিয়া। এই দুইটী প্রণালীর মধ্যে নিত্য বস্তুর জ্ঞানকে উজ্জ্বল করাই উৎকৃষ্টতর প্রণালী। কারণ নিত্যকে জানিলে মানুষ স্বতঃই অনিত্যকে পরিত্যাগ করে। উৎকৃষ্টকে জানিলে আর অপকৃষ্টে কাহারও রুচি থাকে না। মহৎকে যে জানিয়াছে সে কি আর ক্ষুদ্রে আসক্ত হয়? যে ব্যক্তির ভবনে প্রত্যহ সহরের সুগায়কদিগের সমাগম হয়, তাহাদের সুস্বরসুধাতে যাঁহার মন পূর্ণ রহিয়াছে, তিনি কি পথভিখারীর একটী গান শুনিবার জন্য পথে দাঁড়াইয়া থাকেন? যে ব্যক্তির ভবন সুচিত্রকরদিগের চিত্রাবলীর দ্বারা সুশোভিত, তিনি কি কালীঘাটের দোকানের সামান্য পট কিনিবার প্রয়াসী হন? সেইরূপ যিনি নিত্য, সত্য ও পরম পদার্থকে জানিয়া বিমল ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিয়াছেন, তিনি কি আর ক্ষুদ্র নশ্বর বিষয় সকলে আবদ্ধ হন? মানব যখন জ্ঞান দ্বারা সেই অনন্ত, অবিনশ্বর, সত্য বস্তুকে প্রাপ্ত হয়, তখন আর তাহার মৃত্যুভয় থাকে না; সে মর্ত্ত্যধামের নশ্বর ভূমি ত্যাগ করিয়া অমর ধামে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়।

আসক্তি।

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে"

"অর্থাৎ নিরন্তর বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে মানুষের তাহাতে আসক্তি জন্মে।"

যতদিন মানুষ স্বীয় চরিত্র ও কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে শিখিয়াছে, ততদিন একটী গুরুতর প্রশ্ন তাহার মনে জাগিতেছে। সে প্রশ্নটী এই ঃ—দুঃখ ও পাপ কি বস্তু? এবং তাহাদের উৎপত্তি হইল কিরূপে? এ প্রশ্ন প্রাচীন কালেও চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মনে উদিত হইয়াছে, বর্ত্তমানকালেও মানব-চিত্তকে আন্দোলিত করিতেছে। জগতের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে লোকে সচরাচর যে প্রকার বিচার করে তন্মধ্যে অনেক ভ্রম প্রমাদ আছে, তাহা আমরা জানি। প্রথমতঃ সুখ ও দুঃখ দুইটী আপেক্ষিক শব্দ। যাহা একজনের পক্ষে সুখ তাহা অপরের পক্ষে দুঃখ। একজন বিজ্ঞানের চর্চ্চা বা কাব্যের আলোচনাতে সমস্ত দিন যাপন করে, আহার বিহারের দিকে তাহার দৃষ্টি নাই, পার্থিব ধন সম্পদ্ সঞ্চয় করিবার দিকে মনোযোগ নাই; আর এক ব্যক্তি পার্থিব ধন সম্পদের সুখ অপেক্ষা উচ্চ সুখ জানে না, ইন্দ্রিয়-বৃত্তির চরিতার্থতা ভিন্ন তাহার অন্য লক্ষ্য নাই; এই উভয়ে কত প্রভেদ। এক জন অপর জনকে দুঃখী ও কৃপাপাত্র বলিয়া মনে করে। দ্বিতীয়তঃ, এক সময়ে আমরা যাহাকে দুঃখের কারণ মনে করি, অপর সময়ে দেখি, তাহাই আবার কল্যাণ ও সুখের

কারণে পরিণত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন অনেক দুঃখ মানব নিজে উৎপন্ন করে। এইরূপে জগতের দুঃখ ও পাপের মাত্রা হইতে অনেক বাদ দিলেও এমন কিছু দুঃখ অবশিষ্ট থাকে, যাহাকে দুঃখ বলিয়া গণনা না করিয়া পারা যায় না, এবং যাহা মানবের আয়ত্তাধীন নহে, মানবের ইচ্ছানিরপেক্ষ হইয়া ঘটিয়া থাকে। এ দুঃখ কোথা হইতে আসিল ? হয় বল ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, তিনি তাঁহার জগতে দুঃখকে সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করিতে পারিতেছেন না, আর একটা কি বিরোধী শক্তি তাঁহাকে বাধা দিতেছে ; না হয় বল, তিনি পূর্ণ মঙ্গলময় নহেন, জানিয়া শুনিয়া তাঁহার সৃষ্ট জীবকে দুঃখ দিতেছেন।

জগতের বাল্যদশায় এই প্রশ্নের এক সহজ সিদ্ধান্ত মানবের মনে উদিত হইয়াছিল। তাহা এই ঃ—মানবের জীবনের উপরে দুই ঈশ্বর বিদ্যমান, এক ভাল ঈশ্বর, অপর মন্দ ঈশ্বর। ভাল ঈশ্বর সুখ বিধান করেন, আর মন্দ ঈশ্বর দুঃখ দিয়া থাকেন। অদ্যাপি অনেক বর্ব্বর জাতির মধ্যে এই প্রকার বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা মনে করে, যে ঈশ্বর মানবের উপকারী বন্ধু, তাঁহার পূজাদির প্রয়োজন নাই ; কারণ তিনি ত অনিষ্ট করিবেন না ; অনিষ্টকারী ঈশ্বরেরই পূজার প্রয়োজন।

এইরূপ দ্বৈতভাব সকল জাতিরই আদিম চিন্তার মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্দেশীয় প্রাচীন পুরাণকারগণও অদিতি ও দিতি, দেব ও অসুর প্রভৃতি শব্দের দ্বারা এই দুই পরস্পর বিরোধী শক্তি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। দৈত্যগণ নিরন্তর মানবসমাজকে দুঃখ দিবার চেষ্টা করিতেছে, আর আদিত্য-

গণ সেই দুঃখ নিবারণার্থ বার বার ধরাধামে অবতীর্ণ হইতেছেন।

কিন্তু প্রাচীনকালের অগ্ন্যুপাসক পারসীক সম্প্রদায়ের মনে এই দ্বৈতভাব যেরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, এরূপ আর কুত্রাপি দেখা যায় না। আহুরা মাজদা ও আস্ত্রমন্যু বা আহিরমান উভয়ে শক্তি বিষয়ে প্রায় সমকক্ষ। আহুরা মাজদা যাহা করেন, আহিরমান তাহা বিনষ্ট করিবার প্রয়াস পায়। এই সংগ্রাম নিরন্তর চলিতেছে।

প্রাচীন য়িহুদীগণ অগ্ন্যুপাসক জরথুস্ত্রের শিষ্যগণের নিকট. হইতে শয়তানের ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। য়িহুদী শাস্ত্র হইতে ইহা খ্রীষ্টীয় ও মুসলমান ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু জগতের দুঃখরূপ সমস্যার পূর্ব্বোক্ত উত্তর বর্ত্তমান উন্নত জ্ঞানের পক্ষে সন্তোষকর নহে। বর্ত্তমান উন্নত চিন্তা এইরূপ দুইটী ঈশ্বর মানিয়া নিবৃত্ত হইতে পারে না। আমরা দেখিতেছি, দুঃখের মূল কারণস্বরূপ শয়তান মানিয়াও নিষ্কৃতি নাই। পুনরায় প্রশ্ন উঠে, শয়তান ঈশ্বরের সমকক্ষ কি ঈশ্বর অপেক্ষা হীনবল? যদি সমকক্ষ হয়, তবে ঈশ্বর মানিবার প্রয়োজন কি? সেরূপ ঈশ্বর ঈশ্বরই নয়। যদি বল হীনবল, তবে প্রশ্ন, ঈশ্বর কেন শয়তানকে সৃষ্টি করিলেন, এবং সৃষ্টি করিয়া বিনাশের শক্তি সত্ত্বেও কেন তাহাকে সৃষ্টির মধ্যে দুঃখ ঢালিতে দিতেছেন? জীবের দুঃখ নিবারণের জন্য কেন তাহাকে সংযত বা বিনষ্ট করিতেছেন না? সেই পুরাতন সমস্যা আবার

ফিরিয়া আসিল—পূর্ণ মঙ্গলময় বিধাতা কেন তাঁহার সৃষ্টি-রাজ্যে দুঃখ থাকিতে দিতেছেন ?

এই কারণে এতদ্দেশে জ্ঞানের কিঞ্চিৎ উন্নতি হইলেই, পণ্ডিতগণ এই পৌরাণিক মত পরিত্যাগ করিয়া আর একটী মত অবলম্বন করিলেন। সে মতটী এই ঃ—সৃষ্টিকর্ত্তা এক এবং মঙ্গলময় ; দুঃখ মানবের কর্ম্মবিপাকজনিত ; তাহা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফল।

দুঃখ কর্ম্মবিপাকজনিত হইলেও তাহার উৎপত্তির প্রণালী ও প্রকার কি ? এই চিন্তাতে রত হইয়া এদেশের জ্ঞানীরা বলিলেন, আসক্তি হইতেই সকল দুঃখের উৎপত্তি। ভগবদ্গীতাতে এই মত অতি সুন্দররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ;—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে,
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধাভিজায়তে.
ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ,
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশঃ বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।"

অর্থ—নিরন্তর বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে মানুষের তাহাতে আসক্তি উপস্থিত হয় ; আসক্তি হইতে কামনার জন্ম হয় ; কামনা হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হয় ; চিত্ত ক্রোধের দ্বারা উত্তেজিত হইলেই, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা আসে ; কর্ত্তব্যবিমূঢ়তা আসিলে মানুষের (লক্ষ্যের) স্মৃতি বিলুপ্ত হয় ; স্মৃতি বিলোপ হইলেই সে ব্যক্তি একেবারে বিনষ্ট হয়।"

কিরূপে যে মানুষ বিনাশের পথে অগ্রসর হয়, তাহার ক্রমটী এই বচনে কেমন সুন্দররূপে নির্ণীত হইয়াছে ! যাহা

সুখকর, ইন্দ্রিয়গণের তৃপ্তিকর, বা চিত্তোত্তেজক, তাহার মধ্যে বাস করিতে করিতে অল্পে অল্পে তাহাতে আসক্তি জন্মে অর্থাৎ চিত্ত তাহাতে লগ্ন হইয়া যায়। তৎপরে যে বস্তুতে আসক্তি জন্মে মানুষ স্বতঃই তাহা লাভ করিবার প্রয়াসী হয়; এবং লাভ করিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে থাকে। যখন মানুষ এইরূপে নিজ অভীষ্ট কোনও পদার্থ লাভ করিবার প্রয়াসী হয়, তখন যে ব্যক্তি তাহার পথে অন্তরায় স্বরূপ হয় বা কোনও প্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাহার প্রতি স্বতঃই ক্রোধের উদয় হয়। চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, জগতে যত বিবাদ বিরোধ শত্রুতা ক্রোধ প্রভৃতি তাহার অধিকাংশের মূলে এই কারণ,—একজন অপর জনের অভীষ্ট লাভের পথে অন্তরায় হইয়াছে। ক্রোধের প্রকৃতি এই যে, ইহা চিত্তের স্থৈর্য্য নষ্ট করে; মানুষকে ধীরচিত্তে কর্ত্তব্যপথ নির্দ্ধারণ করিতে দেয় না; সুতরাং ক্রুদ্ধ ব্যক্তি স্বতঃই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে। এই অবস্থা মানবের কি শোচনীয় অবস্থা! এই অবস্থাতে মানুষ আপনার জীবনের লক্ষ্য হারাইয়া ফেলে; সে কি উদ্দেশ্যে কি কাজ করিতেছিল, তাহা আর মনে থাকে না; ইহাকেই গীতাকার স্মৃতিভ্রংশ বলিয়াছেন। এই অবস্থাতে যে উপনীত হইয়াছে তাহার দুর্গতির চরমাবস্থা! সে একেবারে বিনাশের মধ্যে পতিত হয়।

প্রত্যেকে নিজ নিজ মনে কোনও একটা আসক্তি ও পতনের দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া চিন্তা করিলে দেখিতে

পাইবেন যে, প্রায় সর্ব্বত্রই মানবের পতনের এই ক্রম। একবার আমরা দুইজন বন্ধুতে একত্র হইয়া একটী কারাগার পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম। আমার বন্ধুর পরিধানে সন্ন্যাসীর বেশ, গৈরিক বস্ত্র ছিল। আমরা কারাগারের অপরাপর বিভাগ পরিদর্শন করিয়া অবশেষে যে বিভাগে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীগণ বাস করিতেছিল, সেই বিভাগে গমন করিলাম। আমরা গিয়া দণ্ডায়মান হইবামাত্র একজন কয়েদী আমার সন্ন্যাসী বন্ধুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। অনেক সান্ত্বনা করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে জানা গেল যে, সে হতভাগ্য ব্যক্তিও এক সময়ে ঐরূপ গৈরিকবস্ত্রধারী সন্ন্যাসী ছিল। সেই অবস্থাতে একটী স্ত্রীলোক সর্ব্বদা তাহার নিকট যাতায়াত করিত। অল্পে অল্পে তাহার প্রতি সন্ন্যাসীর আসক্তি জন্মে। তৎপরে ঈর্ষা বশতঃ সেই স্ত্রীলোককে হত্যা করে। তন্নিবন্ধন চিরজীবনের জন্য দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হইয়াছে। সে ব্যক্তি যখন আমাদের নিকট নিজ চরিত্র বর্ণন করিতেছিল, তখন গীতাকার যদি উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া নিশ্চয় বলিতেন, দেখ, আমার উক্তির উজ্জ্বল প্রমাণ এইখানে দর্শন কর; দেখ এ ব্যক্তি ধর্ম্মসাধনার্থ সন্ন্যাস-ব্রত লইয়াছিল; কিরূপে আসক্তি বশতঃ ক্রোধের অধীন হইয়া নিজের লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল!

কিন্তু অপর একটী প্রশ্ন বিচার করিতে এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে। যে আসক্তি বশতঃ মানুষ পতিত হয়, সেই

আসক্তির স্বরূপ কি? তাহাকে বিশ্লেষণ করিলে মূলে কি দেখিতে পাওয়া যায়?

কোনও বস্তুর প্রতি হৃদয়ের যে আকর্ষণ থাকিলে প্রাপ্তিতে আনন্দ ও অপ্রাপ্তিতে ক্লেশ জন্মে, সেই আকর্ষণই আসক্তির বীজ। ইহার মধ্যে আরও প্রবেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সুখ-লালসা ও ইচ্ছাশক্তির দুর্ব্বলতা, এই দুইটী আসক্তির প্রধান উপাদান স্বরূপ। মানুষের স্বভাব এই, যে অবস্থা সুখকর তাহা বার বার লাভ করিতে চায়। যদি পল্লীর মধ্যে একটী সুপ্রশস্ত, সুপরিষ্কৃত, উত্তম বায়ুপরিসেবিত ও সাধারণের বসিবার উপযুক্ত ঘর থাকে, দেখিবে গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যার পূর্ব্বে আপনা আপনি পল্লীর লোক সেখানে আসিয়া বসিতেছে, কেহ কাহাকেও ডাকিয়া আনিতেছে না। সেখানে বসিলে যে আরামটুকু পাওয়া যায় তাহার লালসাই মনকে সে দিকে টানিতেছে। সুরাপায়ী যে সুরাপান নিবন্ধন আপনার সর্ব্বনাশ হইতেছে দেখিয়াও সুরাপান পরিত্যাগ করিতে পারে না, তাহার কারণ কি? অনেক সময় দেখা গিয়াছে সুরাপায়ীদিগকে সুরাপানের অনিষ্ট ফল প্রদর্শন করিলে, তাহাদের অনুতাপের উদয় হয়; তাহারা আত্মীয় স্বজনের দুঃখ ও আপনাদের দুর্গতি স্মরণ করিয়া কাঁদিতে থাকে, এবং সে প্রকার কর্ম্ম আর করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করে; এবং হয়ত কিছু দিন সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াও চলে। কিন্তু অবশেষে হয়ত এক দিন শুনা গেল যে, সে আবার পুরাতন প্রলোভনের মধ্যে পতিত হইয়াছে। ইহার কারণ কি? সে যে অনুত্রপ্ত

হইয়াছিল, অশ্রুপাত করিয়াছিল, প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিল, সে সমুদায় কি প্রবঞ্চনা? তাহা কখনই নহে। সে তখন সরল ভাবেই অনুতাপ করিয়াছিল এবং অকপটেই আত্ম-সংশোধনের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। তবে আবার পতিত হইল কেন? উত্তর—আসক্তি বশতঃ। যেই সেই পুরাতন প্রলোভনের বস্তু তাহার নিকটে আসিল, অমনি সুরাপানজনিত উত্তেজনার সুখটুকু মনে জাগিয়া উঠিল; সেই সুখ স্মৃতিপথে উদিত হইবামাত্র তাহা পুনর্ব্বার ভোগ করিবার লালসা প্রবল হইল; এক দিকে যেমন লালসা প্রবল হইল, অপর দিকে ইচ্ছাশক্তির দুর্ব্বলতা বশতঃ সে মনকে সংযত করিয়া রাখিতে পারিল না; বলহীন ব্যক্তির ন্যায় লালসার হস্তে বন্দী হইয়া পুরাতন পাপে পতিত হইল। জগতের অধিকাংশ পাপের ইতিবৃত্ত এই।

এক্ষণে প্রশ্ন এই কেন মানুষ ক্ষুদ্র পদার্থে এরূপ আসক্ত হয়? উপনিষৎকার ঋষিগণ বলিলেন, অজ্ঞতা-বশতঃ, অনিত্যকে নিত্য বলিয়া জানে বলিয়া। ভ্রান্ত জীব সর্ব্বদাই এ জগতে অনিত্যকে নিত্য বলিয়া ভাবিতেছে; রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শময় অনিত্য পদার্থে ভুলিয়া নিত্য পদার্থ যে ব্রহ্মসত্তা তাহাকে বিস্মৃত হইতেছে, সেই জন্যই মানুষের এই দুর্গতি। তাঁহারা বলেন, ভ্রান্ত মানুষকে জ্ঞানোপদেশ কর, একদিকে সংসারের অনিত্যতা ও অসারতা প্রতিপন্ন কর, অপরদিকে নিত্য বস্তুর জ্ঞানকে উজ্জ্বল কর, তাহা হইলে তাহাদের অবিদ্যা ঘুচিয়া যাইবে এবং তাহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া আর অনিত্য পদার্থে আসক্ত হইবে না।

এতদ্দেশের অদ্বৈতবাদী বেদান্ত মতাবলম্বিগণের সকলেরই এই ভাব। তাঁহারা বলেন ব্রহ্মসত্তা ভিন্ন অন্য সত্তা নাই; নাম রূপের ভেদ অজ্ঞতা বা ভ্রান্তি-জনিত। প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিলে মানুষ নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সেই পরাৎপর পরম সত্তার সহিত অভিন্নত্ব প্রাপ্ত হয়।

> যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
> অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়,
> তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
> পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি সদ্যঃ ॥
>
> উপনিষৎ।

ভাবার্থ এই,—"নদী সকল যতদিন সাগরে না পতিত হয় ততদিন তাহাদের গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকে; কিন্তু মহাসাগরে মিলিত হইলে যেমন সকল নাম ঘুচিয়া কেবল সাগর নামই থাকে, তেমনি যতদিন মানব অবিদ্যার অধীন থাকে, ততদিন রাম, শ্যাম, হরি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপের জ্ঞান থাকে, কিন্তু বিদ্যা লাভ হইলে সর্ব্বপ্রকার নামরূপ বিহীন হইয়া সেই পরম পুরুষের সহিত একীভূত হয়।"

এ দেশীয় জ্ঞানিগণের অভিপ্রায় এই যে, এই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞান যাহারা লাভ করে, তাহারা আর অনিত্য পদার্থে আসক্ত হয় না; সুতরাং কর্ম্ম-বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। ইহারই নাম মুক্তি।

কিন্তু একটী মহৎ প্রশ্ন এই উঠিতেছে, মানুষ নিত্য বস্তুকে

জানে না বলিয়াই অনিত্যে আসক্ত হয়, অথবা অনিত্যে আসক্ত হয় বলিয়াই নিত্য বস্তুকে ভুলিয়া যায়, ইহার কোন্‌টী সত্য? আমরা প্রতিদিন সংসারে এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত কি দেখিতে পাইতেছি না, যেখানে মানুষ ক্ষণিক সুখে মগ্ন হইয়া স্থায়ী লক্ষ্য বিস্মৃত হইতেছে? মনে কর, এক ব্যক্তি বিদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছে; সেখানে সে বাণিজ্যে অনেক অর্থ লাগাই-য়াছে; আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া বিদেশবাসের নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগ করিতেছে; ক্রমে সংবাদ পাওয়া গেল যে, সে কুসঙ্গীদের সঙ্গে পড়িয়া নানাপ্রকার দুষ্ক্রিয়াতে রত হইয়াছে এবং তাহার সমুদায় মূলধন ক্ষয় হইয়া সে দারিদ্র্য দশাতে নিপতিত হইয়াছে। এই ব্যক্তির কার্য্যের মধ্যে প্রবেশ করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? সে যে অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিদেশে পড়িয়া আছে, এ জ্ঞান কি তাহার ছিল না? তবে কিরূপে সে জ্ঞান বিলুপ্ত হইল? উত্তর—নিকৃষ্ট সুখে আসক্ত হইল বলিয়া। ক্ষণিক সুখে আসক্ত হইয়া সে স্থায়ী লক্ষ্যটা ভুলিয়া গেল। এইরূপ এ কথা কি সত্য নহে যে, নিত্য বস্তুকে জানিয়াও মানুষ অনিত্য পদার্থে আসক্ত হয় বলিয়াই নিত্য বস্তুকে ভুলিয়া যায়?

ইহা দেখিয়াই ভক্তি-পথাবলম্বিগণ বলিয়াছেন, কেবলমাত্র জ্ঞানের দ্বারা আসক্তির উদ্ধার হয় না। যেমন পদে কণ্টক বিদ্ধ হইলে কণ্টকের দ্বারা কণ্টক তুলিতে হয়, তেমনি আসক্তির দ্বারা আসক্তির উদ্ধার করিতে হয়। ঈশ্বরে অকৃত্রিম অনুরাগ জন্মিলে মন স্বভাবতঃই ক্ষুদ্র পদার্থে আর আসক্ত থাকে না।

এই জ্ঞান-মার্গ ও ভক্তি মার্গের তারতম্য বিষয়ে বারান্তরে বিচার করা যাইবে।

তবে সংসারের অনিত্যতা জ্ঞান এবং ঈশ্বরের নিত্যতা জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিলে অনেক স্থলে আসক্তি দমন হইতে পারে। ইতিবৃত্তেও এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। মহাত্মা শাক্যসিংহের জীবনে উক্ত হইয়াছে, যে রোগ, শোক, জরা মৃত্যুর বিকারে মানব-জীবনকে বিকৃত দেখিয়া তাঁহার চিত্তে নির্ব্বেদ জন্মিয়াছিল এবং তিনি রাজসুখ বর্জ্জন করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। শ্মশানে মৃতদেহের অবস্থা দেখিয়া অনেকের বৈরাগ্য জন্মিয়াছে। এতদ্দেশীয় সাধুগণ মানবকে পাপপংক হইতে ফিরাইবার জন্য অদ্যাপি এই প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন; তাহাদিগকে বিষয়-সুখের অসারতা দেখাইয়া দেন। তাঁহারা বলেন,—

মা কুরু ধন জন যৌবন গর্ব্বং
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।

অর্থ—ধন জন যৌবনের গর্ব্ব করিও না; কাল এক নিমেষের মধ্যে সমুদায় হরণ করে। সংসারের অনিত্যতা ও ঈশ্বরের নিত্যতার ধ্যান আমাদেরও ধর্ম্মসাধনের অঙ্গস্বরূপ হওয়া উচিত। জ্ঞানে আমরা ঈশ্বরকে যতই সত্য বলিয়া প্রতীতি করিব, ততই আমাদের প্রীতি ও নির্ভর তাঁহার উপরে স্থাপিত হইবে; ততই আমরা সমুদায় ক্ষুদ্র বিষয়ের আসক্তি হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিব।

ধর্ম্মাবহং পাপনুদং

আমরা মানব প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেই মানবের একটী অদ্ভুত বৃত্তি লক্ষ্য করি, যাহা লক্ষ্য করিলে অতীব বিস্মিত হইতে হয়। ইহার অনুরূপ বৃত্তি কোনও ইতর প্রাণীতে দৃষ্ট হয় না। সে বৃত্তিটী কি তাহা নিরূপণ করিবার পূর্ব্বে কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। সে বিষয়ে চিন্তা করিলে উক্ত বৃত্তিটী যে কিরূপ তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। একবার আমার একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধুর প্রমুখাৎ তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের সম্বন্ধে একটী গল্প শুনিয়াছিলাম। তাঁহার পিতা একজন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ও সাধুপ্রকৃতির পুরুষ ছিলেন। কিন্তু একদিন স্বীয় ভবনে প্রতিনিবৃত্ত হইবার সময় হঠাৎ তাঁহার একটী দুর্ম্মতি ঘটিল। উক্ত দিবস গৃহে আসিবার সময় তিনি দেখিলেন, একটী সুন্দর পক্ষী অন্যমনস্ক ভাবে একটী বৃক্ষের শাখায় বসিয়া রহিয়াছে। সে এত নিম্নে আছে যে, অনায়াসে তাহাকে ধরিতে পারা যায়। সেই বিহঙ্গমকে দর্শন করিয়া কেন যে সেই সাধুপ্রকৃতি প্রবীণের মনে তাহাকে ধরিবার বাসনা উদয় হইল বলিতে পারি না। তিনি পশ্চাৎ দিক হইতে অলক্ষিত ভাবে গিয়া পক্ষীটাকে ধরিলেন। স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসে হতভাগ্য জীবের পদদ্বয় ভাঙ্গিয়া

গেল। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া সেই প্রবীণের অন্তরে প্রবল অনুশোচনা উপস্থিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন; সে উড়িয়া গেল বটে, কিন্তু বৃক্ষের শাখায় আর বসিতে পারিল না। ইহা দেখিয়া সেই সাধু পুরুষ সে দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া মনের যন্ত্রণাতে স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন। তদবধি তাঁহাকে সর্ব্বদাই বিষণ্ণ দেখা যাইত, এবং তিনি মধ্যে মধ্যে হা হুতাশ করিতেন। গৃহস্থিত পরিবার পরিজনের মধ্যে কেহই ইহার কারণ অনুমান করিতে পারিতেন না। তিনি কাহাকেও কিছু বলিতেন না। গভীর মনো-বেদনাতে দিন কাটাইতেন।

কিয়ৎকাল পরে তাঁহার একটী কন্যা জন্মিল। ঘটনাক্রমে কন্যাটী কুশপেয়ে অর্থাৎ বিকলাঙ্গ পদদ্বয় লইয়া ভূমিষ্ঠ হইল। বহির্ব্বাটীতে কর্ত্তার নিকট যখন এই সংবাদ পৌঁছিল যে একটী কুশপেয়ে কন্যা হইয়াছে, তখন তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন; দুইগণ্ডে দর দর ধারে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল; তিনি বলিলেন—"ঠিক্ ঠিক্ তা হবেই ত, একজন উপরওয়ালা আছেন কি না, এত দিনের পর আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল।" তদবধি তাঁহার চিত্তে কিঞ্চিৎ প্রসন্নতা দৃষ্ট হইল।

জিজ্ঞাসা করি এই যে অনুতাপের তীব্রতা ও গভীরতা ইহা কোনও ইতর প্রাণীতে দৃষ্ট হয় কি না? কে কবে দেখিয়া-ছেন, বা শুনিয়াছেন যে, একটী অন্যায় কার্য্য করিয়া কোনও ইতর প্রাণী দিনের পর দিন মাসের পর মাস অনুতাপ-যাতনায়

কাল কাটাইতেছে! এই অনুতাপের গভীরতা কেবল মানবেই সম্ভব।

মানব-চিত্তের অনুতাপ-যাতনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যেন পশুপক্ষিগণ মানবের অপেক্ষা সুখী; তাহারা বর্ত্তমান দুঃখই ভোগ করে, উপস্থিত যাতনাই তাহাদিগকে ক্লেশ দেয়; পশ্চাতে অতীত কালের দুষ্কৃতি স্মরণ করিয়া, অথবা ভবিষ্যতের আশঙ্কিত দুঃখের সম্ভাবনা করিয়া তাহা-দিগকে মানবের ন্যায় ম্লান হইতে হয় না; কিন্তু তাহা নহে, বিধাতা একদিকে যেমন মানবকে অনুতাপের গভীরতার মধ্যে ডুবিবার অধিকারী করিয়াছেন, অপরদিকে আত্ম-প্রসাদের উচ্চতম শৃঙ্গে আরোহণ করিবার অধিকারীও করিয়াছেন। পশুগণ আমাদিগের ন্যায় অনুতাপ-যাতনা সহ্য করে না, কিন্তু আমাদিগের ন্যায় পুণ্যের আনন্দও সম্ভোগ করিতে পারে না। অনুতাপের গভীরতার ন্যায় আত্মপ্রসাদের উচ্চতাও কেবল মানবেই সম্ভব। আত্মপ্রসাদের একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। দুরন্ত শত্রুগণ মহাত্মা যীশুকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করিয়া হত্যা করে, তৎপূর্ব্বে তিনি এই বলিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর তাঁহার প্রতি যে ভার অর্পণ করিয়াছিলেন তাহা সমাধা হইয়াছে। কেহ কি ইহা কল্পনাতেও আনিতে পারেন যে, কোনও ইতর প্রাণী মৃত্যুর পূর্ব্বে এই ভাবিয়া প্রসন্ন হইতেছে যে, তাহার জীবনে কর্ত্তব্য সাধিত হইয়াছে, তাহার প্রতি যে ভার ছিল তাহা সমুচিতরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে!

তৃতীয়তঃ একটী দায়িত্ব-বোধ বা কর্ত্তব্য-জ্ঞানের দৃষ্টান্তের

উল্লেখ করিব। একবার সংবাদ পত্রে পাঠ করা গিয়াছিল যে, মান্দ্রাজ প্রদেশের কোনও রেলওয়ের একজন পএণ্টস্‌ম্যান একদিন পএণ্ট ধরিয়া দণ্ডায়মান ছিল। সেই মুহূর্ত্তে দুইদিক্‌ হইতে দুইখানি ট্রেন সবেগে আসিতেছিল। তখন সে ব্যক্তি এক নিমেষের জন্য স্বীয় কর্ত্তব্য সাধনে বিমুখ হইলে মহাবিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা। এমন সময়ে কোথা হইতে একটী কালসর্প হঠাৎ আসিয়া সে ব্যক্তির পায়ে জড়াইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার তখন কি সঙ্কটের অবস্থা! যদি সে ভীতিবশতঃ পএণ্ট ছাড়িয়া দেয়, শত শত লোকের প্রাণ যায়; অপরদিকে হয় ত তাহার নিজের প্রাণ যায়। ঈশ্বর তাহাকে সেই সঙ্কটকালে স্বকর্ত্তব্য সাধনে এমনি দৃঢ়তা দিলেন যে, সে একপদও নড়িল না! ক্রমে সর্পটী গাড়ির শব্দে নিজেই পলাইয়া গেল। পরে রেলওয়ে কোম্পানি এই ব্যক্তিকে প্রচুর পুরস্কার দিয়াছিলেন। এই সামান্য দরিদ্র ও হীনাবস্থ ব্যক্তির জীবনে যে কর্ত্তব্য-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, এইরূপ কর্ত্তব্য-জ্ঞান আরও কত শত ব্যক্তির জীবনে দৃষ্ট হইতেছে। কত গৃহে, কত পরিবারে, কত নরনারী গোপনে, লোকচক্ষুর অগোচরে, স্বীয় স্বীয় জীবনের কর্ত্তব্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্য প্রতিদিন তিল তিল করিয়া মরিতেছেন! কত পিতামাতা পুত্র কন্যার কল্যাণার্থ অসহ্য ক্লেশ বহন করিতেছেন! কত পুত্র কন্যা বৃদ্ধ জনকজননীর সেবার জন্য আপনাদের সুখ ও স্বাস্থ্যে জলাঞ্জলি দিতেছেন! কত পত্নী পীড়িত পতির শুশ্রূষাতে আপনার জীবনকে অকাতরে ব্যয় করিতেছেন! জগতের ইতিবৃত্তে এই সকল নিঃশব্দ

স্বার্থনাশের উল্লেখ হয় না। যে সকল কার্য্যে কিছু অসাধারণত্ব থাকে, তাহাই লোকচক্ষুকে আকৃষ্ট করে এবং জগতের ইতিবৃত্তে উল্লেখযোগ্য বলিয়া পরিগণিত হয়, কিন্তু এই সকল নীরব কর্ত্তব্যপরায়ণতার গুণেই মানব-সমাজ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই দায়িত্ব বোধ বা কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা কেবল মানবেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইতর প্রাণীতে এই দায়িত্ব-জ্ঞানের কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কুক্কুর প্রভৃতি গৃহপালিত পশুগণকে সময়ে সময়ে অতি যত্নপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় প্রভুর দ্রব্যজাত রক্ষা করিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু মানবের অদ্ভুত দায়িত্ব-বোধের সহিত তাহার কিছুই তুলনা হয় না। এই দায়িত্ব বোধ মানবপ্রকৃতির এক গূঢ় রহস্য ; ইহার স্বরূপের বিষয়ে চিন্তা করিলে বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হইতে হয়।

এই যে একদিকে অনুতাপের গভীরতা অপরদিকে আত্ম-প্রসাদের উচ্চতা এবং এই যে দায়িত্ব বোধের আশ্চর্য্য শক্তি ইহা কেবল মানবেই সম্ভব এবং ইহাতে মানবকে একটী বিশেষ-বৃত্তি-সম্পন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে। ইহাকে বিবেক বল, হিতাহিত জ্ঞান বল,—একই কথা ; ইহা মানবের একটী বিশেষ ইন্দ্রিয়। ইহার ভিতরেই মানবের মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ব নিহিত। ইহার জন্যই ধর্ম্মজীবন মানবের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে।

বাহিরের ইন্দ্রিয় সকল যেমন এই রূপময় জগতের এক একদিক আমাদের নিকট অভিব্যক্ত করে, আত্মার ইন্দ্রিয় সকলও তেমনি সেই অরূপ সত্তার এক এক দিক অভিব্যক্ত করিয়া থাকে। এ জগৎ একেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীবের নিকটে যাহা,

ইন্দ্রিয়দ্বয়বিশিষ্ট জীবের নিকটেও কি তাহা? কখনই নহে। সেইরূপ ইন্দ্রিয়ত্রয় বিশিষ্ট জীবের নিকটে যাহা, পঞ্চেন্দ্রিয় বিশিষ্ট জীবের নিকট তাহা নহে। ইন্দ্রিয় সকলের সংখ্যা ও শক্তির তারতম্য অনুসারে জীবগণের শ্রেষ্ঠতারও তারতম্য হইয়া থাকে। একেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীব অপেক্ষা পঞ্চেন্দ্রিয় বিশিষ্ট জীব শ্রেষ্ঠ, কারণ, তাহার ইন্দ্রিয়সংখ্যা অধিক হওয়াতে তাহার জীবনের সুখভোগ করিবার শক্তি অধিক, জীবনরক্ষার উপায় অধিক ও কার্য্য করিবার শক্তি অধিক। এই বিচার যদি যুক্তিযুক্ত হয়, তাহা হইলে এই অভিনব বিস্ময়কর বৃত্তি,—বিবেক—মানবকে অতি শ্রেষ্ঠ পদবীতে উন্নীত করিতেছে। কেবল তাহা নহে, ইহা মানবের নিকট সেই পরম পুরুষের স্বরূপের একদিক অভিব্যক্ত করিতেছে। আমরা পূর্ব্বে জ্ঞান ও প্রীতির আলোচনা করিয়াছি। জ্ঞান তাঁহাকে নিত্য সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া অভিব্যক্ত করে, প্রেম তাঁহাকে মঙ্গলস্বরূপ বলিয়া অভিব্যক্ত করে, এবং বিবেক তাঁহাকে ধর্ম্মাবহ ও পাপনুদ বলিয়া অভিব্যক্ত করে। জ্ঞানে তিনি আদিকারণ পিতা, প্রেমে তিনি মঙ্গলময় বিধাতা, বিবেকে তিনি ধর্ম্মাবহ শাস্তা।

বিবেক যেমন তাঁহাকে ধর্ম্মাবহ বলিয়া অভিব্যক্ত করিয়া থাকে, তেমনি ধর্ম্মজগৎকেও আমাদের নিকট অভিব্যক্ত করিয়া থাকে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যেমন আমাদের নিকটে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদি ধর্ম্মাক্রান্ত ভৌতিক জগৎকে ও তাহার নিয়ম সকলকে ব্যক্ত করে, এই অদ্ভুত প্রকৃতিসম্পন্ন ধর্ম্মাধর্ম্ম-বুদ্ধিও সেইরূপ

আমাদের নিকট ধর্ম্ম-জগতকে ও তাহার নিয়ম সকলকে ব্যক্ত করে। ভৌতিক জগৎ যেরূপ দুর্ভেদ্য, ও অনুল্লঙ্ঘনীয় ভৌতিক নিয়মের দ্বারা দৃঢ় আবদ্ধ ও সুশাসিত, ধর্ম্মজগৎও সেই রূপ দুর্ভেদ্য এবং অনুল্লঙ্ঘনীয় ধর্ম্মনিয়মের দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ নিয়মিত একটী ভারী বস্তু ঊর্দ্ধে প্রক্ষেপ করিলে ভূপৃষ্ঠে পড়িবেই পড়িবে ইহা যেমন সুনিশ্চিত রূপে বলিতে পার, এ জগতে অসাধুতার পরাজয় হইয়া সাধুতা প্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে, ইহা কি তেমনি সুনিশ্চিতরূপে বলিতে পার না? তবে তুমি নাস্তিক। তবে তুমি বিশ্বাস কর না যে এ রাজ্যের একজন প্রভু আছেন, তিনি ধর্ম্মাবহ ও পাপনুদ; তিনি ধর্ম্মের বিজয় বিধাতা ও পাপের বিনাশ কর্ত্তা। ঈশ্বর, ঈশ্বর, করিলে বিশ্বাসী হওয়া হয় না, এবং প্রভু, প্রভু, করিলেও কেহ ধার্ম্মিক হয় না, যে ব্যক্তি অকপটে তাঁহার ধর্ম্মশাসনের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিয়াছে, সেই প্রকৃত বিশ্বাসী।

মানুষ সংসারে সত্যের পথে, পবিত্রতার পথে দাঁড়াইতে পারে না কেন? ধর্ম্মজগতের এবং ধর্ম্ম নিয়মের সত্যতাতে বিশ্বাসের অভাবই কি তাহার কারণ নহে? যে মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক, সে যদি বিশ্বাস করিত যে, ঈশ্বরের এই সত্যপূর্ণ জগতে অসত্যের স্থান নাই, অসত্য যাহা তাহা মূলহীন বৃক্ষের ন্যায় বিশুষ্ক হইবেই, মৃত্যুমুখে পতিত হইবেই, তাহা হইলে কি সে মিথ্যা প্রবঞ্চনাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারিত? মানুষ যত প্রকারে ঈশ্বরে অবিশ্বাস প্রকাশ করিতে পারে, তন্মধ্যে জ্ঞাতসারে অধর্ম্মকে আশ্রয় করা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। যে

জ্ঞাতসারে অধৰ্ম্মকে আশ্রয় করিল, সে আপনার কার্য্যের দ্বারা বলিল,—'কোথায় ঈশ্বর! এ জগতে অধর্ম্মও জয়যুক্ত হইতে পারে।' অপরদিকে ঈশ্বর যদি সত্য হন, তবে ইহাও সত্য যে তিনি এই জগতের কর্ত্তা ও প্রভু। সুতরাং তাঁহার রাজ্যে তাঁহার ইচ্ছার জয় হইবে, এ কথা বলাও যাহা, আর ধর্ম্মের জয় হইবে বলাও তাহা। ইহা যিনি অনুভব করিতে না পারিয়াছেন, তিনি অদ্যাপি বিশ্বাস-রাজ্য হইতে অনেক দূরে রহিয়াছেন। ভৌতিক জগতের নিয়ম সকল যেমন এই ভৌতিক দেহকে স্বীয় শাসনাধীনে লইতে চায়, এবং সে শাসনাধীনে না গেলে যেমন এই দেহের স্বাস্থ্য ও শান্তি থাকে না, তেমনি ধৰ্ম্ম জগতের নিয়ম সকলও আত্মাকে স্বীয় শাসনাধীনে লইতে চায়। বিবেকের প্রকৃতি এই, ইহা প্রবল শক্তি সহকারে আদেশ করে এবং কোনও প্রকার ওজর শুনিতে চায় না। এই আদেশ বাণী গ্রাহ্য করাতেই আমাদের আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য ও শান্তি এবং অগ্রাহ্য করাতেই আমাদের আধ্যাত্মিক অসুস্থতা।

আমরা প্রতিদিন দেখিতে পাই যে এই ভৌতিক দেহকে ভৌতিক নিয়ম সকলের অধীন করিবার জন্য আমাদের সংযমের প্রয়োজন হয়, আমাদের প্রবৃত্তিকে রোধ করিতে হয়; আমরা সকল কালে ও সর্ব্বাবস্থাতে সচ্ছন্দে বিহার করিতে পারি না, ভৌতিক নিয়ম সকলকে মানিয়া চলিতে হয়; সেইরূপ আপনাদিগকে ধৰ্ম্ম নিয়মের অনুগত করিবার জন্যও সংযমের প্রয়োজন। প্রবৃত্তি সকলকে রোধ করিয়া জীবনকে ধৰ্ম্ম-নিয়মের অনুগত করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। যতই আমরা প্রবৃত্তি সকলকে সংযত

করিতে সমর্থ হই, ততই সেই পরমপুরুষের স্বরূপের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া থাকি। তিনি যেমন এই জগতের শক্তিপুঞ্জের ক্রীড়ার মধ্যে থাকিয়াও কাহারও অধীন নহেন, তেমনি জিতাত্মা ব্যক্তিরাও প্রবৃত্তিকুলের কার্য্যের মধ্যে থাকিয়াও কাহারও অধীন নহেন। এই স্বাধীনতাই মানবের প্রকৃত স্বাধীনতা।

যেমন ভৌতিক নিয়ম সকলের অনুগত হওয়াতেই ভৌতিক দেহের স্বাস্থ্য, তেমনি ধর্ম্ম-নিয়মের আনুগত্যেই আত্মার স্বাস্থ্য। দেহের স্বাস্থ্য সচরাচর তিন প্রকার চিহ্ন দ্বারা সূচিত হইয়া থাকে। প্রথম রোগে যাতনা বোধ; দ্বিতীয়, আহারাদিতে তৃপ্তিবোধ; তৃতীয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কার্য্য করিবার শক্তি-বোধ। যে দেহ সুস্থ, তাহা রোগ যাতনা বোধ করিতে পারে। দেহের অবস্থা যখন এ প্রকার হয়, যে রোগ যাতনা বোধ করিবার শক্তি আর থাকে না, তখন চিকিৎসকগণ হতাশ হইয়া থাকেন, কারণ তদ্দ্বারা এই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যে উক্ত দেহের জীবনীশক্তি একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে। সেইরূপ সুস্থ দেহ মাত্রেই নিয়মিত অন্নপানাদি গ্রহণে তৃপ্তি-বোধ করিয়া থাকে। যখন আর অন্নপানে রুচি থাকে না, তখন চিকিৎসকেরা অনুমান করেন, যে সেই দেহের মধ্যে রোগের বীজ নিহিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ সুস্থ ও সবল দেহের প্রকৃতিই এই যে তাহা সর্ব্বদা কার্য্য করিতে চায়, কার্য্যে আনন্দ পায় এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কার্য্যের শক্তি থাকে। আত্মার স্বাস্থ্যেরও এই ত্রিবিধ লক্ষণ। পাপে, অনুতাপের তীব্রতা, পুণ্যে, আত্ম-প্রসাদের উচ্চতা,

এবং কর্ত্তব্য সাধনে দৃঢ়তা ও আনন্দ। সুস্থ এবং প্রকৃতিস্থ আত্মাতে এই ত্রিবিধ লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

এই আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য সর্ব্ববিধ ধর্ম্মসাধনের মূল। যেমন সর্ব্ববিধ দৈহিক উন্নতি দৈহিক স্বাস্থ্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, তেমনি সর্ব্ববিধ আধ্যাত্মিক উন্নতি বিবেকপরায়ণতা বা কর্ত্তব্য-পরায়ণতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। জগতে একপ্রকার ধর্ম্মসাধন দেখিতে পাওয়া যায়, বিবেকপরায়ণতার সহিত যাহার বিশেষ সম্পর্ক নাই। এরূপ ধর্ম্মসাধন এদেশে বিরল নহে। এই সকল সাধক ধর্ম্মকে ভাব বিশেষের চরিতার্থতার মধ্যে নিহিত রাখিয়াছেন। তৎ তৎ ভাবের চরিতার্থতা হইলেই তাঁহারা আত্মতৃপ্ত হইয়া মনে করেন যে ধর্ম্মের অতি উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছেন। তৎপরে বিবেকের প্রতি আর দৃষ্টি থাকে না। মনে করেন সে বিষয়ে উদাসীন থাকিলেও ধর্ম্মসাধনের কোনও ব্যাঘাত হয় না। এইরূপ ধর্ম্মসাধন মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও অপবিত্রতা প্রভৃতির সহিত একত্রে নিরুপদ্রবে বাস করিয়া থাকে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম এইরূপ আংশিক ধর্ম্মসাধন হইতে মানব সমাজকে উদ্ধার করিবার জন্য এই উপদেশ দিতেছেন, ঈশ্বর ধর্ম্মাবহ ও পাপনুদ হইয়া মানব-বিবেকে প্রতিষ্ঠিত। বিবেকের যে বাণী তাহা তাঁহারই বাণী, বিবেকের অধীন হইলে তাঁহারই অধীন হওয়া হয়; এবং বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ করিলে তাঁহারই বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। এরূপ আচরণ করিয়া মুখে তাঁহার স্তুতি বন্দনা করা যেন বৃক্ষের মূল কাটিয়া শিরোভাগে জল-সেকের ন্যায়। সেরূপ পূজা ঈশ্বরকে বিদ্রূপ করা। যে

ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া, স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহার আদেশ বিরুদ্ধ আচরণ করে, সে তাঁহার পূজার অধিকারী নহে। যখন আমরা তাঁহাকে বিবেক সিংহাসনে ধর্ম্মাবহ পাপনুদ রূপে দেখিতে পাই, তখনি আমাদের হৃদয়ে ধর্ম্ম সংগ্রামের উদয় হয় ; আমাদের ইচ্ছাকে তাঁহার ইচ্ছার অনুগত করিবার জন্য প্রয়াস পাইতে থাকি ; এবং আধ্যাত্মিক বিমলতা লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হই। ইহাই তাঁহার পূজার প্রকৃত আয়োজন। ঈশ্বর করুন আমরা এইরূপ উপহারে যেন তাঁহাকে পূজা করিতে পারি।

কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ।

উপনিষদে ব্রহ্মের যত প্রকার স্বরূপ নির্ণয় করা হইয়াছে, তন্মধ্যে একটী এই ;—

"কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ"

অর্থাৎ তিনি সকল ভূতে বাস করিতেছেন ; এবং সকল ক্রিয়ার অধ্যক্ষরূপে রহিয়াছেন।

তিনি যে জড়জগতের প্রত্যেক পদার্থে বাস করিতেছেন, এবং নিজ ইচ্ছার দ্বারা জড়ের প্রত্যেক গতি ও ক্রিয়াকে নিয়মিত করিতেছেন, ইহা স্বীকার করা কঠিন নহে। ইহা বিজ্ঞান-সম্মত কথা। কারণ জড়কে বিশ্লেষণ করিলে কতকগুলি শক্তিতে উপনীত হই ; সেই শক্তি সকলকে বিশ্লেষণ করিলে এক অনন্ত, অনাদি ও অবিনাশী শক্তিতে উপনীত হই ; সে শক্তিকে আবার বিশ্লেষণ করিতে গেলে তাহাকে আত্ম-শক্তি রূপেই দেখিতে পাই। এই বিশ্লেষণ ক্রিয়ার সাহায্যে প্রাচীন কালের বৈদান্তিকদিগের ন্যায় বর্ত্তমান সময়েও অনেক পণ্ডিত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যে সেই অনন্ত লীলাময়ী পরম সত্তা ভিন্ন জড়ের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। যাঁহারা জড়বাদী তাঁহাদিগকেও স্বীকার করিতে হইতেছে যে জড় মূলে কতকগুলি শক্তির খেলা মাত্র। তৎপরে বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে, যে আপাততঃ যে সকল ক্রিয়া নানা শক্তির খেলা বোধ হইতেছে, তাহা মূলে একমাত্র শক্তির রূপান্তর মাত্র। এই শক্তিই বিবিধরূপে বিবর্ত্তিত হইতেছে। শক্তি যাহা তাহা এক ও

অবিনাশী, তাহার এক কণিকা বৃদ্ধি বা ক্ষয় হয় না। কিন্তু শক্তি শক্তি বলিয়া একটা শব্দের পশ্চাতে ধাবিত হইলে চলিবে না। দেখিতে হইবে যে শক্তি বস্তুটা কি? শক্তি প্রত্যক্ষ-লব্ধ বস্তু নহে। কেহ কখনও শক্তিকে ইন্দ্রিয়-গোচর করে নাই। আমরা সচরাচর ক্রিয়া দ্বারা এবং ঘাত প্রতিঘাত দ্বারা তাহার অনুমান করিয়া থাকি। কিন্তু অনুমান করিতে গেলেই তাহার একটী দৃষ্টান্ত চাই। যে ব্যক্তি ধূমদৃষ্টে পর্ব্বতে বহ্নির অনুমান করিতেছে, সে পূর্ব্বে কুত্রাপি নিশ্চয় ধূম ও বহ্নিকে একত্র থাকিতে দেখিয়াছে; তাহা না হইলে ধূম দেখিয়া অগ্নির অনুমান করিতে পারিত না। এখন ভাবিয়া দেখ ক্রিয়া দেখিয়া যে শক্তি নামে একটা বস্তুবিশেষের অনুমান করিতে যাইতেছ, কোথায় শক্তিকে ক্রিয়ার উৎপত্তির কারণ রূপে দেখিয়াছ? চিন্তা করিলেই দৃষ্ট হইবে যে আমরা আপনাদের আত্মাতেই শক্তিকে ক্রিয়ার উৎপত্তির কারণ রূপে দেখিয়াছি। আমরা নিয়ত দেখিতেছি আমাদের ইচ্ছাশক্তি হইতে ক্রিয়া উৎপন্ন হইতেছে। অতএব দেখিতেছি শক্তির সহিত আমাদের যে কিছু পরিচয় আছে, তাহা ইচ্ছাশক্তি বা আত্ম-শক্তি। ব্রহ্মাণ্ডে যে শক্তির অনুমান করিতেছি, তাহাও দৃষ্টান্ত অনুসারে ইচ্ছাশক্তি বা আত্ম-শক্তি। তবে ত জড় সেই পরমাত্মার পরিণামী ইচ্ছা ও জ্ঞান মাত্র। সুতরাং আমরা যখন বলি যে জড়ের বিবিধ রূপ ও ক্রিয়ার মধ্যে তিনিই অধিবাস করিয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করিতেছেন, তখন অযুক্ত কথা কিছুই বলি না।

মানবাত্মার কার্য্যেরও তিনি অধ্যক্ষ কিনা? এই প্রশ্নের বিচার করিতে গেলেই কিঞ্চিৎ বাধা উপস্থিত হয়। জড়জগতে যেমন সহজে বিশ্লেষণ ক্রিয়ার দ্বারা মূল সিদ্ধান্তে উপনীত হই, আত্মা সম্বন্ধে সেরূপ সহজ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কারণ যে আত্মবোধ বা চিদালোক দ্বারা আমাদের আত্ম-জ্ঞান ও জড়ের জ্ঞান সম্ভব হয়. সেই আত্মবোধ বা চিদালোক আমাদের নিকটে কতকগুলি অদ্ভুত তত্ত্বকে প্রকাশ করে। প্রথম অদ্ভুত তত্ত্ব নিজের পার্থক্য জ্ঞান। আমি এই ব্রহ্মাণ্ডে এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি, আমি এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ হইতে বিভিন্ন, আমি অপর আত্মা হইতে বিভিন্ন, এবং আমি সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে অপরিবর্ত্তিত। এই জ্ঞান আমাদের স্বভাব-নিহিত; ইহাকে আমরা মন হইতে উৎপাটিত করিতে পারি না। ইহার অতিক্রম করিতে পারি না। ইহাকে এই কারণে অদ্ভুত বলা গিয়াছে. যে দেহের প্রত্যেক পরমাণুর ন্যায় মনের প্রত্যেক চিন্তা ও ভাব প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে, অথচ এই স্বাতন্ত্র্য জ্ঞান ও একত্ববুদ্ধি বিলুপ্ত হইতেছে না। দ্বিতীয় তত্ত্ব নিজের আত্মার অপূর্ণতা জ্ঞান। ইহাও স্বাভাবিক। আমরা নিয়ত অনুভব করিতেছি যে আমাদের জ্ঞান অপূর্ণ অর্থাৎ তাহা সত্যের সমব্যাপী নহে; আমাদের শক্তি অপূর্ণ অর্থাৎ তাহা ইচ্ছার সমব্যাপী নহে। এই অপূর্ণতা জ্ঞান আমরা কোনও প্রকারেই পরিহার করিতে পারিতেছি না। তৃতীয়তঃ আমাদের আত্মা সম্বন্ধে আর একটী অদ্ভুত তত্ত্ব এই, আমাদের

কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি বা স্বাধীনতা-জ্ঞান। আমরা অনুভব করি যে আমাদের ইচ্ছা স্বাধীন। অথচ বিচার দ্বারা দেখিলে আপনাদের স্বাধীনতার ক্ষেত্রই দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন আমরা ইচ্ছা করিয়া এ জগতে আসি নাই, ইচ্ছা করিয়া যাইব না, ইচ্ছা করিয়া থাকিতেছি না, যখন প্রত্যেক ঘটনা দুর্ভেদ্য কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ তখন আমি আর স্বাধীন কিসে? অথচ আমি অনুভব করিতেছি যে খাঁচার পাখীর ন্যায়, জীবন নামে এই যে এক হাত জমি আমাকে দেওয়া হইয়াছে আমি ইহার মধ্যে স্বাধীন। সুতরাং আমি জগদাত্মার সহিত আপনাকে অভিন্ন ভাবিতে পারিতেছি না। আমাদের আত্মবোধ-লব্ধ এই ত্রিবিধ তত্ত্বকে অতিক্রম করা অতীব দুষ্কর। কেহ বলিতে পারেন এই দ্বৈতভাব ভ্রান্তি-জনিত। যেমন জগতের সকল লোকই অনুভব করে যে পৃথিবী স্বীয় স্থানে স্থিরভাবে আছে এবং সূর্য্যই পৃথিবীর চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে; অথচ তাহা একটী ভ্রান্তিমাত্র, তেমনি জীবও ব্রহ্মের পার্থক্য জ্ঞান অথবা জড় ও চেতনের পার্থক্য জ্ঞান স্বভাবসিদ্ধ হইলেও ভ্রান্তিপ্রসূত; মূলে কোনও পার্থক্য নাই। ইহা বলিলে উত্তর দিবার উপায় নাই। আমা-দের বৃত্তি সকলের সত্যবাদিতাতে বিশ্বাস করা ভিন্ন গতি নাই। তাহা না করিলে সর্ব্বগ্রাসী সংশয়ে উপনীত হইতে হয়। যদি কেহ আমার স্মৃতির সত্যবাদিতাতে অবিশ্বাস করিয়া বলেন কে বলিল, যে ব্যক্তি বিগত রবিবারে উপদেশ দিয়াছিল আজও সেই ব্যক্তিই উপদেশ দিতেছে, এ অভিন্নতা জ্ঞান ভ্রান্তি মাত্র,

সে উপদেশ দিয়া ছিল "রাম" এ উপদেশ দিতেছে "হরি," তাহা হইলে নিরুত্তর। যে স্মৃতির দোহাই দিয়া নিজের অভিন্নতা প্রতিপন্ন হইবে, তাহার সত্যবাদিতাতেই সন্দেহ, সুতরাং বিচারের আর উপায় নাই। সেইরূপ যদি কেহ বলেন ঐ যে বৃক্ষপত্র গুলিকে হরিদ্বর্ণ বোধ করিতেছ উহা ভ্রান্তি, উহা হরিদ্বর্ণ নহে, যোগীগণ যোগনেত্রে উহাদিগকে পীতবর্ণ দেখিয়া থাকেন, এবং তাহাই সত্য। তাহা হইলেও নিরুত্তর। মনে মনে বলি যখন যোগী হইব তখন না হয় পীত বলিব, এখন ত হরিদ্বর্ণই বলি। সেইরূপ অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ ইহার মধ্যে কোনটী যুক্তিযুক্ত; এই মহাতর্কে প্রবিষ্ট না হইয়া এইমাত্র বলি, বস্তু মূলে এক কি দুই সে সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি না, এখন ত আপনাকে জগৎ হইতে ও জগদাত্মা হইতে পৃথক দেখিতেছি, এখন তাহাই ভাবি, ও তদনুসারে কার্য্য করি। যে কারণেই হউক, যেরূপেই হউক, জগদাত্মা আমাকে একটু স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দিয়াছেন, আমি সেই টুকুর উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকি। এই দ্বৈতভাব অনুভব করিয়াই উপনিষদে ঋষি বলিয়াছেন,—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।"

অর্থ—"দুই সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট পক্ষী এক বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।" দুই সুন্দর পক্ষ বিশিষ্ট পক্ষী জীবাত্মা ও পরমাত্মা। ইঁহারা উভয়ে এক দেহকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছেন। ইঁহাদের একজন আশ্রয় অপরে আশ্রিত। এই নিগূঢ় সম্বন্ধ কি প্রকার তাহা বাক্যে প্রকাশ চিন্তাতে ধারণা হয় না;

করাও সহজ নহে। এই সম্বন্ধ যেন বক্তা ও বাক্যের সম্বন্ধের ন্যায়। বাক্য বক্তার ইচ্ছা হইতেই উৎপন্ন; বক্তার ইচ্ছাতেই স্থিত; তাহা বক্তাকে ছাড়িয়া থাকে না; অথচ বাক্য বক্তা নহে, বক্তার ক্ষুদ্রতম প্রকাশ মাত্র; সেইরূপ এই জগৎ ও এই আত্মা সেই বিশ্বাত্মারই প্রকাশ মাত্র. তাঁহা হইতেই উৎপন্ন এবং তাঁহাতেই স্থিত, অথচ ইহা তিনি নহেন, তাঁহার ক্ষুদ্রতম অংশমাত্র। ইহা বলিলেও সে সম্বন্ধের কিছুই প্রকাশ করা হইল না।

যাহা হউক, আমি আপনাকে তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া জানিতেছি বলিয়াই তিনি আমার উপাস্য হইয়াছেন এবং আমি তাঁহার উপাসক হইয়াছি; নতুবা উপাস্য উপাসক সম্বন্ধও থাকে না। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই এক গুরুতর প্রশ্ন উদিত হইতেছে। যদি এই দেহ-মন্দিরে জীব ও ব্রহ্ম উভয়েই বাস করিতেছেন, তবে অধ্যক্ষতা কাহার? কোন্ কার্য্য আমার আর কোন্ কার্য্য তাঁহার? দুই জনেই ইচ্ছাময় পুরুষ এবং দুই জনেই স্বাধীন, তবে একের প্রতি অপরের অধ্যক্ষতা কোন্ সূত্রে ও কোন্ বিষয়ে? উভয়ের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া একের প্রতি অপরের অধ্যক্ষতা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তরে একমাত্র বলা যাইতে পারে যে, তিনি দুই প্রকারে আমাদের কর্ম্মের উপরে অধ্যক্ষতা করিতেছেন। প্রথমতঃ—এরূপ অনেক কার্য্য আমাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতেছে যাহার উপরে আমাদের হাত নাই, অথবা হাত থাকিলেও আমরা প্রবৃত্তির এতদূর বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতেছি যে,

সে কার্য্যের সহিত পশুপক্ষীদিগের কার্য্যের কোনও প্রভেদনাই; তাহাকে অন্ধ প্রবৃত্তির কার্য্য বলিলেও বলা যায়। আমরা যে ক্ষুধাকালে আহার করি, বা নিদ্রার সময়ে নিদ্রা যাই, কিম্বা মনে কর জননী যে স্তন্য দান করিয়া শিশুকে পালন করেন, এ সকল কার্য্য আমরা অনিবার্য্য প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াই করি। ইহাতে আমাদের হাত নাই। এ সকল কার্য্যে ইতর প্রাণী হইতে আমাদের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। এ সকল কার্য্য আমরা তাঁহার অধীন থাকিয়াই করি। এই সকল কার্য্যের প্রকৃতি ও তাহার ফল বিবেচনা করিলে বিধাতার বিধাতৃত্ব শক্তির লীলা দেখিয়া অবাক হইতে হয়। আমরা বোধশীল জীব, সকল প্রকার কার্য্যেরই ফলাফল আমরা বিচার করিতে পারি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য এই শ্রেণীর কার্য্য সকল করিবার সময় তাহার ফলাফল আমাদের বিচার মধ্যে আসে না। কে কবে আহার করিবার সময়ে চিন্তা করিয়া থাকেন, দেহের পরিপুষ্টি হইবে বলিয়াই আহার করিতেছি, অথবা কোন্ জননী শিশুকে স্তন্য দান করিবার সময় চিন্তা করিয়া থাকেন, আমার দ্বারা ঈশ্বর এই শিশুকে পালন করাইয়া লইতেছেন। আমরা অন্ধভাবে প্রবৃত্তির দ্বারাই চলি, কিন্তু তিনি আমাদিগের কার্য্যের দ্বারা তাঁহার মঙ্গলকর উদ্দেশ্য সাধন করিয়া লন। বর্ত্তমান সময়ের উন্নত শিক্ষাপ্রণালীতে যেমন শিশুদিগকে খেলার ভিতর দিয়া শিক্ষা দিয়া থাকে; শিশুরা মনে করে যেন খেলা করিতেছে, অথচ ভিতরে ভিতরে অনেক বিষয় শিক্ষা করে; সেইরূপ আমাদের সকলের উপরে কার্য্যাধ্যক্ষ রূপে যিনি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন,

তিনিও আমাদিগকে সুখ, আমোদ, খেলা দিয়া আমাদিগের দ্বারাই তাঁহার বিশ্বরাজ্যের ইষ্ট সিদ্ধ করিয়া লন।

তিনি আর একভাবেও আমাদের কর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়া রহিয়াছেন। আমরা স্বাধীনভাবে যতই কাজ করি না কেন, আপনাদের কার্য্যের দ্বারা নিজের বা অপরের যতই সুখ বা দুঃখ উৎপন্ন করি না কেন,—তিনি আমাদের কার্য্যসমষ্টির চরমগতিকে আশ্চর্য্যভাবে নিয়মিত করিয়া কল্যাণের অভিমুখে প্রেরণ করিয়া থাকেন। যেমন ধানুকীর ধনু হইতে বাণ নিক্ষিপ্ত হইলে, সেই বাণ যতই বেগে, যতই ঊর্দ্ধে যতই সরল বা তির্য্যকভাবে ধাবিত হউক না কেন, যেমন মাধ্যাকর্ষণের দূরতিক্রমণীয় নিয়মের প্রভাবে তাহাকে বক্রাকার রেখাপথে যাইতেই হয়, তেমনি যতই এ জগতে নড়ি, চড়ি কার্য্য করি না কেন, সেই কর্ম্মাধ্যক্ষ পুরুষের দূরতিক্রমণীয় ধর্ম্ম নিয়মের প্রভাবে আমাদের কার্য্য তাঁহারই শাসনাধীন হয়।

তৃতীয়তঃ তিনি আর এক ভাবে আমাদের কার্য্যের উপরে অধ্যক্ষরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। মানবাত্মার পক্ষে নিয়ম এই, যে শাসনশক্তি মানবের নিজ আত্মা ও নিজ ইচ্ছা হইতে সমুদ্ভূত হয়, ও তাহার নিজের কার্য্য সকলকে নিয়মিত করে, তদ্দ্বারা মানব বলীয়ান ও উন্নত হয়, কিন্তু যে শাসন শক্তি বাহির হইতে আসে ও মানবের কার্য্যকে সংস্কুচিত করে, তদ্দ্বারা মানবেব দুর্ব্বলতা আসে। কেবল এক স্থলেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। একটী মাত্র স্থল আছে, যেখানে মানুষ পূর্ণ অধীন হইয়াও পূর্ণমাত্রায় স্বাধীন থাকে। তাহা

প্রেমের স্থলে। যেখানে প্রেম আছে, সেখানে একজন অপরের অধীন হয়, অথচ সে অধীনতাকে অধীনতা বলিয়া মনে করে না, বরং সর্ব্বোচ্চ স্বাধীনতা বলিয়াই অনুভব করে। একের উপরে অপরের এ প্রকার অধ্যক্ষতা আমরা সংসারে নিয়ত দেখিতেছি। স্বাধীন পুরুষে স্বাধীন পুরুষে এ প্রকার যোগ সর্ব্বদাই ঘটিতেছে। সেই কর্ম্মাধ্যক্ষ পুরুষও আমাদের সহিত এই প্রকার যোগই চান এবং সেই জন্যই আমাদিগকে কিয়ৎ-পরিমাণে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন। আমরা ইতরপ্রাণীর ন্যায় অন্ধ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার অধীন থাকি, অথবা ক্রীতদাসের ন্যায় ভয়ভীত হইয়া তাঁহার অধীন হই, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে; তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে তাঁহাকে জানিবার ও প্রীতি করিবার অধিকার দিতেন না। আমাদিগকে অনায়াসে নিজের অধীন রাখিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি আমাদিগকে স্বাধীন করিয়া প্রেমের অধিকারী করিয়াছেন; তাহার গুণেই আমরা তাঁহাতে প্রীতি স্থাপন করিয়া তাঁহার মঙ্গল নিয়মের অধীন হইতে পারি। প্রেমই প্রকৃত স্বাধীনতা; এবং ইহাতে মানবাত্মার সমুদয় শক্তির পূর্ণ বিকাশ। এই প্রেমের অদ্ভুত নিয়ম লক্ষ্য করিয়াই সাধুরা বলিয়াছেন,—"যে আপনাকে রাখে সে আপনাকে হারায়, যে আপনাকে হারায় সেই আপনাকে পায়।" সেই পরমপুরুষের প্রতি এই প্রেম যখন স্থাপিত হয়, তখন তাঁহার সহিত এক নূতন সম্বন্ধ দেখা দেয়; এবং মানব-ইচ্ছা এক বিচিত্র প্রণালীতে তাঁহার ইচ্ছার অধীন হইয়া থাকে।

পরিবারে ধর্ম্মসাধন।

প্রথম উপদেশ।

"স সেতু বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়।"

উপনিষদে এই জগতের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধবাচক যত বচন আছে, তন্মধ্যে একটী উৎকৃষ্ট বচন এই—"স সেতু বিধৃতি-রেষাং লোকানামসম্ভেদায়।" অর্থাৎ তিনিই সেতু স্বরূপ হইয়া এই সকল লোককে ধারণ করিয়া আছেন, ইহাদিগকে বিনষ্ট হইতে দিতেছেন না। কৃষকগণ স্বীয় স্বীয় ক্ষেত্রে জল আবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য মৃন্নির্ম্মিত সেতু দ্বারা ক্ষেত্র সকলকে আবেষ্টিত করিয়া রাখে, ইহা সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। প্রশ্ন এই, কৃষকের সেতু দ্বারা জল যেমন ক্ষেত্রে বিধৃত হইয়া থাকে, তেমনি কোন শক্তির দ্বারা লোক সকল স্বীয় স্বীয় স্থানে বিধৃত হইয়া রহিয়াছে, উৎসন্নদশা প্রাপ্ত হইতে পারিতেছে না? সূর্য্য চন্দ্রাদি গগনবিহারী জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সম্বন্ধে আমরা এই কথা বলি যে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে তাহাদের পরমাণু সকল বিধৃত হইয়া রহিয়াছে, তাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উৎসন্নদশা প্রাপ্ত হইতে পারিতেছে না। যে অন্তর্নিহিত শক্তির প্রভাবে জড়ীয় পরমাণু সকলের মধ্যে ঘননিবিষ্টতা রক্ষিত হইতেছে, তাহার প্রকৃতি কি বিচিত্র, তাহা আলোচনা করিবার সময় ও স্থান এ নহে। যে শক্তির প্রভাবে মানব-সমাজ দৃঢ়-সম্বন্ধ আছে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা অদ্যকার উদ্দেশ্য।

মানব-সমাজের স্থিতি ও উন্নতি এক গভীর রহস্য। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদকুল বহু বহু কাল এ জগতে বাস করিতেছে। অতি প্রাচীনতম কালেও তাহাদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তৎপরে তাহাদের সংখ্যাও যে জগতে অল্প ছিল তাহাও নহে! কত কত অরণ্যানী ঐ সকল শ্বাপদে পূর্ণ ছিল। প্রশ্ন এই, এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তাহারা কেন সমাজবদ্ধ হইতে পারে নাই? তাহারা যদি সমাজবদ্ধ হইতে পারিত, যদি একের দুঃখে অপরে দুঃখী হইতে জানিত, যদি একের বিপদে অপরে সহায় হইত, যদি সমগ্রভাবে স্বজাতির উন্নতি সাধনে মনোযোগী হইতে জানিত, তাহা হইলে মানবকুল তাহাদিগকে এরূপে নিধন প্রাপ্ত করিতে পারিত না। কিন্তু এই সকল গুণের অভাবে তাহারা সমাজ-বদ্ধ হইতে পারে নাই; প্রত্যেকে কতকগুলি বিরুদ্ধগুণসম্পন্ন হওয়াতে তাহারা পরস্পরের সহিত বিবাদ-পরায়ণ হইয়া বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করি যেরূপ বিরুদ্ধগুণসম্পন্ন হওয়াতে শ্বাপদকুল চিরদিন একা একা বিচরণ করিতেছে, তদনুরূপ সমাজবিরোধী গুণ কি মানবে বিদ্যমান নাই? স্বার্থপরতা, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, নৃশংসতা কি মানব-মনে অল্প আছে? জগতের ইতিবৃত্ত দেখ, অদ্যাপি জাতিবৈরস্থলে দর্শন কর, মানব মানবের প্রতি যে নৃশংসতা প্রকাশ করিয়াছে ও করিতেছে, তদনুরূপ নৃশংসতা কোনও শ্বাপদ অপর কোন পশুর প্রতি কি কোনও-দিন করিয়াছে? জগতের শ্বেতবর্ণ বিজেতা জাতিগণ কৃষ্ণকায় বিজিত জাতিদিগের প্রতি চিরদিন যে অত্যাচার করিয়াছে এবং

অদ্যাপিও করিতেছে তাহা স্মরণ করিলে মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে কাহার না মস্তক লজ্জাতে অবনত হয়? সম্প্রতি তুরস্কদেশীয় মুসলমানগণ আর্ম্মেনিয়াবাসী খ্রীষ্টীয়দিগের প্রতি যে ভীষণ হত্যাকাণ্ড করিয়াছে. তাহার বিবরণ পাঠ করিয়া কাহার না শরীরের শোণিত উষ্ণ হয়? দেখিলে বোধ হয়. মানবের অন্তরে এরূপ শ্বাপদ আছে, যাহাকে উত্তমরূপে শৃঙ্খলিত না রাখিলে মহা অনর্থ উৎপাদন করিতে পারে? বল দেখি মানবের এই শ্বাপদ প্রবৃত্তিকে কে শৃঙ্খলিত রাখিয়াছে? উপনিষদের প্রদত্ত উত্তর এই—"ঈশ্বর সেতুস্বরূপ হইয়া ইহা-দিগকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিতেছেন।" ইহা আপাততঃ অনেকের পক্ষে কবিত্ব বা কিঞ্চিৎ অত্যুক্তি বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। কিন্তু ইহা কবিত্ব বা অত্যুক্তি নহে। ইহার অর্থ এই, যে সকল গুণের প্রভাবে মানবসমাজ সুরক্ষিত হইতেছে, তাহা ঈশ্বরেরই স্বরূপ-নিহিত। সে গুণগুলি কি? উত্তর—সত্য, ন্যায়, প্রেম, পবিত্রতা। তিনি সত্যস্বরূপ. ন্যায়স্বরূপ, প্রেমস্বরূপ ও পবিত্রস্বরূপ। ইহার বিরোধী যাহা অর্থাৎ অসত্য, অন্যায়, অপ্রেম, ও অপবিত্রতা. তাহাদেরই গতি সমাজ ভগ্ন করিবার দিকে; সত্য, ন্যায়, প্রেম ও পবিত্রতার গতি সমাজস্থিতি রক্ষার দিকে। মানব হৃদয়ে সত্য, ন্যায় প্রেম ও পবিত্রতা আছে বলিয়াই, অর্থাৎ মানবাত্মাতে ঈশ্বরাংশ বিদ্যমান বলিয়াই লোকস্থিতি রক্ষিত হইতেছে।

অতএব এ সত্য সকলেরই অনুভব করা কর্ত্তব্য যে ঈশ্বর স্বয়ং আপনাতে মানবসমাজকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন, এবং

মানবসমাজ মানবাত্মার রক্ষা ও শিক্ষার জন্য তাঁহার একটী উৎকৃষ্ট বিধান। এই তত্ত্ব প্রতীতি না করাতেই এদেশে সমাজ-বিরোধী ধর্ম্মভাবের অভ্যুদয় হইয়াছে। এদেশের চিরপ্রচলিত সংস্কার এই জনসমাজে থাকিয়া উন্নত ধর্ম্ম সাধিত হইতে পারে না। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এদেশীয়দিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে জনসমাজে থাকিয়াও উন্নতধর্ম্মের সাধন হয়; আমরা বলিতেছি,—জনসমাজই উন্নতধর্ম্ম সাধনের প্রকৃত স্থান। ইহা অতীব সত্য কথা। নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলেই দৃষ্ট হইবে, যে যে সকল গুণাবলী লইয়া ধর্ম্মজীবন গঠিত হয়, যথা ঈশ্বর-প্রীতি মানব-প্রীতি, সত্যনিষ্ঠা, নিঃস্বার্থতা, সংযম, বৈরাগ্য প্রভৃতি তৎসমুদায় মানবসমাজের সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্যের সহিত মানবাত্মার সংঘর্ষণ না হইলে প্রস্ফুটিত হয় না; সংগ্রাম ভিন্ন তাহারা কেহই দৃঢ়ভিত্তির উপরে স্থাপিত হয় না। জনসমাজই তাহাদের সংগ্রামের প্রধান স্থান, সুতরাং জনসমাজই তাহাদের বিকাশের প্রধান ক্ষেত্র। যদি কেহ বলেন, একান্তে নির্জ্জন বনে থাকিয়া ঐ সকল বিকশিত হইতে পারে; মানব-সমাজের সহিত সংগ্রামে না আসিয়াও মানব প্রীতি বর্দ্ধিত হইতে পারে, পাপ প্রলোভনের সহিত সাক্ষাৎকার না হইয়াও সংযম বর্দ্ধিত হইতে পারে; জীবের দুঃখের সহিত সংস্রব না হইয়াও দয়ার উদ্দীপন হইতে পারে; তবে তাঁহার মতে নিজগৃহে দ্বাররুদ্ধ করিয়া দাবা খেলার কাষ্ঠফলকে রাজা, মন্ত্রী, অশ্ব, গজ প্রভৃতি লইয়া কল্পিত সংগ্রাম করিয়াও একজন স্বদেশ-হিতৈষী

সেনাপতি বীর হইতে পারে !! বরং নির্জ্জন বনবাসী সাধকের অপেক্ষা, দাবাখেলার সাধকের অবস্থা ভাল। কারণ সে কল্পিত সংগ্রামও করে ; বনবাসী সাধকের যে তাহাও নাই।

শালগ্রাম শিলা কেমন সুগোল ও সুন্দর ! দেখিতে চক্ষের কেমন স্পৃহণীয় ! যদি কোনও কারিকরকে পাষাণখণ্ড খুদি া ঐরূপ সুন্দর বৃত্তাকার করিতে হয়, তবে তাহা কত শ্রমের কার্য্য ! কিন্তু ঐ শালগ্রাম শিলার অনুরূপ সহস্র সহস্র বৃত্তাকার পাষাণ খণ্ড গিরিপাদবাহিনী নিঝ´রিণীর জলে পাওয়া যায়। কোনও মানবের শ্রম তাহা উৎপন্ন করে না। গিরিপৃষ্ঠ-বিচ্যুত পাষাণখণ্ড নদী-প্রবাহ দ্বারা নীত হইয়া পরস্পরের সংঘর্ষণে ঐ প্রকার বৃত্তাকার ও সুন্দর হইয়া থাকে। সেইরূপ তুমি আমি যে জনসমাজে প্রতিনিয়ত বিচরণ করিতেছি, ইহা কি অনুভব কর, যে তুমি আমিও পরস্পরের সহিত সংঘর্ষণ দ্বারা ঐরূপ বৃত্তাকার হইতেছি, অর্থাৎ শিক্ষিত ও উন্নত হইতেছি ? মানবাত্মার শিক্ষার জন্যই মানব সমাজের সৃষ্টি। ইহা বিজ্ঞানের প্রমাণিত সত্য। আধুনিক বিজ্ঞান এক নূতন তত্ত্বর আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার নাম জীবনসংগ্রাম। এই জীবন সংগ্রামের অর্থ এই,—কি উদ্ভিদজগতে, কি প্রাণিরাজ্যে, কি মানব-সমাজে সর্ব্বত্রই নিরন্তর সংগ্রাম, অর্থাৎ জীবে জীবে, সংঘর্ষণ চলিয়াছে, সেই সংগ্রামে যে সুগুণসম্পন্ন সেই বাঁচিয়া যায়, যে গুণহীন সে নিধন প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতির কার্য্য প্রণালী দেখিলে এইরূপ বোধ হয়, যেমন কোনও শিকারী দুইটী উড্ডীয়মান পক্ষীকে মারিবার জন্য নিজ বন্দুকে বিংশতিটী

ছিটাগুলি পূরে, তাহার দুইটী দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হয় আর অষ্টাদশটী কেবল সেই দুইটীর বল বৃদ্ধি করে, নতুবা অপরদিকে দেখিতে যেন বৃথা যায়, তেমনি প্রকৃতি বিংশতিটীর দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি করিবার উদ্দেশে শতটী জীব সৃষ্টি করেন; সেই শতটী জীবের মধ্যে অশীতিটী উক্ত বিংশতিটীকে শক্তিশালী করিয়া দিয়া অকালে নিধন প্রাপ্ত হয়। এ কি বিস্ময়জনক ব্যবস্থা !! ইহাতে ভাল মন্দ যিনি যেরূপ বিচার করিতে হয় করুন, ইহাই প্রকৃতি রাজ্যের ব্যবস্থা। সংগ্রামের দ্বারাই শক্তির বিকাশ।

অতএব জনসমাজই মানবচরিত্রের মহত্ত্ব বিকাশের প্রকৃত স্থান। জনসমাজ যদি মানবের ধর্ম্মজীবনের বিকাশের নিমিত্ত ঈশ্বরের বিধান স্বরূপ হইল, তাহা হইলে জনসমাজের ভিত্তি স্বরূপ পরিবারও যে ঈশ্বরের বিশেষ বিধান, তাহাও সহজে অনুমান করিতে পারা যায়। যে সকল শ্রেষ্ঠ সদ্‌গুণ আজীবন মানবকে এজগতে উন্নত ও সুখী করে তাহার অভ্যুদয়, রক্ষা, শিক্ষা, ও বিকাশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান পরিবার।

প্রথম, পরিবারের ভিত্তিস্থাপন প্রণয় ও পরিণয়ে। পুরুষ ও রমণী যখন প্রণয় দ্বারা পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হন, তখন কি তাঁহারা অনুভব করেন, ঈশ্বর কিরূপ বিদ্যালয়ে তাঁহাদিগকে ভর্ত্তি করিতেছেন ? তাঁহারা তাঁহাদের স্বভাব-নিহিত প্রবৃত্তির গুণেই পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন, কিন্তু বিধাতার মঙ্গলময় হস্তে এই প্রণয়, তাঁহাদের উভয়ের শিক্ষা ও বিকাশের একটী অদ্ভুত যন্ত্রস্বরূপ

হয়। মানুষ আপনাকে না ভুলিলে অপরে ডুবিতে পারে না। যেখানে আত্ম-বিস্মৃতি নাই, কিন্তু স্ব-সুখ-পরতা আছে, সেখানে প্রণয় নাই, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে। প্রণয়ের মূল মন্ত্র আত্ম-বিস্মৃতি। আত্ম-বিস্মৃতি দিয়া যে শিক্ষার আরম্ভ, তাহার আধ্যাত্মিক ফল কিরূপ তাহা একবার ধীরচিত্তে চিন্তা কর। এইজন্য অনেকবার দেখা গিয়াছে, একজন পুরুষ, দুর্বৃত্ত যথেচ্ছাচারী, নিকৃষ্ট সুখপ্রিয়, ও নিকৃষ্টচেতা ছিল ; কালক্রমে কোনও পবিত্রহৃদয়া রমণীর সহিত প্রণয়ে আবদ্ধ হইল ; সেই প্রণয় তাহাকে নবজীবন ও ধর্ম্মজীবন আনিয়া দিল ; সেই প্রণয় তাহাকে জন্মের মত পাপপথ হইতে উদ্ধার করিল ! প্রণয়ের মহিমা কোনও কবি বর্ণন করিতে সমর্থ হন নাই, সুতরাং আমিও সে প্রয়াস পাইব না। কেবল মাত্র নিগূঢ়ভাবে এই রহস্যের বিষয়ে একবার চিন্তা করিয়া দেখ, যে পিতা, মাতা, ভ্রাতা ভগিনী যাহাদের মধ্যে মানুষ জন্মগ্রহণ করিল, ও যাহাদের ক্রোড়ে চিরদিন প্রতিপালিত হইল, তাঁহারা যে হৃদয়কে আকৃষ্ট ও সম্পূর্ণ সুখী করিতে পারিলেন না, সেই হৃদয়কে অপর একজন তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া এরূপ আকৃষ্ট ও সুখী করিল, যে তাহার হস্তে দেহ, মন, প্রাণ, যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া মানুষ আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিল, ও তাহার সঙ্গে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে চলিয়া গেল। কি বিশ্বাস, কি নির্ভর ! যাহাতে মানব হৃদয়কে এই শিক্ষা দেয় তাহাতে কি বিধাতার হস্ত নাই ?

প্রণয় ও পরিণয় হইতে পরিবারের উৎপত্তি, তৎপরে

প্রতিপদেই আধ্যাত্মিক শিক্ষা। মানবচরিত্রকে যে সকল সদ্‌গুণে সমুন্নত করে, তন্মধ্যে প্রীতি, নিঃস্বার্থতা, সংযম, ও দায়িত্ববোধ বা কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রধান। চিন্তা করিয়া দেখ পিতা মাতার ক্রোড়ে শিশু সন্তান জন্মিলেই তাঁহাদের অন্তরে এই চারিটী সদ্‌গুণের বিকাশ হয় কি না? প্রথমতঃ স্নেহের কি অপূর্ব্ব শক্তি! ইহা মনকে পবিত্র সুস্নিগ্ধ ও নিঃস্বার্থ করে। পিতা মাতার স্নেহ, এবং শিশু সন্তানদিগের কপটতাশূন্য, চাতুরীশূন্য, সরলতাপূর্ণ গতিবিধি এই উভয়ে মিলিয়া পরিবার মধ্যে এমন এক প্রকার পবিত্রতার বায়ু প্রস্তুত করে, যাহাতে বাস করিলে উত্যক্ত চিত্ত পবিত্র ও শান্ত হয়। স্নেহ পিতা মাতার চিত্তকে কেমন সুকোমল ও সুস্নিগ্ধ করে। তাহা কি তাঁহাদের পক্ষে এক সুমহৎ শিক্ষা নহে। ইহা কতবার দেখিয়াছি যে একজন উদ্ধত, গর্ব্বিত, আত্মম্ভরী ও নীরসহৃদয় পুরুষ যাহাকে কেহই এবং কিছুতেই নরম করিতে বা বাঁধিতে পারে নাই, তাহাকে একটী ক্ষুদ্র শিশু এমনি বাঁধিয়াছে, যাহা একগাছি তৃণের দ্বারা একটি মদমত্ত বারণকে বাঁধা অপেক্ষা কোনও অংশেই অল্প বিস্ময়কর নহে। এ কেমন শিক্ষা, এ কেমন গুরুর বিদ্যালয়!

তৎপরে নিঃস্বার্থতা; স্নেহই নিঃস্বার্থতা আনিয়া দেয়। সন্তানদিগের কল্যাণ-চিন্তায় পিতামাতাকে নিজ নিজ স্বার্থ ভুলিয়া যাইতে হয়। আপনারা না খাইয়া তাহাদিগকে খাওয়াইতে হয়, আপনারা না পরিয়া তাহাদিগকে পরাইতে হয়। ইহা কেমন শিক্ষা! তৃতীয়তঃ এই সঙ্গে সঙ্গেই সংযম

অভ্যাস হইয়া যায়। সন্তানদিগের মুখ চাহিয়া পিতামাতাকে সর্ব্বদাই স্বীয় স্বীয় প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে হয়। তাঁহারা যথেচ্ছ বিহার করিতে পারেন না; যথেচ্ছ সঞ্চরণ করিতে পারেন না; যথেচ্ছ নিজ সুখবাসনাকে চরিতার্থ করিতে পারেন না; আপনাদের প্রবৃত্তি, রুচি, বাসনা প্রভৃতিকে সংযত করিয়া চলিতে হয়। ইহাতে কি তাঁহাদের চরিত্রকে দৃঢ়, উন্নত, ও আধ্যাত্মিক-ভাব-সম্পন্ন করে না? চতুর্থতঃ দায়িত্ব-বোধ; পরিবারের ন্যায় দায়িত্ব-বোধ শিক্ষার উপযুক্ত স্থান কোথায় আছে? এই পারিবারিক ব্যবস্থার বিষয়ে চিন্তা কর, শিশুটী আপনার মনে একাকী খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, বা পার্শ্বে শয়ন করিয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে, আর পিতা মাতা একাগ্রচিত্তে তাহার রক্ষা শিক্ষা, এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে প্রবল চিন্তাতে নিমগ্ন রহিয়াছেন। এ কেমন দৃশ্য! যে নিজের জন্য চিন্তা করিতে জানে না, ঈশ্বর তাহার জন্য চিন্তা করিবার লোক নিযুক্ত রাখিয়াছেন, এ কেমন বন্দোবস্ত! ইহাকেও যদি বিধাতার লীলা না বল তবে বিধাতার লীলা কোথায় দেখিবে? ইহা দেখিয়াই প্রাচীনকালের সাধুগণ পিতা মাতাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়াছিলেন; তাহা কি অত্যুক্তি? যিনি জনক জননীকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া দেখিতে সমর্থ নহেন তাঁহার বিশ্বাস-চক্ষু পাইতে এবং বিধাতার বিধাতৃত্বের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে এখনও বিলম্ব আছে। দায়িত্ববোধের ন্যায় মানব চরিত্রকে গঠন করিবার উপাদান অতি অল্পই আছে। সুতরাং পরিবার ও পারিবারিক জীব-

নের ন্যায় মানবের ধর্ম্মজীবন গঠনের অনুকূল স্থান অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

পিতা মাতার পক্ষে যেরূপ, সন্তানদিগের পক্ষেও সেই-রূপ। যেমন কুলায়ের মধ্যে পক্ষিশাবক, জল ঝড় হইতে সুরক্ষিত হইয়া নিরাপদে বাস করে, সেইরূপ গৃহমধ্যে মনুষ্য-শিশু সমাজের বিবাদ বিদ্রোহ পাপ তাপের উত্তাপ হইতে সুরক্ষিত হইয়া বাস করে; এবং পিতা মাতার সন্নিধানে থাকিয়া, বিশ্বাস নির্ভর, গুরু-ভক্তি, আত্মশাসন শিক্ষা করে। ইহার সকলগুলি ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি স্থাপন বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করে। ইহার মধ্যে গুরু-ভক্তি ও আত্ম-শাসন সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। বয়োজ্যেষ্ঠ ও জ্ঞান-বৃদ্ধদিগের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা ভক্তি মানবের ধর্ম্মজীবনের একটী প্রধান উপাদান। এই শ্রদ্ধা ভক্তি যে চিত্তে নাই, তাহাতে বিনয় নাই এবং তাহাতে ঈশ্বর-ভক্তিও সমুচিতরূপে বর্দ্ধিত হইতে পারে না। বিনয় ধর্ম্মের প্রসূতি, ইহা ব্যতীত ধর্ম্ম-জীবন গঠন হয় না। এই বিনয়, ভক্তিভাজন ব্যক্তিদিগের চরণে বাস না করিলে জন্মে না। কেবলমাত্র উপদেশের দ্বারা ইহা মানবচরিত্রে বর্দ্ধিত করা কঠিন। এই জন্যই বিধাতা পরিবার মধ্যে এই ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, অল্পবয়স্ক বয়ো-বৃদ্ধদিগের সঙ্গে, দুর্ব্বল সবলের সঙ্গে, অজ্ঞ অভিজ্ঞের সঙ্গে, একত্র বাস করিবে! এতদ্দ্বারা চরিত্রে বিশ্বাস, নির্ভর, বিনয়, ভক্তি প্রভৃতির বিকাশ হয়। তৎসঙ্গে সঙ্গে আত্ম-শাসনের ও শক্তি জন্মে। শিশুর স্বভাব এই যে, যাহা তাহার পক্ষে

প্রীতিকর তাহাই সে লইতে চায়। প্রবৃত্তিকে যে নিরোধ করিতে হয়, তাহা সে জানে না। তাহার ইচ্ছা যখন জনক জননীর ইচ্ছা দ্বারা নিয়মিত হইতে থাকে তখনি সে অনুভব করে, এ জগতে তাহার ইচ্ছা একমাত্র ইচ্ছা নহে, এ জগতে তাহাকে আত্মশাসন করিয়া চলিতে হইবে। এই শিক্ষা মানবের পক্ষে অতীব মূল্যবান। কারণ আত্মশাসন শক্তির উপরেই মানবের সর্ব্ববিধ উন্নতি নির্ভর করে। যে সকল বালকবালিকা স্বেচ্ছাচারিতাতে বৰ্দ্ধিত হয়, তাহারাই উত্তর-কালে আত্ম-সংযমে অসমর্থ হইয়া পাপে পতিত হইয়া থাকে। অতএব পরিবার মধ্যে বিধাতা মানবের শিক্ষার কি উৎকৃষ্ট উপায় নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন! এই জন্য নিম্নলিখিত কথাটীকে মানবের সামাজিক উন্নতির মূলমন্ত্র স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে;—সমাজস্থ ব্যক্তিগণের পারিবারিক জীবনের উন্নতি বিধান কর, তাহাদের গৃহকে জ্ঞানে ধর্ম্মে সমুন্নত ও আকর্ষণের পদার্থ কর, তাহা হইলে তাহাদের সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ উন্নতির সূত্রপাত দেখিতে পাইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য বিধাতাকে অগণ্য ধন্যবাদ। কারণ ইহা আমাদিগকে ধর্ম্মের চক্ষে বিশ্বাসের চক্ষে, গৃহ ও পরিবারকে দেখিতে সমর্থ করিয়াছে।

দ্বিতীয় উপদেশ

ভারতের ইতিবৃত্তে একটী কঠিন সমস্যা আছে। তাহা এই ঃ—যে বৌদ্ধধর্ম্ম এক সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল এদেশে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিল, যাহার প্রচারকগণ ভারত-ক্ষেত্রে বদ্ধ না থাকিয়া ভারতসীমাকেও উল্লঙ্ঘন করতঃ দেশ বিদেশে ইহার নবালোক বিস্তার করিয়াছিলেন, অশোক প্রভৃতি রাজগণ যাহার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া যাহাকে প্রভূত বলশালী করিয়াছিলেন, সেই বৌদ্ধধর্ম্ম কি কারণে ভারতখণ্ড হইতে এপ্রকার বিলুপ্ত হইল, যে আজি তাহার চিহ্নমাত্র লাভ করা দুঃসাধ্য ? এককালে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সহিত প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করিয়া তাহারই বক্ষঃস্থলে যাহা সবলে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, কিরূপে তাহা নিধন প্রাপ্ত হইল ? যদি বল ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম তাহার বিনাশ সাধন করিয়াছে, তাহা হইলে ভারত ইতিবৃত্তে, ইহার কাব্য সাহিত্যাদিতে, সাম্প্রদায়িক বিবাদ, বিদ্রোহ, রক্তপাত প্রভৃতির নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইত। কিন্তু এতদ্দেশীয় প্রাচীন ইতিবৃত্তের যাহা কিছু আছে, অথবা এদেশীয় প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা দ্বারা যাহা কিছু জানিতে পারা যায়, তদ্দ্বারা এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মত-বিরোধের কিছু কিছু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গেলেও দুই একটি স্থল ব্যতীত অধিকাংশ স্থলে বিবাদ, বিদ্রোহ, হত্যা, রক্তপাত প্রভৃতির বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে কি প্রকারে বৌদ্ধধর্ম্ম এদেশ হইতে বিলুপ্ত হইল ? নানা জনে এই প্রশ্নের নানা প্রকার উত্তর দিয়া থাকেন। তন্মধ্যে যে উত্তরটী অপেক্ষাকৃত

যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় তাহা এই ঃ—এদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম যতিও সন্ন্যাসীদের ধর্ম্ম ছিল। যে কেহ প্রকৃতরূপে ইহাকে অবলম্বন করিতেন, তাঁহাকে গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষুত্ব অবলম্বন করিতে হইত। শ্রমণ এবং ভিক্ষু এই উভয় শব্দ সমার্থ-বোধক ছিল। বৌদ্ধগ্রন্থে উপাসক বা গেহপতি শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, এবং তদ্দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয়, যে গৃহীরাও অনেকে বুদ্ধোপাসক হইতেন; কিন্তু ঐ গৃহপতিরা কখনই পূর্ণধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিগণিত হইতেন না। তাঁহারা অনুরাগী ও সাহায্যকারী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। অতএব বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে এই একটী তত্ত্ব সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে ইহা প্রধানতঃ যতিদিগের ধর্ম্ম ছিল এবং গৃহত্যাগী ভিক্ষুদিগের দ্বারাই সাধিত হইত।

যতদিন বৌদ্ধধর্ম্মে জীবনী শক্তি বিদ্যমান ছিল, এবং ইহার প্রচারকগণ উৎসাহের সহিত ইহাকে নানা স্থানে প্রচার করিতেছিলেন, ততদিন নিত্য নিত্য নূতন নূতন যতি ও সন্ন্যাসি-গণ এই দলে প্রবিষ্ট হইয়া ইহার অঙ্গপুষ্টি সাধন করিতে ছিলেন, সুতরাং শিষ্য পরম্পরা একেবারে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। ক্রমে এক দিকে যখন শঙ্করের ন্যায় প্রতিভা-শালী নেতার সাহায্যে প্রাচীন ধর্ম্মের পুনরুত্থান হইল, এবং অপরদিকে বৌদ্ধধর্ম্মের জীবনীশক্তির হ্রাস বশতঃ প্রচারোৎসাহ মন্দীভূত হইতে লাগিল, তখন নূতন নূতন যতির প্রবেশ ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। এরূপে বৎসরের পর বৎসর, শতাব্দীর পর শতাব্দী বৌদ্ধ যতিদিগের

সংখ্যা এদেশে হ্রাস হইতে লাগিল। অবশেষে যাহা অবশিষ্ট ছিল, মুসলমান রাজগণ আসিয়া তাহা সমাপ্ত করিলেন। তাঁহারা দলে দলে মুণ্ডিত মস্তক বৌদ্ধ যতিদিগকে হত্যা করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের একেবারে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত করিলেন।

যদি এই বিবরণ সত্য হয়, তাহা হইলে ইহার মধ্যে আমাদের চিন্তা করিবার উপযুক্ত একটী বিষয় আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে যতিদিগের ধর্ম্মরূপে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়াই কালে নিধন প্রাপ্ত হইল। যদি ইহা সমাজবিরোধী ধর্ম্ম না হইয়া সামাজিক ধর্ম্ম হইত, যদি ইহা মানবের গার্হস্থ্য জীবনকে হেয় জ্ঞানে পরিহার না করিয়া তাহাকে উন্নত করিবার প্রয়াস পাইত, তাহা হইলে ইহাকে কেহ উচ্ছিন্ন করিতে পারিত না। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা খ্রীষ্টধর্ম্মের ইতিবৃত্তের উল্লেখ করিতে পারি। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রারম্ভ হইতেই সামাজিক ধর্ম্ম ও গৃহীর ধর্ম্মরূপেপ্রচারিত হইয়াছিল। প্রারম্ভ হইতেই নারীগণ ইহাকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলেন। যীশুর জীবনচরিতে দেখিতে পাই; বেথেনি নামক স্থানে একপরিবারে এক ভ্রাতা ও দুই ভগিনী বাস করিতেন; যীশু যেরুশালেম যাত্রার পথে তাঁহাদের ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদের সঙ্গে বাস করিতে ভাল বাসিতেন; উক্ত দুই ভগিনীর প্রতি তাঁহার আন্তরিক প্রীতি ছিল; তাহাদের দুঃখে তাঁহার চক্ষে জল পড়িত; তিনি তাহাদের সুখে সুখী হইতেন। এমন কি তাঁহার মৃত্যু দিনে, সেই ঘোর সময়ে, তাঁহার পুরুষ শিষ্য-

দিগের কাহারও দেখা পাওয়া গেল না; সকলেই পলায়ন করিল; সেই অন্তিমকালে কেহই নিকটে আসিতে সাহসী হইল না; কেবলমাত্র কতিপয় রমণী, যাহার মধ্যে এক হত-ভাগিনীকে তিনি পাপজীবন হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহারাই তাঁহার নিকটস্থ হইতে সাহসী হইল। ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে পুরুষের প্রেম অপেক্ষা নারীর প্রেম অধিক অকপট, অধিক পবিত্র, অধিক নিঃস্বার্থ ও অধিক দৃঢ়। সে যাহাই হউক, খ্রীষ্টধর্ম্ম যে প্রারম্ভ হইতেই নারী-হৃদয়ে ও পরিবার-মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইল, ইহাই ইহার স্থায়িত্বের প্রধান কারণ। যীশুর পরবর্ত্তী কালেও দেখিতে পাই, খ্রীষ্টধর্ম্ম সামাজিক ও পারিবারিক ধর্ম্মরূপে প্রচারিত হইতে লাগিল। যীশুর প্রথম প্রচারকগণ অনেকে সস্ত্রীক ও সপরি-বারে এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। মহাত্মা সেণ্ট পল তাঁহার বন্ধুদিগকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার অনেক স্থলে অনেক খ্রীষ্টীয় পরিবারের উল্লেখ আছে।

এইরূপে খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিবারে পরিবারে বদ্ধমূল হওয়াতে জনসমাজে বদ্ধমূল হইয়া গেল; এবং বংশপরম্পরাক্রমে নামিয়া আসিতে লাগিল। এক পুরুষ অত্যাচার উৎপীড়নে প্রাণে হত হইবার সময় পরবর্ত্তী পুরুষের হৃদয়ে এই অগ্নি জ্বালাইয়া দিয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে খ্রীষ্টধর্ম্ম জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। বৌদ্ধধর্ম্ম মানবকে জনসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্জ্জনে লইয়া গিয়া সুখী ও উন্নত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল, খ্রীষ্টধর্ম্ম জনসমাজ মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া

সমগ্র সমাজকে সুখী ও উন্নত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল। ইহাই খ্রীষ্টধর্ম্মের স্থায়িত্বের প্রধান কারণ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ইতিবৃত্তে আমরা দুইটী কাল দেখিতে পাই। এক কাল এমন ছিল যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম কতিপয় শিক্ষিত পুরুষের মধ্যে বদ্ধ ছিল। অল্পসংখ্যক শিক্ষিত ভদ্রলোক সপ্তাহান্তে উপাসনা স্থানে সমবেত হইতেন, এবং নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনাতে ক্ষণকাল যাপন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন। এ বস্তু যে গৃহে লইয়া যাইতে হইবে, এই অমৃত যে পরিবার মধ্যে পরিবেশন করিতে হইবে, এই নবালোকে যে তাঁহাদের বাস-ভবন উজ্জ্বল করিতে হইবে, তাহা তাঁহাদের বুদ্ধিতে যোগাইত না। এই অবস্থাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম জলের উপরিস্থিত ক্ষুদ্র মাখন-খণ্ডের ন্যায় এক এক পরিবারের উপর ভাসিতেছিল, যেন একটী পারাবতের পালকের দ্বারা সরাইয়া ফেলা যাইত! গৃহস্বামীর মৃত্যু হইলে সে পরিবার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের নাম গন্ধ থাকিত না। ক্রমে সে কাল চলিয়া গেল। প্রধানতঃ খ্যাতনামা কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে ব্রাহ্মধর্ম্ম পারিবারিক জীবনে প্রবিষ্ট হইল। তদবধি ব্রাহ্মধর্ম্ম আর এক আকার ধারণ করিল, এবং ইহার স্থায়িত্বেরও সূত্রপাত হইল। এখন এ কথা সাহসের সহিত বলা যাইতে পারে, যে প্রচারের চেষ্টা একেবারে রহিত হইলেও ভারতবর্ষ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের আর উচ্ছেদ নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ অগ্ন্যুপাসক পারসীকদিগের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সমগ্র ভারতের প্রজাসংখ্যার সহিত তুলনাতে এই পারসীকগণ

মুষ্টিমেয় বলিলে হয়; এবং ইহাদের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচারের কিছুমাত্র চেষ্টা নাই। তথাপি পারসীকদিগের সংখ্যা বৎসর বৎসর বাড়িতেছে বৈ হ্রাস হইতেছে না। সেইরূপ ইহাও বলা যাইতে পারে, যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার যদি একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, যদি আর নূতনভাবে কেহ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ না করে, তাহা হইলেও ভারতবর্ষ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের আর উচ্ছেদ নাই। বিগত সেনসসের সময় আমাদের সংখ্যা যদি চারি সহস্র হইয়া থাকে, আগামী সেনসসের সময় আমরা দশ সহস্র হইব। আমাদের গৃহে সন্তান সন্ততি জন্মিয়া আমাদিগকে দশ সহস্র করিবে। অতএব যে দিন হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম পারিবারিক জীবনে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, তদবধি ইহার স্থায়িত্বের সূত্রপাত হইয়াছে; এবং সেই দিন হইতে ইহার শক্তিও জাগিয়াছে।

ধর্ম্ম পারিবারিক জীবনে স্থান প্রাপ্ত হইলেই তাহার শক্তি বৃদ্ধি হয় ইহার কারণ কি? ইহার একটু নিগূঢ় কারণ আছে, তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। কোনও নূতন ধর্ম্ম বা নূতন তত্ত্ব সচরাচর দুই প্রকারে প্রচারিত হইয়া থাকে, প্রথম উপদেশ দ্বারা, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের দ্বারা। ইহা ইতিহাসের প্রমাণিত কথা, যে দৃষ্টান্তের দ্বারা কোনও নবীন সত্য যে প্রকার প্রচারিত হয়, বাচনিক উপদেশ দ্বারা কখনই তাহা হয় না। উদাহরণস্বরূপ ইংলণ্ডের নিরামিষভোজী সভার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এক্ষণে ইংলণ্ডের প্রায় পনর কি বিশ হাজার লোক মৎস্য মাংস আহার ত্যাগ

করিয়া নিরামিষভোজী হইয়াছেন। এই নিরামিষভোজী সভার সভ্যগণ উপদেশ দ্বারা নিরামিষ ভোজনের উৎকৃষ্টতা প্রতিপন্ন করিতে ত্রুটী করিতেছেন না। ইহাদের সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা আছে, তদ্ভিন্ন মৌখিক উপদেশ ও পুস্তক পুস্তিকাদি দ্বারাও প্রচার হইতেছে। কিন্তু তাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে তদুপরি নির্ভর করিতেছেন না। নিরামিষ ভোজনের উৎকৃষ্টতা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহারা এক নূতন উপায় অবলম্বন করিতেছেন। তাঁহারা স্থানে স্থানে নিরামিষ ভোজনালয় স্থাপন করিয়াছেন। সেখানে নানা প্রকার নিরামিষ ব্যঞ্জন পাক করিয়া সুলভ মূল্যে লোকদিগকে আহার করান হইয়া থাকে। লোকে হাতে কলমে দেখিতে পায়, নিরামিষ ভোজন অতি উপাদেয় অথচ স্বাস্থ্যকর ও শস্তা। ইহার অপেক্ষা অধিক কার্য্যকর প্রচার আর কি হইতে পারে? সেইরূপ দেশের লোককে নূতন কৃষি প্রণালী শিক্ষা দিতে হইলে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করা আবশ্যক হয়। সেইরূপ ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উদার ও উন্নত আদর্শ দেশের লোককে দেখাইতে হইলে, এক একটী পরিবারে অগ্রে তাহা সাধন করিয়া দেখাইতে হয়। তৎপরে তাহা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়।

এদেশে এরূপ প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন দৃষ্ট হয়। এদেশের সাধারণ লোকের মনে এই সংস্কার আছে, যে পৌত্তলিক উপাসনা প্রণালী বর্জ্জন করিলে, লোকের মনের ধর্ম্মভাব ভগ্ন হইয়া যাইবে; তাহারা শ্রদ্ধা-ভক্তি-হীন হইয়া নাস্তিকতা ও ক্ষুদ্র বিষয়াসক্তি মধ্যে পতিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ

তাহাদের মনে এই ধারণা যে জাতিভেদ ভগ্ন হইলে আর সমাজ স্থিতি রক্ষা করিতে পারা যাইবে না; লোকে যথেচ্ছাচারের মধ্যে নিমগ্ন হইবে। ব্রাহ্মপরিবার সকলের প্রতি এই মহৎভার অর্পিত হইয়াছে, যে তাঁহারা সাধারণ লোকের মনের এই সংস্কার অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবেন। তাঁহারা দেখাইবেন যে নিরাকার সত্যস্বরূপ পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরকে যেরূপ ভক্তির সহিত অর্চ্চনা করা যায়, কোনও সাকারোপাসক সেরূপ ভক্তির সহিত অর্চ্চনা করিতে পারে না; এবং জাতিভেদকে ভগ্ন করিয়া মনুষ্যের ভ্রাতৃত্বের ভিত্তির উপরে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন স্থাপন করিলে, বিশুদ্ধ আনন্দ জন্মিয়া থাকে।

অতএব ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নত ও উদার আদর্শ আমাদের পারিবারিক জীবনে সাধন করিতে হইবে। সে উন্নত ও উদার আদর্শ যে কি তাহা আগামীবারে আলোচনা করা যাইবে! এখন গড়ের উপরে এই কথা বলা যাইতে পারে, যে ব্রাহ্মপরিবার সকলের অবস্থা এরূপ হওয়া কর্ত্তব্য যেখানে বাস করিলেই লোকে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নত আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। মহাত্মা যীশু একবার শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"তোমরা যদি কেবল আপন আপন বন্ধুগুলি-কেই প্রীতি কর এবং শত্রুদিগকে ঘৃণা কর, তাহা হইলে অধিক কি করিলে? সুরাপায়ী পাপাচারী ব্যক্তিরাও কি তাহা করে না?' সেইরূপ আমরা বলি. দেশের অপরাপর পরিবার

 পরিবারের কোনও প্রভেদ যদি না থাকে তাহা

হইলে কি হইল? তাহারাও যেমন আহার করে, বেশভূষা করে, আমোদ প্রমোদ করে, নিদ্রা যায়, ব্রাহ্ম পরিবারে যদি তদতিরিক্ত কিছু না থাকে, তাহা হইলে কি হইল! ব্রাহ্ম পরিবারে পদার্পণ করিয়া যদি দেখি, জ্ঞানালোচনার একটু চিহ্নও নাই, কোনও সৎ বা মহৎ বিষয়ের চর্চ্চার গন্ধও নাই, জগতে কতদিকে কত প্রকার উন্নতি হইতেছে, তাহার সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নাই, ব্রাহ্মধর্ম্মের মহৎভাব সকল সাধনের চেষ্টাও নাই, তাহারা কেবল খায় ও ঘুমায়, তাহা হইলে কি হইল! এরূপ পরিবার দ্বারা কি দেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহত্ত্ব ঘোষিত হইবে?

পরিবারে ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে একটা কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। তথায় এরূপ হাওয়া প্রস্তুত করিতে হইবে যাহাতে বাস করিলে পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের সকলে অজ্ঞাতসারে ব্রাহ্মধর্ম্মের মতে আস্থাবান্, ধর্ম্মানুষ্ঠানে উৎসাহান্বিত ও সৎকর্ম্মশীল হইতে পারে। হাওয়া,—হাওয়া; এই হাওয়া কথাটা বড় মূল্যবান। এই হাওয়া মানবচরিত্র গঠনের একটী প্রধান উপাদান। প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বালকবালিকাকে অনেক ধর্ম্মের তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সে প্রণালী উৎকৃষ্ট নহে। পরিবার মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতির হাওয়া প্রস্তুত করা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতম প্রণালী। প্রথম, সামাজিক হাওয়ার বিষয়ে একবার চিন্তা কর। তোমাদের সমাজের হাওয়া যদি এরূপ হয় যে অজ্ঞ ব্যক্তির সেখানে বাস করা কঠিন; তোমাদের মধ্যে বাস ও বিচরণ করিতে গেলেই কিছু

জানিতে শুনিতে হয়, তাহা হইলে আমাকে বাধ্য হইয়া জ্ঞানালোচনা করিতে হয়। যদি তোমাদের সামাজিক হাওয়া এরূপ হয়, যাহাতে শঠ প্রবঞ্চক ও পরদ্রোহী ব্যক্তি বাস করিতে পারে না, তাহা হইলে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া প্রবঞ্চনাদি ত্যাগ করিতে হয়। সেইরূপ পরিবারের হাওয়া যদি এরূপ করিতে পার, যাহাতে জ্ঞানে রুচি, ধর্ম্মে অনুরাগ, সাধুজনে ভক্তি, সদনুষ্ঠানে উৎসাহ উৎপন্ন করিবে, তাহা হইলে সেই পরিবারে বাস করিয়া সন্তানগণ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে। নতুবা তোমার পারিবারিক হাওয়া যদি এরূপ হয়, যে দেখিলে বোধ হয় ইহারা জন্মে কখনও উপাসনা করে নাই, কখনও ভুলিয়া একটা ভাল বিষয় পাঠ করে না, দেশীয় কি বিদেশীয় সাহিত্যের সঙ্গে ইহাদের কোনও সম্পর্ক নাই, ধার্ম্মিকজনের আদর নাই, প্রত্যুত পিতামাতা সন্তানদিগের সমক্ষেই তাহাদের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদিগের কার্য্য ও চরিত্রের তীব্র ও লঘুভাবে সমালোচনা করিতেছেন, তৎপরে যদি সন্তানদিগকে ধর্ম্মভাব-বিহীন, শ্রদ্ধাভক্তি-বিহীন, বিনয়-সৌজন্য-বিহীন, ঈশ্বরপ্রীতি ও মানবপ্রীতি বিহীন হইয়া বর্দ্ধিত হইতে দেখ, তাহাতে বিস্মিত বা দুঃখিত হইও না, কারণ তাহাই স্বাভাবিক। ঈশ্বর করুন ওই সকল বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি পড়ে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নত আদর্শ, সামাজিক ও পারিবারিক।

গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের ন্যায় দুইটী ধর্ম্ম-ধারা দুই দিক হইতে প্রবাহিত হইয়া আমাদের হৃদয় ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে। একটী প্রতীচ্য অপরটী প্রাচ্য; একটী প্রাচীন য়িহুদী জাতি হইতে সমুৎপন্ন, অপরটী ভারতবর্ষীয় প্রাচীন হিন্দুগণের হৃদয় হইতে উত্থিত; একটী সামাজিকতা-প্রধান, অপরটী ব্যক্তিত্ব-প্রধান। প্রাচীন য়িহুদী জাতির ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই তাঁহাদের জাতীয়তার আকাঙ্ক্ষা নিহিত ছিল। মুক্তি শব্দে তাঁহারা স্বজাতির স্বাধীনতা ও সর্ব্বাঙ্গীন কুশল বুঝিতেন। তাঁহাদের প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে তাঁহাদের প্রতিভা-শালী ও সর্ব্বজন-পূজিত ধর্ম্মাচার্য্যগণের যে সকল উক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে বার বার এই আশা ও বিশ্বাসের উল্লেখ দৃষ্ট হয় যে, চরমে ঈশ্বর এই জগতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন; অর্থাৎ য়িহুদীদিগকে স্বাধীন করিয়াও তাঁহাদের স্বজাতীয় রাজগণকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, প্রজা সাধারণকে জ্ঞানে ধর্ম্মে উন্নত ও সুখী করিবেন। ইহাঁরা স্বজাতি ও স্বীয় সমাজকে পরিত্যাগ করিয়া মুক্তির বিষয়ে চিন্তা করিতে পারিতেন না।

য়িহুদীগণের ধর্ম্মচিন্তার মধ্যেও কিরূপে এই জাতীয়তার আকাঙ্ক্ষা প্রবিষ্ট হইল, ইহা একটী ইতিবৃত্তের কঠিন সমস্যা। ইহার একটী কারণ অনুমান করা যাইতে পারে। য়িহুদী

জাতির ইতিবৃত্ত পাঠ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহাঁদিগকে বার বার বন্দী-দশাতে বিদেশীয়দিগের মধ্যে বাস করিতে হইয়াছে। বিদেশে, বিধর্ম্মী ও বিভিন্নভাষী লোকদিগের মধ্যে বাস করাতে ইহাঁদের স্বজাতি-প্রেম ও স্বধর্ম্মানুরাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং আপনাদের যাহা কিছু আছে, তাহার সংরক্ষণের প্রবৃত্তি অতিশয় বলবতী হইয়াছে; সুতরাং ইহাঁদের জাতীয় দেবতা জাভের উপাসনার সঙ্গে সঙ্গেই জাতীয় স্বাধীনতা ও উন্নতি লাভের বাসনা মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। অথবা এই জাতীয় আকাঙ্ক্ষার অপর কোনও কারণ থাকিতে পারে। কারণ যাহাই হউক, য়িহুদী ধর্ম্মের প্রকৃতিই যে সামাজিক-ভাবাপন্ন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। খ্রীস্টধর্ম্ম ও মহম্মদীয় ধর্ম্ম য়িহুদী ধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত, সুতরাং এই উভয় ধর্ম্মও সামাজিকতা-প্রধান। এই উভয় ধর্ম্মের কোনটাই মানুষকে ধর্ম্ম-সাধনার্থ জনসমাজ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করে না; বরং ধর্ম্মসাধনের পক্ষে সমবিশ্বাসীমণ্ডলীর সাহায্যের প্রয়োজন, এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এই কারণে এতদুভয় ধর্ম্মে সামাজিক উপাসনার রীতি প্রচলিত দেখা যায়।

প্রাচ্য ধর্ম্মের ভাব ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। য়িহুদী, খ্রীষ্টীয় এবং মুসলমান ধর্ম্ম যেমন সামাজিকতা-প্রধান, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম তেমনি ব্যক্তিত্ব-প্রধান। এদেশে "মুক্তিসাধন" এই শব্দ উচ্চারণ করিলেই তাহা মানবাত্মার একার কার্য্য মনে হয়। মানবাত্মাকে একা একা ধর্ম্মসাধন করিতে হয়।

একের আত্মার উন্নত অবস্থা লাভের সঙ্গে অপরের কোনও সম্পর্ক নাই। মহাত্মা বুদ্ধ মৃত্যুশয্যাতে শিষ্যদিগকে এই শেষ উপদেশ দিলেন—"প্রত্যেকে একাগ্রতা সহকারে নিজ নিজ মুক্তিসাধনে রত থাক।" হিন্দুধর্ম্মের এবং বৌদ্ধধর্ম্মের সার নিষ্কর্ষ করিলে সর্ব্বত্রই এই উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। একদিকে দেখিতে গেলে ইহা অতি বিচিত্র ব্যাপার! জাতিভেদ প্রথা নিবন্ধন হিন্দুসমাজ কঠিন জাতীয়তার নিগড়ে বদ্ধ; অথচ ইহার ধর্ম্মসাধন-সংক্রান্ত সমুদায় কার্য্য ব্যক্তিত্ব-প্রধান; তাহা একজনেরই কার্য্য। বোধ হয় জাতিভেদ প্রথা হইতেই হিন্দুসমাজ মধ্যে এই এক-নায়কত্বের ভাব প্রস্ফুটিত হইয়াছে। জাতিভেদ প্রথা নিবন্ধন সমাজ-দেহে অভ্যন্তরীণ অন্তর্বিচ্ছেদ চলিয়াছে; সুতরাং কোনও অনুষ্ঠানই দশজনে মিলিয়া করা সুসাধ্য হয় নাই; কোনও সামাজিক অধিকার বা সুখ লাভের জন্য সম্মিলিত ভাবে কার্য্য করা সম্ভব হয় নাই; কাজেই ধর্ম্মার্থীদিগকে একা একা কার্য্য করিতে হইয়াছে। এইরূপে এখানে সকল প্রকার সদনুষ্ঠানই একা একা। ধ্যান ধারণা করিবে তাহা একা একা; দান ধর্ম্ম করিবে একা একা; খাত পূর্ত্ত প্রভৃতি কীর্ত্তি-স্থাপন করিবে একা একা; পূজা জপাদি করিবে একা একা। হিন্দু পূজা স্থলে দশজন উপস্থিত থাকিতে পারে, কিন্তু সে কার্য্যটী একজনেরই, অপরেরা দর্শক মাত্র। এই যে ধর্ম্মচিন্তার এক-প্রবণতা, ইহা প্রাচ্য ধর্ম্মের বিশেষ ভাব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই উভয় ধর্ম্মধারা আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে

আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে এই উভয় ভাব সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আমরা নির্জ্জন সাধন ও সামাজিক উপাসনা উভয়কেই আমাদের সাধনপ্রণালীর অন্তর্গত করিয়াছি। এই সামাজিক উপাসনার প্রচলন হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম সামাজিক ধর্ম্ম হইয়াছে। প্রাচীন-ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন—"জনসমাজের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া ধর্ম্মসাধন কর।" ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন, "জনসমাজের দিকে সম্মুখ ফিরিয়া ধর্ম্মসাধন কর।"

ইহা সাহসের সহিত বলিতে পারা যায়, যে কালে ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশীয় সামাজিক জীবনে সুমহৎ পরিবর্ত্তন সংঘটন করিবে। যীশু নিজ প্রচারিত ধর্ম্মের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধেও সেই কথা বলিতে পারা যায়। যীশু বলিয়াছিলেন—"আমার প্রচারিত স্বর্গরাজ্য দম্বলের ন্যায়।" অর্থাৎ এক কলস দুগ্ধে অল্প পরিমাণ দম্বল দিয়া রাখিলে যেমন কলসস্থ সমুদায় দুগ্ধকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দধিত্বে পরিণত করে, তেমনি তাঁহার ধর্ম্ম মানব-মনে প্রবিষ্ট হইয়া মানবসমাজের রীতি নীতিকে পরিবর্ত্তিত করিবে। ইতিবৃত্ত সাক্ষ্য দিতেছে যে নিজের ধর্ম্ম সম্বন্ধে যীশুর ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণরূপে সত্য হইয়াছে। মনু বা মুষার ন্যায় তিনি জনসমাজের জন্য নূতন নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন নাই, কিন্তু মানব-জীবনের এক নূতন আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন; সেই নব আদর্শ কালক্রমে মানব-মনে প্রবেশ করিয়া ঘোর পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিল; বহু বহু শতাব্দীর সঞ্চিত কুসংস্কারকে অপনীত করিল; এবং বদ্ধমূল রীতি নীতিকে উন্মূলিত করিল। সেইরূপ

ব্রাহ্মধর্ম্ম মানবচিত্তের সমক্ষে মানবজীবনের যে উন্নত আদর্শ ধারণ করিয়াছেন, তাহারই গুণে ইহা এতদ্দেশীয় সামাজিক জীবনে ঘোর পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতেছে; এবং উত্তরকালে আরও করিবে।

এই আদর্শ কি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের কতকগুলি মূলভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হয়। ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী মূলভাব ইহার আধ্যাত্মিকতা। এই আধ্যাত্মিকতা দুই প্রকারে ফুটিতেছে। প্রথম, এই ভাবটী ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে প্রবল যে, জাতি বর্ণ ও অবস্থা নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মানবাত্মা পরমেশ্বরকে লাভ করিবার পক্ষে, অর্থাৎ তাঁহাকে জানিবার ও তাঁহাকে প্রীতি করিবার পক্ষে সমাধিকারী। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম নগর সংকীর্ত্তনের দিন এই মহাসত্য নিম্নিলিখিত প্রকারে ঘোষিত হইয়াছিল ঃ—

"নরনারী সাধারণের সমান অধিকার,
যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি নাহি জাত বিচার।"

সর্ব্ববিধ সামাজিক ও পারিবারিক সাম্যের শাস্ত্র এদেশের পক্ষে কি নবীন! যে দেশের চিরপ্রচলিত উপদেশ এই,—ব্রাহ্মণ ঈশ্বরের মুখ হইতে এবং শূদ্র পদ হইতে উৎপন্ন; এবং ধর্ম্মযাজনে বা ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যয়নে শূদ্রের অধিকার নাই; সে দেশে এই মহাসত্য সামাজিক জীবনে এক নূতন আদর্শকে উপস্থিত করিতেছে। ইহার ফল কালে আরও লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে।

সর্ব্ববিধ মানবীয় উন্নতির মূলে মানবাত্মার মহত্ত্ব-জ্ঞান

নিহিত, ঈশ্বরের পবিত্র সন্নিধানে সকল আত্মাই মূল্যবান, কারণ সকলেই তাঁহাকে জানিবার ও লাভ করিবার অধিকারী, এই বিশ্বাস মানব-মনে যতই উজ্জ্বল হইবে, ততই জগত হইতে সর্ব্ববিধ অত্যাচার তিরোহিত হইবে। এক্ষণে দেখা যায়, মানুষ নিজে যে অধিকার লাভের জন্য ব্যগ্র, নিজে যে সুখ স্বচ্ছন্দ ভোগ করিতে উৎসুক, অপরকে তাহা দিতে প্রস্তুত নহে ; সে সকল সুখ সুবিধাতে যে অপরেরও অধিকার আছে তাহা স্বীকার করিতে পারে না। আমেরিকার শুক্লবর্ণ খ্রীষ্টীয় জাতি সকল স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়াছে, আপনাদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বত্ব রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়াছে, অথচ হতভাগ্য কৃষ্ণকায় কাফ্রিদিগকে সেই সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখাকে অন্যায় বলিয়া মনে করে নাই ; তাহাদিগকে পশুর ন্যায় ব্যবহার করিলে যে অধর্ম্ম হয় তাহা অনুভব করিতে পারে নাই। এখন প্রায় সকল দেশেই পুরুষগণ যে সামাজিক সুখ ও সুবিধা ভোগ করিতেছেন নারীগণেরও যে তাহাতে অধিকার আছে, তাহা অনুভব করিতে পারিতেছেন না। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ মানবাত্মার মহত্ত্ব সমুচিতরূপে অনুভব না করা। ঈশ্বর যাহাকে যতটুকু দিয়াছেন, সেইটুকুকে সমুচিতরূপে বিকাশ করিয়া সে নিজ জীবনের মহত্ত্ব সাধন করিবে, এই তাঁহার আদেশ ; সে পথে অন্তরায় হইলে অপরাধ হয়, এই সত্য বদ্ধমূল না হওয়াতেই জগতে এই প্রকার বৈষম্য দৃষ্ট হইতেছে। মানবের মনে মানবাত্মার মহত্ত্ব-জ্ঞান যতই

উজ্জ্বল হইবে, ততই পরস্পরের অধিকার স্বীকার করিবার প্রবৃত্তি বাড়িবে এবং অত্যাচার প্রবৃত্তির হ্রাস হইবে। "নরনারী সাধারণের সমান অধিকার, যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি নাহি জাতবিচার," এই মহা সত্য ঘোষণা করিয়া ব্রাহ্মসমাজ মানবাত্মার মহত্ত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। ইহাকে সর্ব্ববিধ সামাজিক ও নৈতিক সংস্কারের ভিত্তিভূমি বলিলে কিছুই অত্যুক্তি হয় না। এই ভূমির উপরেই জাতীয় মহত্ত্বের প্রাসাদ উত্থিত হইবে।

আধ্যাত্মিকতার দ্বিতীয় বিকাশ আর এক প্রকারে হইতেছে। প্রাচীন-ধর্ম্ম বলিয়াছিলেন,—"উপাস্য দেবতার সন্তোষ-সাধনার্থ কিছু দিতে হইবে," ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন,—"ঈশ্বরের প্রীত্যর্থ কিছু হইতে হইবে।"

এ দুই এ কত প্রভেদ! প্রাচীন ধর্ম্মসাধন-প্রণালীতে এই দেখি, তুমি যাহাই হও, যেরূপই হও, ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চক, শঠ, পরদ্রোহী, যে কোন চরিত্রের লোকই হও, যদি কিছু দিতে পার, নৈবেদ্য, বা বলি, বা দেবদ্বিজে দান প্রভৃতি কিছু দিতে পার তবেই দেবতা প্রসন্ন। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন,—"তুমি কিছু দিতে পার আর নাই পার, তোমাকে কিছু হইতে হইবে, তোমার চরিত্রকে ঈশ্বরাধনার উপযোগী করিতে হইবে। তিনি সত্যস্বরূপ, ন্যায়স্বরূপ, প্রেমস্বরূপ ও পবিত্রস্বরূপ, তাঁহার আরাধনার উপযুক্ত হইবার জন্য তোমাকে সত্য, ন্যায়, প্রেম ও পবিত্রতাতে উন্নত হইতে হইবে; অর্থাৎ তোমার জ্ঞানকে মার্জ্জিত করিতে হইবে, বিবেককে উজ্জ্বল করিতে হইবে, প্রেমকে বিকশিত করিতে হইবে ও পবিত্রতাকে দৃঢ় করিতে

হইবে! সমগ্র চরিত্রের দ্বারা ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিতে হইবে। আরাধনাকে কোনও বিশেষ মুহূর্ত্তের বা বিশেষ শব্দের ব্যাপার মনে না করিয়া সমগ্র জীবনকেই আরাধনা করিতে হইবে। এই মহৎভাব ধর্ম্মজীবনের কি এক উন্নত ও মহৎ আদর্শ আমাদিগের সমীপে উপস্থিত করিতেছে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম মানব-জীবনের যে নূতন আদর্শ প্রদর্শন করিতে-ছেন, তাহার দ্বিতীয় লক্ষণ স্বাধীনতা। ঈশ্বরান্বেষণ, আত্মার উন্নতি সাধন ও মুক্তি লাভ বিষয়ে মানবাত্মা সম্পূর্ণ স্বাধীন এক অর্থে মহাত্মা বুদ্ধের উপদেশ অতীব সত্য। মুক্তি কেহ কাহাকেও দিতে পারে না। ধর্ম্মতত্ত্ব প্রত্যেককে স্বাধীনভাবে অন্বেষণ ও লাভ করিতে হয়। যাঁহারা এই শ্রমে কাতর, যাঁহারা নিজেদের চিন্তা ও অন্বেষণের ভার অপরের উপর দিয়া স্বচ্ছন্দে বৃক্ষের তলে বসিয়া ধর্ম্মের সুখ ভোগ করিতে চান, প্রকৃত ধর্ম্মজীবন সেই শ্রমকাতর ও অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিদিগের জন্য নহে। মানবশিশু যেমন পড়িয়া উঠিয়া, উঠিয়া পড়িয়া হাঁটিতে শিখে, তদ্ভিন্ন হাঁটিতে শিখিবার অন্য উপায় নাই, তেমনি হে মানব! তোমাকেও তত্ত্বানুসন্ধান, তত্ত্বচিন্তা, আত্ম-দর্শন, পাপ প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম, অনুতাপ, অশ্রুপাত প্রভৃতির পথে ধর্ম্ম রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে, এতদপেক্ষা সহজ পথ নাই। যদি এই আয়াস স্বীকারে অসম্মত হইয়া সহজ পথের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও, তবে তুমি প্রকৃত ধর্ম্মজীবন হইতে বঞ্চিত হইলে। ধর্ম্মজীবনের প্রাণ স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন তত্ত্বান্বেষণ। কিন্তু এ স্বাধীনতা অহমিকা-প্রসূত নহে।

গির্ব্বিত ব্যক্তির এক প্রকার স্বাধীন ভাব আছে যাহা বলে, "আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, আমি কাহার মুখাপেক্ষা করিব ?" এ স্বাধীনতা সে প্রকৃতির নহে। ইহা প্রেম-সম্ভূত স্বাধীনতা ; সুতরাং বিনয় ইহার ভূষণ। সত্যে বিমল অনুরাগ জন্মিলে মানব যে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লাভ করে, ইহা সেই স্বাধীনতা। যিনি অকপট হৃদয়ে সত্যে প্রীতি স্থাপন করিয়াছেন, তিনি স্বার্থ, সুখাসক্তি ও লোক ভয়ের উপরে উঠিয়াছেন, সুতরাং তিনি স্বাধীন ; ইহা সেই স্বাধীনতা। প্রকৃত স্বাধীনতার মূলমন্ত্র এই—ঈশ্বর প্রত্যেককে মূলধন স্বরূপ দেহ মনের যে কিছু শক্তি সামর্থ্য দিয়াছেন সে তাহা নিজ জীবনের মহত্ত্ব সাধনের জন্য নিয়োগ করিবে ; সমাজের পক্ষে তাহার প্রতিকূল না হইয়া অনুকূল হওয়াই কর্ত্তব্য। সত্যে ও ঈশ্বরে বিমল প্রীতি না জন্মিলে মানবাত্মা আসক্তি ও ভীতির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। তখন সে বন্ধন দশাতেই থাকে ; সুতরাং তখন তাহার স্বাবলম্বন শক্তি ও থাকে না। সে বাহিরে দেখিতে স্বাধীন হইলেও পরাধীন। যে দুর্ব্বলতাবশতঃ নিজ মহত্ত্ব লাভের ভার নিজের উপরে না রাখিয়া অপরের স্কন্ধে দেয়, সেও স্বাধীন নহে। এই জন্যই উপনিষদকার ঋষিগণ বলিয়াছেন "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" অর্থাৎ যাহার স্বাবলম্বনের শক্তি নাই, পরমাত্মা সেরূপ ব্যক্তির প্রাপ্য নহেন। এই যে অধ্যাত্মিক স্বাধীনতা ইহার উপরে পারিবারিক ও সামাজিক সর্ব্ববিধ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত।

ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নত আদর্শের তৃতীয় লক্ষণ উদারতা। জগতে

এক প্রকার ঔদাসীন্য-প্রসূত উদারতা আছে; এ তাহা নহে। একজন ব্যক্তি সকল ধর্ম্মকেই ভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন, সুতরাং তিনি সকলের প্রতি সমানভাবে ব্যবহার করেন, অতএব তিনি উদার। ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা সে প্রকার নহে, ইহা প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ভক্তিপ্রসূত উদারতা। ব্রাহ্ম বিধাতার জীবন্ত বিধাতৃত্বে বিশ্বাস করেন বলিয়াই উদার; সকল ধর্ম্ম, ও সকল মহাজনের মধ্যে তাঁহার অভিব্যক্তি দেখেন বলিয়াই উদার। ব্রাহ্ম অনুভব করেন, যে তিনি সেই বংশের সন্তান, সমগ্র পৃথিবী যাঁহাদের বাসস্থান. ঈশ্বর যাঁহাদের পিতামাতা, সকল সাধু মহাজন যাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা. জগৎ ও মানব প্রকৃতি যাঁহাদের দুই প্রধান গ্রন্থ. এবং স্বয়ং পরিত্রাতা ঈশ্বর যাঁহাদের শিক্ষক ও গুরু, সুতরাং ব্রাহ্ম উদার।

ব্রাহ্মধর্ম্মে যে উন্নত ও মহৎ আদর্শের কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইল, তাহা যতই মানব-হৃদয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করিবে ততই আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে পরিবর্ত্তিত করিবে। উন্নত পারিবারিক ও সামাজিক জীবন না হইলে, এই উন্নত আদর্শ সাধন হইতে পারিবে না। বিধাতার বিধিই এইরূপ। বৃক্ষের বীজটীকে ধারণ ও রক্ষা করিবার জন্য যেমন একটী কোষ থাকে, তেমনি সত্যবীজকেও ধারণ ও রক্ষা করিবার জন্য সমাজকোষের প্রয়োজন। এক একটী ব্রাহ্ম পরিবার যেন এক একটী কোষের ন্যায়।

পূর্ব্বোক্ত আদর্শের বিষয়ে চিন্তা করিলে সমাজ ও পরিবার যে কিরূপ হওয়া উচিত, তাহাও কিঞ্চিৎ পরিমাণে অনুভব

করা যায়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয়, তন্মধ্যে সাম্য, সুনীতি, জ্ঞানালোচনা, ন্যায়পরতা, প্রীতি, পবিত্রতা চিন্তা ও কার্য্যের স্বাধীনতা এবং উদারতা স্থান প্রাপ্ত হওয়া উচিত। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে এইগুলি প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখ তাহা কিরূপ হয়! দেখ ব্রাহ্মধর্ম্ম কিরূপ দেখায়! দুঃখের বিষয় এই, এখনও অনেক ব্রাহ্ম পরিবারের অবস্থা এইরূপ যে দেশের অপর সাধারণ পরিবার হইতে ইহাদের কোনও পার্থক্য নাই। ঈশ্বর করুন এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি পড়ে।

——— ——

ব্রহ্মসাধকের সুখভোগ।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।"

অর্থ,— যে সাধক এই সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মকে নিজ হৃদয়ে, আত্মার পরমাকাশে, সন্নিহিত বলিয়া দেখেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত কামনার সমুদায় বিষয় উপভোগ করেন।"

উপনিষদের এই উপদেশটীর মধ্যে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে। ইহাতে ঋষি বলিতেছেন, যে সাধক সেই পরব্রহ্মকে নিজ হৃদয়ে সন্নিহিত দেখেন তিনি তাঁহার সহিত সমুদায় কামনার বিষয় ভোগ করেন। এ কথাটী সাধারণ লোকের প্রচলিত সংস্কারের বিরোধী কথা। কাম্য বিষয় সকল উপভোগ করেন। উপভোগ শব্দের অর্থ কি? উপভোগ অর্থে কোনও বিষয়ের রসাস্বাদন করা, বা তাহার চিন্তনে বা সেবনে তৃপ্তি-লাভ করা। ধার্ম্মিক ব্যক্তি কাম্য বস্তুর ভোগে তৃপ্তিলাভ করিবেন, ইহা কিরূপ কথা? বরং লোকে প্রচলিত সংস্কার এই ধার্ম্মিক যিনি, তিনি বিষয়-সুখকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিবেন; এবং তাহাতে সুখ বোধ করা দূরে থাকুক, তাহার লালসা হৃদয়ে উদয় হইবা মাত্র তাহাকে পাপ জ্ঞানে দমন করিবেন।

একজন মুসলমান সাধুর বিষয়ে এইরূপ কথিত আছে যে, একদিন তাঁহার অন্তরে এক প্রকার উত্তম ফল আহার করিবার

লালসা জন্মিল। তাহাতে তিনি নিজের প্রতি এত বিরক্ত হইলেন যে, আপনার সুখাসক্ত মনকে শাস্তি দিবার জন্য একটী উপায় অবলম্বন করিলেন। পথে যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন যে, একজন লোক একটী ময়দার কলে উষ্ট্র যুড়িয়া দিয়া ময়দা পিষিতেছে। তিনি ঐ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন' "তুমি উষ্ট্রটীর জন্য সমস্ত দিনে কত মজুরী দাও?' সে বক্তি সমস্ত দিনে যত মজুরী দেয় তাহা নির্দ্দেশ করিল। তখন তিনি বলিলেন, "ইহার অর্দ্ধেক মজুরীতে আমি সমস্ত দিন তোমার কল টানিয়া দিব, একদিন আমাকে টানিতে দাও।" সে ব্যক্তি তাহাতে সম্মত হইয়া তাঁহাকে কলে যুড়িয়া দিল। তিনি সমস্ত দিন কল টানিয়া যে মজুরী পাইলেন তাহা দ্বারা সেই উত্তম ফল ক্রয় করিয়া আনিলেন এবং আহার করিতে বসিলেন। তখন মনকে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ওরে সুখাসক্ত অধম মন! ফের যদি কোনও বিষয় লালসা কর, এইরূপ করিয়া তাহার উপার্জ্জন করিতে হইবে।"

এই মুসলমান্ সাধুটী যে ভাবে একটী সামান্য সুখ লালসার জন্য আপনাকে শাস্তি দিয়াছিলেন, এরূপ দৃষ্টান্ত ধর্ম্মসাধক-দিগের মধ্যে বিরল নহে। আমাদের দেশের সুবিখ্যাত সন্ন্যাসী ও যোগীদিগের ত কথাই নাই, অপরাপর দেশেও এরূপ দৃষ্টান্ত প্রচুর পরিমাণে দেখা গিয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম্মের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহার সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীগণও সময়ে সময়ে এইরূপে আপনাদিগকে অনেক

শাস্তি দিয়াছেন। যেরূপ নির্দ্দোষ কাম্য-বস্তু সকল গৃহী লোকে প্রতিদিনই ভোগ করিতেছে এবং ভোগ করাতে কিছুই লজ্জার বিষয় মনে করে না, সেই সকল বস্তু ভোগের বাসনা তাঁহাদের অন্তরে উদয় হইবামাত্র তাঁহারা আপনাদিগকে গুরুতর শাস্তি দিয়াছেন। কেহবা অনাহারে ও অনিদ্রায় শরীর ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছেন; কেহবা পৃষ্ঠদেশ অনাবৃত করিয়া অপরের হস্তে চাবুক দিয়া ক্রমাগত প্রহার করিতে বলিয়াছেন এবং যতক্ষণ না দর দর ধারে রুধির-ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, ততক্ষণ নিবৃত্ত হন নাই। সেণ্ট ফ্রান্সিস ডি এসিসি নামক একজন খ্রীষ্টীয় সাধুর বিষয়ে এরূপ কথিত আছে যে, একবার পীড়িত হইয়া বন্ধুবর্গের ও শিষ্যগণের আগ্রহাতিশয় নিবন্ধন তিনি মাংসের যূষ পান করিয়াছিলেন। তৎপরেই তাঁহার এরূপ প্রবল অনুতাপের উদয় হইল যে, নিজ গলে রজ্জু বাঁধিয়া একজন শিষ্যকে সেই রজ্জু ধরিয়া দ্বারে দ্বারে লইয়া যাইতে বাধ্য করিলেন। এইরূপে দ্বারে দ্বারে গিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—"দেখ আমি কি অধম! সামান্য দেহের জন্য সেই যূষ পান করিলাম, যদ্দ্বারা হয় ত কত দরিদ্রের প্রাণ রক্ষা হইতে পারিত।"

বর্ত্তমান সময়ের ধর্ম্মসাধকগণ এরূপ আত্ম-নিগ্রহের প্রয়োজনীয়তা আর অনুভব করেন না। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য্য যে, ধর্ম্মজীবনের প্রথমাবস্থাতে জিতাত্মাতা লাভ করিবার জন্য সময়ে সময়ে নির্দ্দোষ কাম্য-বস্তু সকলও বর্জ্জন করিতে হয়; বলবান ইন্দ্রিয়াশ্বকে রশ্মির দ্বারা উত্তমরূপ সংযত করিতে হয়;

তদ্ভিন্ন মন স্ববশে আসে না। কিন্তু সে প্রকার সাধন চিরদিনের জন্য নহে। বিশেষতঃ যাঁহারা এ প্রকার কৃচ্ছ্র সাধন করিয়াছেন; তাঁহাদের অন্তরে একটী ভাব ছিল, যাহা বর্ত্তমান সময়ে আমরা অবলম্বন করি নাই। তাঁহারা যেন ভাবিয়াছিলেন যে, এই শরীরটা পাপের দুর্গ, এবং আত্মা ঈশ্বরের দুর্গ। পাপ-রিপু শরীর-দুর্গকে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের দুর্গকে অধিকার করিবার প্রয়াস পাইতেছে; অতএব পাপের দুর্গকে ভগ্ন ও রুগ্ন করিতে পারিলে, পাপের বাসা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। আমরা শরীরকে মানবের ধর্ম্মজীবনের শত্রু মনে করি না। চক্ষু সৌন্দর্য্য দেখিলেই স্বভাবতঃ প্রীত হয়, কর্ণ সুস্বর শুনিলেই আনন্দ লাভ করে, এই গ্রীষ্মের দিনে সুস্নিগ্ধ প্রাতঃসমীরণ শরীরকে স্নিগ্ধ করে, বিমল চন্দ্রিকা হৃদয়কে প্রফুল্ল করে, এই সমুদায় স্বভাবিক কার্য্য কি মানবের শ্রেষ্ঠ জীবনের বিরোধী? ইহা কি যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? আমরা ত দুইটা সৃষ্টিকর্ত্তা স্বীকার করি না। ঈশ্বর আমাদের ইন্দ্রিয় সকলের সহিত বাহ্যজগতের এরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিয়াছেন যে, কতকগুলি অবস্থা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক, অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য; অথচ সেগুলি আমাদের ধর্ম্মজীবনের বিরোধী, ইহা কি সম্ভব? আমরা আহার না করিলে ও নিদ্রা না গেলে বাঁচি না, দেহ রক্ষার জন্য তাহা অপরিহার্য্য; অথচ কেহ যদি বলেন, আহার ও নিদ্রা আমাদের ধর্ম্মজীবনের বিরোধী তাহা কি যুক্তিযুক্ত?

তৎপরে উপনিষদের এই বচন মধ্যে আরও দেখা যাইতেছে যে, ঋষি বলিতেছেন যে ব্রহ্মসাধক যে কেবল কাম্যবস্তু সকল

উপভোগ করেন তাহা নহে, কিন্তু সর্ব্ববিধ কাম্যবস্তুই উপভোগ করেন। এই উক্তির মধ্যে আরও বিশেষত্ব আছে। ইহার অর্থ এই, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, মনোগ্রাহ্য, হৃদয়গ্রাহ্য ও আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ সুখই ব্রহ্মসাধক ভোগ করিয়া থাকেন। এখানে প্রশ্ন হইতেছে, সকল প্রকার সুখই কি ধার্ম্মিকের ভোগ্য হইতে পারে? ইন্দ্রিয়-জনিত সুখ ও অধ্যাত্ম সুখ উভয় কি সমান? ধর্ম্মিক না হয় অধ্যাত্ম সুখভোগ করিলেন, কিন্তু ইন্দ্রিয়জনিত সুখকে নিকৃষ্ট বোধে তাঁহার পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

ইহা সকলেই অনুভব করিবেন যে, উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা অনুসারে সুখ সকলের মধ্যে তারতম্য আছে। কেবল মাত্র স্থায়িতা ও গভীরতা দ্বারা সুখের প্রকৃতির বিচার হয় না; তাহাদের প্রকৃতিগত তারতম্য আছে। চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় সমন্বিত অন্ন ব্যঞ্জন আহার করিয়া বা দুগ্ধ-ফেণ-নিভ শয্যাতে শয়ন করিয়া যে সুখ হয় তাহা এবং মহাত্মা নিউটন মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করিয়া যে সুখ অনুভব করিয়াছিলেন, উভয় কি সমান? যদি বল ঔদরিকের সুখ নিউটনের সুখের ন্যায় স্থায়ী ও গভীর নহে, এইমাত্র প্রভেদ। তাহা নহে; একজন আফগান পিতৃবৈরীকে হত্যা করিয়া অতি গভীর তৃপ্তি অনুভব করে এবং চিরজীবন সে চিন্তাতে আনন্দ পায়, তবে কি তাহার সুখ নিউটনের সুখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? ইহা কে বলিবে? সুখ মানবের সকল কার্য্যের লক্ষ্য, ইহা স্বীকার করিলেও যে সুখের প্রকৃতিগত তারতম্য আছে, এবং তাহা আমরা যে অনুভব করিতে পারি এরূপ বৃত্তিও আছে,

ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। সাধারণতঃ বলিতে গেলে, এই কথা বলিতে হয়, যে সুখ আমাদের আত্মা ও অনন্ত জীবন সংক্রান্ত তাহা উৎকৃষ্ট, আর যাহা আমাদের দেহ ও পার্থিব জীবন সংক্রান্ত তাহা নিকৃষ্ট! এখন প্রশ্ন এই যাহা নিকৃষ্ট তাহা কিরূপে ধার্ম্মিকের উপভোগ্য হইতে পারে?

এ স্থলে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, তাহা এই,—কোনও বিষয় তুলনাতে নিকৃষ্ট হইলেও নিষিদ্ধ না হইতে পারে অর্থাৎ তাহার অবলম্বনে পাপ না থাকিতে পারে। মনে কর বাষ্পীয় শকট অপেক্ষা অশ্বযান নিকৃষ্ট, অশ্বযান অপেক্ষা গো-যান নিকৃষ্ট, তাহা কে বলিতে পারে যে আমি যদি বাষ্পীয় শকটে না গিয়া গো শকটে যাই, আমার পাপ হইবে? তেমনি এই দেহ এবং এই পার্থিব জীবন সংক্রান্ত সুখ অধ্যাত্ম সুখ অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইলেও তাহার উপভোগে অপরাধ না থাকিতে পারে। বরং নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলেই দৃষ্ট হইবে যে মঙ্গলময় বিধাতা অনেক সময়ে দৈহিক ও পার্থিব সুখকেও আমাদের উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবনের সোপানরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। জগতের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ হৃদয়কে ঈশ্বর-প্রীতিতে উন্নত করিয়া থাকে।

বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টিলীলার এই এক রহস্য দেখিতে পাই যে, যে সকল কার্য্যের উপরে দেহ, মন, আত্মার রক্ষা উন্নতি নির্ভর করে, তাহার সঙ্গে তিনি সুখের যোগ করিয়া দিয়াছেন। উদ্দেশ্য বোধ হয় এই যে, মানুষ সুখের লোভেও সেই কার্য্য করিবে। অন্ন পান গ্রহণ ভিন্ন দেহ রক্ষা পায় না। সে

জন্য ক্ষুধার আয়োজন আছে। কেবল তাহা নহে, অন্ন পা. গ্রহণের সহিত এক প্রকার সুখেরও সংযোগ আছে। এইরূপে মনের পক্ষে জ্ঞান লাভ করা অতীব প্রয়োজনীয়; সুতরাং জ্ঞান লাভের সঙ্গেও গভীর সুখের যোগ আছে। শিশুটী তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্ত পদ সঞ্চালিত করিয়া আপনার মনে ক্রীড়া করিতেছে, তাহার অঙ্গগুলির গতিরোধ করিবার চেষ্টা কর, তাহার হস্ত পদ ধরিয়া রাখ, দেখিবে কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই সে ক্রন্দন করিয়া উঠিবে। ইহার কারণ কি? কারণ এই, হস্ত পদের ঐ ক্রিয়া তাহার পক্ষে অতীব সুখজনক। সেই সুখের ব্যাঘাত হয় বলিয়াই সে ক্রন্দন করে। বিধাতার কি বিচিত্র কৌশল! তিনি শিশুকে সুখের প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া তাহার হস্তপদ সঞ্চালিত করিয়া লইতেছেন, তাহার ক্ষুদ্র দেহের বৃদ্ধি ও বিকাশ করিতেছেন, সে তাহা জানিতেও পারিতেছে না। অত্যাবশ্যক কার্য্যের সঙ্গে এ প্রকার সুখের যোগ না থাকিলে অনেক কার্য্য মানুষ করিত না; সুতরাং মানুষের শরীর মনের আশানুরূপ উন্নতি হইত না। তাঁহার বিচিত্র বিধান এইরূপ, যে আমরা অনেক সময় নিকৃষ্ট সুখের সাহায্যেও উন্নত জীবনে অগ্রসর হই।

তবে ব্রহ্মসাধক কিভাবে কাম্যবস্তু সকল উপভোগ করিয়া থাকেন, উপনিষদকার ঋষি তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "তিনি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সর্ব্ববিধ কামনার বস্তু উপভোগ করেন।" এইটুকু ভিতরকার সংকেত। যে সুখ ব্রহ্মের সহিত উপভোগ করিতে পার না, যাহা তাঁহাকে ভুলিয়া উপভোগ কর, তাঁহা

হইতে দূরে গিয়া লাভ করিতে হয়, তাহা তোমার আমার বন্ধনের কারণ হয়। সেই খানেই মোহ এবং আসক্তির জন্ম। বিমল ও অকপট ঈশ্বর-প্রীতি যে হৃদয়ে বাস করিতেছে, তাহার নিকট সকলি মিষ্ট। প্রেমের চক্ষু মিষ্টতার চক্ষু। প্রেম হৃদয়কে নবীন করে, প্রকৃতিকে সুন্দর করে। প্রেমের চশ্মা চক্ষে পরিয়া জগতকে দেখ, সমুদায় পদার্থকে সৌন্দর্য্যে ভূষিত দেখিবে, চারিদিক হইতেই সুখের সমাচার আসিবে। বরং এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে সামান্য বিষয়ী লোকে বিষয় ভোগ করিয়া যে সুখ পায়, ঈশ্বরে প্রীতিমান ব্যক্তির নিকট সেই সকল বিষয় দশগুণ সুখকর।

বিশ্বাসী ও প্রেমিক জন যে নানাবিধ সুখ ভোগ করেন, তন্মধ্যে তিনটী নিয়ম আছে। সেই ত্রিবিধ নিয়ম বর্ত্তমান না থাকিলে মানুষ কখনই বিমল সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হয় না।

প্রথম নিয়ম, বিমল সুখ ভোগ করিবার পক্ষে প্রয়োজন এই যে মানুষ সুখের প্রার্থী হইবে না। সুখ তাহার আকাঙ্খার বস্তু হইবে না। সে সুখ-নিরপেক্ষ হইয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরেচ্ছার অনুগত হইবে, নিজ জীবনের উন্নতি সাধনে সযত্ন হইবে, জীবনের কর্ত্তব্য সকল পালনে মনোযোগী হইবে, তাহা হইলেই সুখ আপনা আপনি তাহার নিকটে আসিবে। যাঁহারা সুখবাদী, যাঁহাদের মত এই যে মানুষ সর্ব্ববিধ কার্য্যে সুখকেই অন্বেষণ করে, এবং দুঃখ-নিবৃত্তি ও সুখোৎপত্তির দ্বারাই সকল কার্য্যের উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার করিতে হইবে, তাঁহারাও এই কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, যে সুখকে

অন্বেষণ করিলে, সুখের আকাঙ্খা হৃদয়ে রাখিয়া কাজ করিলে, সুখ পাওয়া যাইবে না। সুখ নিরপেক্ষ হইয়া কর্ত্তব্য বোধে কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে, তাহা হইলে স্বতঃই সুখ আসিবে। মানুষের স্বভাবই এই যে যদি মানুষ সুখী হইলাম কিনা বলিয়া একবার আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় অমনি সুখ উবিয়া যায়। রাজ্যেশ্বর রাজা, যিনি সিংহাসনে আরূঢ়, যাঁহার নিদেশ পালনের জন্য শত শত ব্যক্তি সর্ব্বদা প্রস্তুত, তিনিও যদি "সুখী হইলাম কিনা?" এই প্রশ্ন করিয়া আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে আপনাকে দুঃখী বলিয়া দেখিতে পান। অতএব সুখের আকাঙ্খাকে হৃদয় হইতে বিদায় করিয়া জীবনের মহত্ব সাধনে ও কর্ত্তব্য পালনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে; তাহা হইলে কে কোথা দিয়া অঞ্চল ভরিয়া সুখ দিয়া যাইবে, তাহা জানিতেও পারিবে না। অতএব যদি সুখ চাও, তবে সুখ চাহিও না,—এই কথা পরস্পর বিসম্বাদী হইলেও ইহার মধ্যে সত্য আছে।

সুখ সম্বন্ধে দ্বিতীয় নিয়ম—সুখের অধীন হইলে চলিবে না। সর্ব্বদা দেখিবে যে কাম্যবস্তু উপভোগ করিতেছ, তাহা ঈশ্বরের আদেশ মাত্র ও প্রয়োজন হইবামাত্র ছাড়িতে পার কি না? যদি ঈশ্বরাদেশে তাহা ছাড়িতে না পার, জগতের কল্যাণের জন্য আবশ্যক হইলে পরিত্যাগ করিতে না পার, তবে তুমি তাহাতে আসক্ত, তুমি তাহার অধীন, তোমাকে তাহা গ্রাস করিয়াছে, জয় করিয়াছে, ক্রীতদাস করিয়াছে। যে সুখের ক্রীতদাস, কিন্তু সুখের অধিপতি নহে, তাহার সুখ ত্বরায় দুঃখে

পরিণত হয়। যে সুখের দাস কিন্তু ঈশ্বরের দাস নহে, সে ঈশ্বর-প্রীতির অধিকারী হয় না। স্বাধীনে স্বাধীনে প্রেম হয়, ক্রীতদাসের সহিত রাজ্যেশ্বরের কি প্রেম সম্ভব ? যে সুখের গোলাম ঈশ্বর-প্রীতি তাহার জন্য নহে।

সুখ সম্বন্ধে তৃতীয় নিয়ম এই—সুখের প্রতি নিজের কোনও অধিকার বা দাওয়া আছে, এরূপ মনে করিবে না। তাহা ঈশ্বরের দান, সুতরাং ধন্যবাদের সহিত সমুদায় সুখকে গ্রহণ করিবে। আমরা অনেক সময়ে ধন্যবাদ-বিহীন হইয়া সুখভোগ করিতে যাই বলিয়া তাহার মিষ্টতা সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারি না। গৃহস্থের গৃহে আমরা দুই শ্রেণীর শিশু দেখিতে পাই। কতকগুলি বালক বালিকা এমনি নির্লোভ ও সরল প্রকৃতি যে তাহাদের জনক জননী একটু কিছু মিষ্ট দ্রব্য দিবামাত্র তাহারা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। "হো ! হো ! আমি কেমন খাবার পেয়েছি গো ! " এই বলিয়া দৌড়িয়া গিয়া অপর দশজন সমবয়স্ক শিশুকে দেখাইবার জন্য ব্যগ্র। তখন হয়ত মাতা বলিতেছেন, "ওরে স্থির হ, তোকে আরও খাবার দিবার আছে, আরও মিষ্ট দিব।" তাহার পক্ষে আর অধিক মিষ্টের প্রয়োজন নাই সে যাহা পাইয়াছে তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আর এক শ্রেণীর শিশু দেখিতে পাই, তাহাদের প্রকৃতি অন্য প্রকার। তাহারা অল্পে সন্তুষ্ট হয় না। প্রচুর পরিমাণে দিলেও খুঁত খুঁত করিতে থাকে। যাহা হস্তে পাইয়াছে সে দিকে দৃষ্টি করে না, মুখে বলিতে থাকে, "আরও দেও;" আরও—আরও—এই "আরও"

কোন ক্রমেই ঘোচে না। মানুষের মধ্যেও যেন এই প্রকার দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই। এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহাদের হৃদয় হইতে সর্ব্বদাই ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইতেছে। তাঁহারা অল্পে সন্তুষ্ট, এবং সুখের লালসা রাখেন না। যে কিছু সুখ প্রাপ্ত হন, অমনি সুখদাতাকে অগণ্য ধন্যবাদ করেন। ইহাদের জীবন সতত মিস্ট। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা এমনি সুখ-প্রিয় যে তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা আর মিটে না। তাঁহাদের কথার ভাবে এরূপ বোধ হয় যে তাঁহারা যেন ঈশ্বরের আদুরে সন্তান, সর্ব্বদা দুগ্ধের বাটীতে চিনি দিয়া মুখে ধরিয়া তাঁহাদিগকে মানুষ করিতে হইবে। যে প্রকৃতিতে এ প্রকার সুখ প্রিয়তা আছে, তাহা উন্নত ধর্ম্ম জীবনের অনুপযুক্ত। এজগতে সুখ দুঃখ নিরপেক্ষ হইয়া ঈশ্বরেচ্ছার অনুসরণ করিতে হইবে, এবং ধন্যবাদের অন্ন মুখে দিতে হইবে, তাহা হইলেই বিমল সুখ লাভ করিবে।

মানব-জীবন।

যোগাবাশিষ্ট গ্রন্থে একটী বচন আছে ঃ—

"তরবোপিহি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনোযস্য মননেন হি জীবতি॥"

অর্থঃ—তরুলতাও জীবন ধারণ করে; পশু পক্ষীও জীবন ধারণ করে; সেই প্রকৃত জীবন ধারণ করে, যে মননের দ্বারা জীবন ধারণ করে।" মননের দ্বারা জীবন ধারণ করা কিরূপ? প্রথম,—মনের জ্ঞান বৃত্তি যদ্দ্বারা আমরা সত্য উপার্জ্জন করি, তাহা দ্বারা যে জীবন ধারণ করে অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান দ্বারা যে জীবন ধারণ করে, সেই প্রকৃত জীবন ধারণ করে।

দ্বিতীয়তঃ—ব্রহ্ম মননের দ্বারা যে জীবন ধারণ করে, সেই প্রকৃত রূপ জীবন ধারণ করে।

এখানে তিন প্রকার জীবনের উল্লেখ আছে, তরুলতার জীবন, পশুপক্ষীর জীবন এবং মানব-জীবন। মাহাত্মা Theodore Parker একস্থানে বলিয়াছেন ঃ—

'উদ্ভিদ, জড় পদার্থ, কাষ্ঠ, লোষ্ট্র পাষাণ প্রভৃতির ন্যায় এবং আরও কিছু বেশী; ইতর প্রাণী উদ্ভিদ এবং আরও কিছু বেশী; মানব ইতর প্রাণী এবং আরও কিছু বেশী।" এই আরও কিছু বেশীর মধ্যেই মনুষ্যত্ব। এই কিছু বেশীটুকু লাভ করিলেই মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়।

বিচার করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে পশু পক্ষীদিগেরও মনুষ্যের ন্যায় জ্ঞান, বিচার-শক্তি. প্রভৃতি সমস্তই বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহারা যে কেবল মাত্র ক্ষুধা, তৃষ্ণা, হর্ষ, বিষাদ প্রভৃতিরই অধীন তাহা নহে; তাহাদের মধ্যেও জ্ঞান এবং বিচার-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বিগত কয়েক বৎসর কাল পণ্ডিতগণ ইহাদের আচরণ ও কার্য্যকলাপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া ইহাদের জ্ঞান ও বিচার শক্তির যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেবল তাহা নহে; দয়া, পরোপকার-প্রবৃত্তি প্রভৃতি যে সব উন্নত ভাব মানব-জীবনে ধর্ম্মভাব নামে অভিহিত, তাহাও তাহাদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

তাহাই যদি হইল, তবে মানবেতে আর পশু পক্ষীতে প্রভেদ কি? মানবের বিশেষত্ব তিনটী বিষয়ে রহিয়াছে ঃ—

প্রথম আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা; আমরা দেখিতে পাই যে ঈশ্বর মনুষ্য মাত্রকেই এই আশ্চর্য্য স্বভাব দিয়াছেন, যে মানব-মন চারিদিকে নানাবিধ ভোগ-সুখের সামগ্রী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিয়াও তাহাতে তৃপ্ত নহে; সর্ব্বদাই কি এক অদৃশ্য বিষয়ের জন্য লালায়িত! মানব যে দৃশ্যজগতে বাস করিতেছে তাহা ভুলিয়া গিয়া মনোময় রাজ্য গড়িয়া তাহার মধ্যে বাস করে; এবং তাহার মধ্যেই নিজ সুখ দুঃখ স্থাপন করে। অদৃশ্য ও আধ্যাত্মিক সত্য সকলের চিন্তাতে এত ব্যাপৃত হইতে পারে যে দৈহিক সুখকে সুখ জ্ঞান করে না, বিপদকে বিপদ জ্ঞান করে না। যে সকল বিষয়

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে. কেবল আত্মার ভাবময় সৃষ্টি মাত্র, তাহাতেও মানব এতদূর আসক্ত হইতে পারে যে কোনও জীব অপর জীবের প্রতি এত আসক্ত হইতে পারে না। এই আধ্যাত্মিকতা মানব-প্রকৃতির এক গূঢ় রহস্য।

মহাত্মা যীশুর প্রচারিত স্বর্গ রাজ্যের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই স্বর্গ রাজ্যের প্রকৃতি যে কি তাহা ধারণা করা কঠিন। এই মাত্র বুঝা যায় যে ইহা মানব সমাজের একটী আকাঙ্ক্ষিত উন্নত অবস্থা মাত্র, যাহাতে মানব ঈশ্বরের অধীন হইবে। কিন্তু এই সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় পদার্থের প্রতি যীশুর মনের কি প্রগাঢ় অভিনিবেশ! এই স্বর্গ রাজ্য পৃথিবীতে আনিবার জন্যই তিনি লালায়িত ছিলেন। আহারে বিহারে নিয়তই এই চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া থাকিত; এবং ইহার জন্যই তিনি জীবন উৎসর্গ করিলেন।

বুদ্ধের নির্ব্বাণ ধর্ম্ম কি? তাহা তিনিই জানিতেন। কিন্তু দেখিতে পাই যে ইহার জন্যই তিনি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজপুত্র হইয়া ভিক্ষু হইয়াছিলেন। সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া, উঠিতে বসিতে নিদ্রাতে জাগরণে সর্ব্বদাই ঐ বিষয়। ইহা বলিলে কিছুই অত্যুক্তি হয় না যে মানব ইতিবৃত্তে যে সকল মহাজনের জীবনচরিত আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা সকলেই এইরূপ কোন না প্রবল আকাঙ্ক্ষার গুণেই মহত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। যে হৃদয়ে কোনও মহৎ আকাঙ্ক্ষা থাকে না, তাহা জীবনের উচ্চ ভূমিতে উঠিতে পারে না; অনিবার্য্য রূপেই ধূলাতে লুটায়। যে পরিমাণে

হৃদয়ে আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চ আদর্শ কাজ করে, সেই পরিমাণে মানবের মনুষ্যত্ব হয়।

আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার দৃষ্টান্ত যে কেবল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাজনদিগের জীবনেই দেখা যায় তাহা নহে, রাজনৈতিক, সকল বিভাগেই এরূপ উন্নত আদর্শ-গ্রস্ত লোক দৃষ্ট হইতেছে। জোসেফ ম্যাটসিনির কথা অনেকেই অবগত আছেন। পরাধীন ইটালি কিরূপে স্বাধীন হইতে পারে এই চিন্তা তাঁর মনে এমনি প্রবল হইয়াছিল যে, তাহার জন্যই তিনি দেহ মন সমর্পণ করিলেন। হাতের নিকটে সুখের সকল উপায় থাকিতে সে সকলে অবহেলা করিয়া, স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া, দেশে দেশে দরিদ্রের বেশে ভ্রমণ করিয়া জীবন শেষ করিলেন। কিছুতেই তাঁহার হৃদয় হইতে সে ভাব গেল না। এখনও এমন কত লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহাদের মনে এইরূপ এক একটা নেশা লাগিয়া তাঁহাদিগকে তাহাতে নিমগ্ন রাখিয়াছে। সেই সত্তেই তাঁহারা বাস করিতেছেন, তাহাতেই জীবন ধারণ করিতেছেন। কে কোন ইতরপ্রাণীতে এইরূপ ভাব দেখিয়াছেন? দৃশ্য জগৎকে ভুলিয়া কবে তাহারা অদৃশ্য জগতের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে? দেশের স্বাধীনতার জন্য, স্বজাতির কল্যাণের জন্য, সামাজিক দুর্গতি দূর করিবার জন্য কত লোকই প্রাণ দিতেছে, এরূপ দৃষ্টান্ত অহরহ দেখিতে পাই, কিন্তু কে কবে ইতরপ্রাণীকে এইরূপ স্বজাতির জন্য, স্বাধীনতার জন্য, জীবন উৎসর্গ করিতে দেখিয়াছেন? তাহারা সম্মুখে যে জিনিষ দেখিতে পায় তাহাই ভালবাসে; আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা যে

কি তাহা তাহারা কিছুই জানে না ; সত্যকে যে প্রীতি করিতে হয় তাহা তাহারা জানে না। মানুষ এই সমস্ত বিষয় জানে এবং এইখানেই তাহার বিশেষত্ব এবং ইতরপ্রাণীর সহিত পার্থক্য।

মানব সমাজের বর্ব্বরাবস্থাতে মানব-জীবন পশুজীবনের অনেক নিকটে থাকে, সুতরাং সে অবস্থাতে জীবনের অধিক উচ্চলক্ষ্য বা আধ্যাত্মিক আদর্শের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তখন মানব আহার নিদ্রা ভয়াদির অধীন হইয়া জীবন যাপন করে ; এবং অধিক পরিমাণে দৃশ্য জগতেই বাস করে। কিন্তু যতই মানব সূক্ষ্ম ও আধ্যাত্মিক বিষয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, ততই বর্ব্বর অবস্থা হইতে উন্নত হইতে থাকে। এক্ষণে যে সকল জাতি সভ্যতাতে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা এই আধ্যাত্ম-বিষয় গ্রহণের শক্তির গুণেই উন্নত হইয়াছেন। সেই সকল জাতির মধ্যে বহুসংখ্যক ব্যক্তির এই আধ্যাত্ম-পরায়ণতা থাকাতেই তাঁহারা মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। সে সকল দেশে অতি সামান্যাবস্থার লোকদিগেরও এ জ্ঞান আছে যে কেবল অর্থোপার্জ্জন ও পানাহার নিদ্রাদির দ্বারা মানবজীবনের মহত্ত্ব হয় না ; ইহার অতিরিক্ত আরও কিছু চাই। মহাত্মা যীশু বলিয়াছিলেন, মানব কেবলমাত্র অন্ন পান দ্বারা জীবন ধারণ করে না ; কিন্তু ঈশ্বরের মুখবিনিসৃত প্রত্যেক বাণীর দ্বারা জীবিত থাকে। সত্যই ঈশ্বরের মুখ বিনিসৃত বাণী। সত্যই দেবভোগ্য অমৃত। সত্যের দ্বারা যিনি জীবন ধারণ করেন তিনিই জীবিত।

মানব জীবনের মহত্ত্ব সাধন বিষয়ে এই একটী প্রধান স্মরণীয় বিষয়!

দ্বিতীয় পার্থক্য এই দেখি, মানব প্রকৃতিতে অনুতাপের গভীরতা এবং আত্ম-প্রসাদের উচ্চতা আছে। কোন ইতর-প্রাণীতে এই দুইয়ের একটী দেখিতে পাওয়া যায় না। কুকুর কোনও দোষ করিলে তাহার প্রভু বাড়ী আসিয়া তাহার মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারেন, এরূপ ঘটনা অনেক দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ইহা অনুতাপের পরিচায়ক নহে, কেবল মাত্র সাজা পাইবার ভয়েই তাহাদের মুখের ঐরূপ ভাব হইয়া থাকে। প্রকৃত অনুতাপ ইতরপ্রাণীতে নাই। ভূতকালে কোন গর্হিত কার্য্য করিয়াছে বলিয়া তাহারা কি কখনও যাতনা পাইয়া থাকে? কখনই না। কিন্তু মানব চরিত্রে এইরূপ অনুতাপ সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ ঘটনা অনেকবার ঘটিয়াছে যে মানুষ ভূতকালে স্বকৃত অপরাধের কথা স্মরণ করিয়া নিজে ইচ্ছা পূর্ব্বক রাজপুরুষদিগের হস্তে ধরা দিয়াছে; এবং গুরুতর রাজদণ্ড ভোগ করিয়াছে।

এক সময়ে একজন ইউরোপীয় ভদ্র লোক একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন। সেটী এই যে তিনি ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বে নিজ শ্বশুরের নিকটে বিদায় লইতে গেলেন তাঁহার শ্বশুর যৌবনকালে ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন না; ঘোর বিষয়ী এবং ধর্ম্মে উদাসীন ছিলেন। বার্দ্ধক্যে তাঁহার হৃদয়ের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল; তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইয়া-

ছিলেন। বিদায় প্রার্থনা করিতে গিয়া, জামাতা ঘরে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে তিনি কাঁদিতেছিলেন। তিনি শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনাকে এতটা উত্তেজিত দেখিতেছি তাহার কারণ কি? আপনি কাঁদিতেছিলেন কি?" উত্তরে তাঁহার শ্বশুর বলিলেন,—"অনেক বৎসর গত হইল যখন আমাদিগের বিষয় সম্পত্তি ভাগ হয় তখন একখানি কুড়ালি, যাহা আমি অতিশয় ভাল বাসিতাম, পাছে আমার ভাগে না পড়িয়া ভ্রাতার ভাগে পড়ে, এই ভয়ে আমি তাহা অগ্রেই লুকাইয়াছিলাম। এখন সেই কথা মনে হইয়া আমার যার পর নাই যাতনা হইতেছে, কেন আমার ভাইকে আমি প্রবঞ্চনা করিয়াছিলাম? ভাই এখন আর ইহজগতে নাই, আমি ত আর তার ক্ষতি পূরণ করিতে পারিব না। এই অনুতাপে আমি কাঁদিতেছি।" চল্লিশ বৎসর পরে একটী পাপ স্মরণ করিয়া এরূপ অশ্রুপাত করা কি কোনও ইতরপ্রাণীর পক্ষে সম্ভব, ইহা মানবেরই উচ্চ অধিকার।

এইরূপ আত্ম-প্রসাদের উচ্চতাও কেবল মানবে সম্ভব। কোনও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মনে যেরূপ আনন্দ হয়, সেরূপ আনন্দ ইতর প্রাণীতে সম্ভবে না। ইহার একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি;—ডেনমার্ক দেশে যখন ভয়নাক শীত পড়ে, তখন সমুদ্রের জল জমিয়া তুহিন-শিলাময় হইয়া যায়। তখন সহ-রের লোক সেই তুহিন-রাশির উপরে শ্লেজনামক গাড়ী লইয়া ক্রীড়া করিতে যায়। কিন্তু সে দেশে মধ্যে মধ্যে এক প্রকার

মেঘের উদয় হইয়া বৃষ্টি হইয়া থাকে। ঐ ঝড় বৃষ্টির একটা প্রকৃতি এই, যে সেই বিশেষ মেঘের উদয় হইবামাত্র হঠাৎ বরফ রাশি গলিতে আরম্ভ হয়; এবং অল্প সময়ের মধ্যে ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। একবার একদিন সহরের লোক তুহিন-রাশির উপরে খেলিতে গিয়াছে, এমন সময়ে আকাশে হঠাৎ সেই সাংঘাতিক মেঘের উদয় হইল। একটী বৃদ্ধা দরিদ্রা সহায়হীনা স্ত্রীলোক অনতিদূরে সাগরকূলে একটী পর্ণকুটীরে বাস করিত সে হঠাৎ আকাশে সেই ভয়ঙ্কর মেঘ দেখিয়া ভীতা হইল। ২০। ৫ বৎসরের মধ্যে এরূপ মেঘ আর দেখা যায় নাই। কে এই বিপদ হইতে আমোদে মত্ত সহরবাসীকে উদ্ধার করিবে ভাবিয়া বৃদ্ধা আকুল হইয়া উঠিল। সে নিজে পীড়িতা ও চলিতে অসমর্থা। অনেক চিন্তার পর একটী উপায় উদ্ভাবন করিল;—অতি কষ্টে ঘর হইতে বাহির হইয়া নিজের ঘরেই আগুন লাগাইয়া দিল। আগুন হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তখন সকলেই ভাবিতে লাগিল যে "তাই ত, কি হবে, এযে দেখি বৃদ্ধার ঘরেই আগুন।" সকলেই সেই বৃদ্ধাকে অত্যন্ত ভাল বসিত; সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া সকলেই ক্রীড়া ফেলিয়া বৃদ্ধার গৃহের অভিমুখে ধাবিত হইল। আসিয়া দেখিল বৃদ্ধা অচেতেন অবস্থায় পড়িয়া আছে। অনেক চেষ্টার পরে জ্ঞান হইলে বৃদ্ধা প্রথম প্রশ্ন এই করিল,— "সকলেই কুশলে ফিরিয়া আসিয়াছে ত?" যখন শুনিল সকলেই নিরাপদ তখন তাহার মুখে কি এক অপূর্ব্ব সন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ পাইল। "ঈশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ" বলিয়া বৃদ্ধা আবার নয়ন মুদ্রিত করিল। সেই নয়ন মুদ্রিত করাই শেষ নয়ন মুদ্রিত

করা। বৃদ্ধার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তের সেই সন্তোষের বিষয়ে একবার চিন্তা করিয়া দেখ, কোনও ইতরপ্রাণীতে কি এরূপ আত্ম-প্রসাদ সম্ভব?

তৃতীয়তঃ মানবে যে কর্ত্তব্য জ্ঞানের নিদর্শন প্রাপ্ত হই তাহা ইতরপ্রাণীতে কখনই দেখা যায় না।

একবার সমুদ্রের মধ্যে একখানি জাহাজে হঠাৎ আগুন লাগিয়াছিল। জাহাজের তলে কোথায় যে আগুন লাগিল, কোথা হইতে যে ধূম আসিতে লাগিল, তাহা কেহই ঠিক করিতে পারিল না। সকলেই নিশ্চয় বিশ্বাস করিল যে জাহাজ অচিরে জ্বলিয়া যাইবে। হিসাব করিয়া দেখা গেল যে অতিশয় দ্রুতবেগে চালাইলে, জাহাজ বিনষ্ট হইবার পূর্ব্বে তীরে পৌঁছিতে পারে। সুতরাং তীরের দিকে জাহাজ চালান হইল। এঞ্জিন-চালক বীরের ন্যায় তাহার স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া আগুনের অসহ্য উত্তাপ সত্বেও কল চালাইতে লাগিল। কাপ্তেন ক্রমাগত ডাকিয়া তাহার সংবাদ লইতেছেন। কাপ্তেন উপর হইতে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"কেমন আছ?" উত্তর আসিতেছে—all right, অর্থাৎ এখনও ভাল আছি। কিন্তু ক্রমে তাহার কণ্ঠ স্বর বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, ক্রমে কাপ্তেনের প্রশ্নের উত্তরে কেবল গোঁ গোঁ শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। ক্রমে আর কোন শব্দ ও শুনা যায় না। কিন্তু তখনও তাহার হস্ত তাহার কার্য্যে নিযুক্ত। ক্রমে যখন জাহাজ তীরে আসিয়া লাগিল, তখন তাহাকে বাহির করিয়া দেখা গেল, যে সে অচেতন হইয়া পড়িয়াছে; ধূমে শ্বাস বন্ধ হইয়া

গিয়াছে ; অগ্নিতে পদদ্বয় অৰ্দ্ধসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আর কয়েক মিনিট বিলম্ব হইলেই তাহার জীবন বিনষ্ট হইত। কোনও ইতর প্রাণীতে এরূপ কর্ত্তব্য-পরায়ণতা কি কেহ কখনও দেখিয়াছেন ?

তৎপরে আর একটী প্রধান বিষয়ে ইতর প্রাণী হইতে মানবের পার্থক্য দেখিতে পাই ; তাহা অনন্তের ধ্যান ও আরাধনা। প্রত্যেক পরিমিত সত্তা এক অনন্ত সত্তার ক্রোড়ে শায়িত এবং প্রত্যেক পরিমিত শক্তি এক মহাশক্তি হইতে উদ্ভূত, ইহা মানব ভিন্ন ইতর প্রাণী কখনও অনুভব করিতে পারে না। সুসভ্য ও অসভ্য সকল অবস্থাতে মানবের এই এক প্রধান লক্ষণ যে মানুষ উপাসনা-শীল জীব। মানব যেমন উদরান্নের জন্য কৃষি বাণিজ্যের বিস্তার করিয়াছে, মস্তক রাখিবার জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে, জ্ঞানালোচনার জন্য শিল্প সাহিত্যাদির সৃষ্টি করিয়াছে, তেমনি আরাধনার জন্য দেবমন্দির, উপাসনালয় প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছে। অপরাপর প্রাণীর ন্যায় দৃশ্য ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় সকল যে মানবের অভিনিবেশ তাহাতে কিছুই বিচিত্রতা নাই, তাহা সকল প্রাণীর পক্ষেই স্বাভাবিক। কিন্তু এই অদৃশ্য পদার্থের প্রতি অভিনিবেশ, এই অতীন্দ্রিয় শক্তির আরাধনা, ইহা মানব প্রকৃতির এক গূঢ় রহস্য। মানবের ভাষা বোঝে না এবং মানবের ভাবের অনুরূপ ভাব যাহার নয়, এমন কোনও জীব যদি মানবের এই আরাধনা ব্যাপার দর্শন করে, তবে তাহার পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর ব্যাপার আর কিছুই হইতে পারে না।

তবে দেখা যাইতেছে যে ত্রিবিধ গুণে মানব ইতর প্রাণী হইতে বিভিন্ন ও শ্রেষ্ঠ। প্রথম আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা, দ্বিতীয় বিবেক শক্তি, তৃতীয় অনন্তের ধ্যান ও আরাধনা। ইতর প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে হইলে মানবের এই ত্রিবিধ-গুণ-সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। এই তিনটী গুণ কেবল আদর্শ স্থলে থাকিলে চলিবে না, কিন্তু সাধন দ্বারা জীবনে পরিণত করিতে হইবে। আত্মাতে যাহাতে সত্যানুরাগ উদ্দীপ্ত হয়, চিত্ত যাহাতে সত্য-প্রীতিতে বাস করিতে অভ্যস্ত হয়, এইরূপ উপায় সকল অবলম্বন করিতে হইবে; সতের অনুষ্ঠান অসত্যের বর্জ্জন উভয় দিকেই দৃষ্টি রাখিতে হইবে; কর্ত্তব্য পরায়ণতাকে ধর্ম্মসাধনের প্রধান উপায় জানিয়া যত্ন সহকারে সাধন করিতে হইবে; সর্ব্বোপরি জীবনকে ঈশ্বরারাধানতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে; তাহা হইলেই আমরা প্রকৃত মনুষ্য জীবন লাভ করিতে সমর্থ হইব। জীবনের এই উচ্চ আদর্শ যদি সম্মুখে রাখা না যায় তাহা হইলে এ জীবনের পক্ষে ক্ষুদ্রতার মধ্যে পতিত হওয়া অনিবার্য্য।

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ নামে একটী অতি স্নন্দর আখ্যায়িকা আছে। তাহা এই, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সংসার হইতে অবস্ত হইবার বাসনা করিয়া স্বীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিলেন, "এস তোমাকে বিষয় সম্পত্তি ভাগ করিয়া দি।" মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে ভগবান! যদি ধনরত্নপূর্ণা এই মেদিনী আমার হয়, আমি কি তদ্দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিতে পারি?" যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন,—না, ধন সম্পদশালী ব্যক্তিগণের জীবন যেরূপ দেখিতেছ, তোমার জীবনও সেইরূপ হইবে, ধনের দ্বারা অমৃতত্ব লাভের আশা নাই।" ইহা শুনিয়া মৈত্রেয়ী বলিলেন—"যদ্দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ করিতে না পারি তাহা লইয়া আমি কি করিব? আপনি পরমার্থ তত্ত্ব যাহা জানেন তাহা আমাকে উপদেশ করুন।" এই বাক্য শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্য সাতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন—"হে সতি! তুমি আমার প্রিয়া, প্রিয়ার ন্যায় কথা বলিয়াছ, এস আমার নিকটে উপবেশন কর, আমি তোমার নিকট পরমতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছি. তুমি আমার বাক্যের প্রতি প্রণিধান কর।" এই বলিয়া মহর্ষি পত্নীর নিকটে আত্ম-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যাঁহারা সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ তাঁহাদের সকলকে বৃহদারণ্যক উপনিষদের এই মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদটী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আত্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে এমন স্নন্দর ও এমন গভীর উপদেশ অধিক পড়িয়াছি

বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আত্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া অবশেষে ব্রহ্ম-সাধনের একটী প্রণালী নির্দ্দেশ করিলেন, তাহা এই,—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" অর্থ—"ওরে মৈত্রেয়ি! এই পরমাত্মা, যাঁহার কথা তোমাকে বলিলাম, ইহার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে।" উপনিষদের এই উক্তিকে অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তীকালে ভারতীয় ব্রহ্মসাধকগণের মধ্যে "শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন"ই সাধন প্রণালীরূপে অবলম্বিত হইয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছেন, এই তিনটী সমান-ভাবে প্রয়োজন, ইহার কোনটীকে পরিহার করিলে চলে না। অতএব এই শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন কি তাহা নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন হইতেছে। প্রথম শ্রবণ ; ভগবান শঙ্করাচার্য্য তাঁহার প্রণীত ভাষ্যে শ্রবণ শব্দের ব্যাখ্যা করিবার সময় বলিয়াছেন যে, আগমাদি শাস্ত্র ও গুরুবাক্য এই উভয়ের দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার নাম শ্রবণ।

শাস্ত্র শব্দের অর্থ কি? শাস্ত্র অর্থাৎ জগতের বহুশতাব্দীর সঞ্চিত জ্ঞান-ভাণ্ডার। বিধাতার এই এক অপার কৃপা দেখিতে পাই যে, অদ্যাবধি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন ভিন্ন জাতি মধ্যে পরমার্থ সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি মানবের হৃদয়কে সত্যের ও ধর্ম্মের এরূপ অনুগত করিয়া দিয়াছেন যে, মানুষ সেগুলিকে বিনষ্ট হইতে দেয় নাই। রাষ্ট্র-বিপ্লবে ও সমাজ-বিপ্লবে সম্রাটদিগের কীর্ত্তি সকল বিলুপ্ত

হইয়াছে, সমৃদ্ধিশালী রাজনগর সকল ভগ্নাবশিষ্ট হইয়াছে, সম্ভ্রান্ত রাজবংশ সকলের নাম জগতের ইতিবৃত্ত হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ সকল অমূল্য সত্য মানব-হৃদয়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া যুগে যুগে অবিলুপ্ত থাকিয়া গিয়াছে। গৃহে অগ্নি লাগিলে জননী যেমন ক্রোড়স্থিত শিশুটীকে বক্ষে ধরিয়া পলায়ন করে, তেমনি সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যে মনুষ্যজাতি ঐ সত্যগুলিকে বক্ষে পূরিয়া রাখিয়াছে। দেখিলে বোধ হয় রাজপুত নারী যেমন ঘোর বিপ্লবের মধ্যে নিজের পুত্রটীকে বিনষ্ট হইতে দিয়া রাজার পুত্রটীকে রক্ষা করিয়াছিল, তেমনি মনুষ্যও যেন নিজের যাহা কিছু সমুদায় বিনষ্ট হইতে দিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরের যাহা কিছু তৎসমুদায়কে প্রাণপণে রক্ষা করিয়াছে। মানুষের ধর্ম্মপ্রবণতা এমনি স্বাভাবিক, যে হীরকের লোভে মানুষ যেমন তন্মিশ্রিত মৃত্তিকাকেও যত্নপূর্ব্বক তৎসঙ্গে তুলিয়া রাখে, তেমনি অমূল্য সত্যগুলির জন্য মানুষ তৎসঙ্গে অনেক প্রকার ভ্রম এবং কুসংস্কারও যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতেছে!

কিছুকাল পূর্ব্বে জগতের জাতি সকলের হৃদয় অতি সংকীর্ণ ছিল। প্রত্যেক জাতি মনে করিত যে, তাহারাই ঈশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত ও অপরে ঈশ্বর-বর্জ্জিত। মানবাত্মার পারমার্থিক কল্যাণের উপায়-স্বরূপ সত্য সকলকে ঈশ্বর এক বিশেষ জাতি মধ্যেই প্রকাশ করিয়াছেন! এইরূপে আর্য্য অনার্য্য, হিন্দু ম্লেচ্ছ, গ্রীক বর্ব্বর, য়িহুদী জেণ্টাইল, মস্লেম কাফের প্রভৃতি শব্দের সৃষ্টি হইয়াছিল। আর্য্যেরা মনে করিতেন

তাঁহারাই দেবগণের বিশেষ প্রিয় ; গ্রীকেরা বিবেচনা করিতেন বর্ব্বরগণ, দাসত্বের জন্যই সৃষ্ট ; হিন্দুরা বিবেচনা করিতেন, পরিত্রাণ ম্লেচ্ছদিগের জন্য নহে ; মুসলমানেরা ভাবিতেন, কাফেরকে হত্যা করিলে পাপ নাই, বরং পুণ্যই আছে। জগতের সৌভাগ্যক্রমে সেই সংকীর্ণতার দিন ক্রমেই অবসান হইতেছে। তৎপরিবর্ত্তে আমরা এক মহৎ ও উদারভাব প্রাপ্ত হইতেছি, যাহাতে বলে, মনুষ্যজাতি এক বৃহৎ পরিবার, সমগ্র পৃথিবী যাহাদের বাসগৃহ, ঈশ্বর যাহাদের পিতা মাতা, সাধুগণ যাহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, জগৎ ও মানব-প্রকৃতি যাহাদের পাঠ্য-গ্রন্থ, স্বয়ং ঈশ্বর যাহাদের গুরু এবং পরিত্রাণ যাহাদের সকলেরই লভ্য ! এই মহৎ ভাব আমরা ক্রমে ক্রমে হৃদয়ে ধারণ করিতেছি। শাক্যসিংহ বা সক্রেটীস, যীশু বা চৈতন্য আমরা সকলকেই এখন এক পরিবারের লোক বলিয়া ভাবিতে শিখিতেছি। এখন এই বিশ্বাস অনিবার্য্য রূপে চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের হৃদয়কে অধিকার করিতেছে, যে ঈশ্বর সকল যুগে সকল দেশে, ও সকল জাতি মধ্যে মুক্তি-প্রদ সত্য সকল প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সকল সত্য সাধু মহাজনদিগের মুখদ্বারা উক্ত হইয়া তৎ তৎ দেশে ও তৎ তৎ জাতিমধ্যে সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। লিখিবার রীতি প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে এই সকল সত্য শ্রুতিপরম্পরাতে নামিয়া আসিত, লিখিবার প্রণালী প্রচলিত হওয়ার পর ইহার অধিকাংশ লিপিবদ্ধ হইয়া গ্রন্থের আকারে রহিয়াছে। এই সকল গ্রন্থ শাস্ত্র নামে অভিহিত। ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিলে আমরা

ব্রহ্মের সত্তা ও স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারি।

কিন্তু শাস্ত্রই, শ্রবণের এক মাত্র উপায় নহে। শাস্ত্র লিপিবদ্ধ জ্ঞান মাত্র; যেমন সংগীতের স্বরলিপি। যেমন স্বরলিপি মুখস্থ করিয়া রাখিলেই কেহ সুগায়ক হয় না, স্বরলিপির প্রদর্শিত স্বর কণ্ঠে আনিতে হয়, তেমনি শাস্ত্র পাঠ করিলেই কেহ ধার্ম্মিক হয় না শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মকে জীবনে সাধন করিতে হয়। লিপিবদ্ধ জ্ঞান ও জীবন্ত জ্ঞান উভয়ে অনেক প্রভেদ। জীবন্ত মানুষ যাহা জানিয়াছে, শুনিয়াছে, ভাবিয়াছে ও ভোগ করিয়াছে, তাহার অল্প অংশই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অদ্যাপি জগতে এই নিয়ম চলিতেছে। কোন্ কবি, কোন্ কালিদাস, কোন্ সেক্সপিয়ার আজ পর্য্যন্ত জীবন্ত মানুষের সকল ভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে? লিপিবদ্ধ সাহিত্যের পশ্চাতে সর্ব্বদাই একদল জীবন্ত মানুষ রহিয়াছে, যাহাদের হৃদ্‌গত ভাবের, হৃদ্‌গত আশা ও আকাঙ্ক্ষার কিয়দংশ লিপিবদ্ধ হইয়া শাস্ত্রের আকার ধারণ করিতেছে, অপরাংশ শ্রুতি-পরম্পরাতে নামিয়া আসিতেছে। জগতের সমুদায় জ্ঞান-সম্পত্তি কোনও দিন সমগ্রভাবে লিপিবদ্ধ হইতে পারে নাই। এক সময়ে এরূপ সকল লোক ছিলেন, যাঁহারা ঐ জ্ঞান সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সেই সকল সাধনের উপায় ও প্রণালী অনুগত শিষ্যগণকে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা আবার তাহা তৎপরবর্ত্তীদিগকে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে লিপিবদ্ধ জ্ঞানের

সঙ্গে সঙ্গে এক গুরু-পরম্পরা জগতে রহিয়াছে, যাঁহাদের ভিতর দিয়া জগতের জ্ঞানধারা নামিয়া আসিতেছে। ইহাঁরা আবার মুখে মুখে এত জ্ঞানের তত্ত্ব রক্ষা করিয়াছেন যাহা এ লিপিবদ্ধ শাস্ত্রেও নাই। অনেক সময়ে দেখা যায় এই মৌখিক ও জীবনগত উপদেশ ব্যতীত শাস্ত্রের গূঢ় অর্থ ব্যক্ত হয় না। সকল বিদ্যা সম্বন্ধেই এই নিয়ম। পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে এক্ষণে অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিত হইতেছে, যাহাতে গবেষণা ও পরীক্ষার প্রণালী অতি বিশদরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, তাহা পাঠ করিলে একজন পদার্থ-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। তথাপি ঐ সকল গ্রন্থের পশ্চাতে এক শ্রেণীর জীবন্ত জ্ঞানানুরাগী মানুষ রহিয়াছেন, যাঁহারা একাগ্রচিত্তে ঐ সকল তত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন, এবং অনুগত শিষ্য-মণ্ডলীকে পরীক্ষার প্রণালী সকল উপদেশ করিতেছেন। এই জ্ঞানানুরাগী গুরুগণ না থাকিলে, পদার্থবিজ্ঞান জীবিত থাকিতে পারিত না।

অতএব আমরা সর্ব্ববিধ জ্ঞানের সম্বন্ধে এই দেখিতে পাইতেছি, যেন দুইটী প্রণালী দিয়া জগতের জ্ঞানধারা নামিয়া আসিতেছে, একটী লিপিবদ্ধ গ্রন্থের ভিতর দিয়া, অপরটী জ্ঞানানুরাগী মানুষের ভিতর দিয়া। এই সত্য আমরা যতই উজ্জ্বলরূপে অনুভব করিব, ততই ভগবান শঙ্করাচার্য্যের অব-লম্বিত অর্থের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব।

বাস্তবিক, ইহা অতীব সত্য কথা যেমন জলবায়ু তাপে বৃক্ষের বীজকে অঙ্কুরিত করে, তেমনি শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে অর্থাৎ

সাধুজনের উপদেশে, মানবের অন্তর্নিহিত ধর্ম্মবীজকে প্রস্ফুটিত করে। সেই উপদেশই প্রকৃত উপদেশ যাহা আমাকে প্রস্ফুটিত করে, আমার অন্তরে যাহা নিহিত ছিল, তাহাকে বাহিরে প্রকাশ করে, আমাকে আপনার নিকট অভিব্যক্ত করে। আমার ভিতরে যাহা মুদিয়া আছে, তাহা ফুটিয়া যখন আমার নিকট আগমন করে, তখনই আমি গ্রহণ করি, এবং তাহা আমার আত্মার সম্পত্তিরূপে পরিণত হয়।

কিন্তু এই আত্মসাৎ করণের পক্ষে আর একটী প্রক্রিয়ার প্রয়োজন—তাহা মনন। মনন শব্দের অর্থ নিজ অন্তরে তর্ক বা বিচার। সর্ব্ববিধ জ্ঞানের সম্বন্ধেই নিয়ম এই যে যাহা অপরের মুখে শ্রুত হওয়া যায়, তাহা নিজ অন্তরে নিজের জ্ঞানের সহিত মিলাইয়া লইতে হয়; সত্যের বাক্যকণিকা সকলকে বিচার চালুনীতে ছাঁকিয়া গ্রহণ করিতে হয়। এই মনন ক্রিয়ার দুইটী ফল, গ্রহণ ও বর্জ্জন। যেমন দেহের অন্ন-পান সম্বন্ধে দেখিতে পাই যে গ্রহণ ও বর্জ্জন প্রণালীদ্বারা তাহা আমাদের দেহের অঙ্গীভূত হয়, তেমনি পর-মুখ-লব্ধ জ্ঞান ও বিচার দ্বারা গৃহীত ও বর্জ্জিত হইয়া আমাদের আত্মার অঙ্গীভূত হয়। যাহার মনন শক্তি নাই, জ্ঞানের শ্রবণ তাহার পক্ষে ঘোর বিড়ম্বনা। অনেক ছাত্রের এ প্রকার দুর্দ্দশা দেখিতে পাই, তাহারা সর্ব্বশেষে যে গ্রন্থখানি পাঠ করে, সেই ভাবাপন্ন হয়। ইহার অর্থ, তাহাদের নিজের কিছু দিবার নাই, নিজেদের দাঁড়াইবার ভূমি নাই; বিচার শক্তি নাই, মননের সামর্থ্য নাই। আর বস্তুতঃ যাঁহারা শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন

তাঁহাদের উদ্দেশ্য এই যে তদ্দ্বারা মানুষের মননশক্তির বিকাশ হইবে। মানুষ বিচার পূর্ব্বক নিজ জ্ঞানের সহিত মিলাইয়া দেখিবে, সাধন দ্বারা উপদিষ্ট তত্ত্ব সকলকে পরীক্ষা করিবে। আমরা কেবল মাত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া পণ্ডিত মূর্খ হইয়া বসিয়া থাকিব, ইহা জানিলে তাঁহারা এত শাস্ত্র প্রণয়নের ক্লেশ স্বীকার করিতেন না। প্রায় প্রত্যেক সভ্য দেশেই মহানগরী মাত্রেরই বর্ণনা পুস্তক, (Guide Book) পাওয়া যায়। যাঁহারা অনেক ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক ঐ সকল গাইড-বুক প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি এই যে তুমি আমি কলিকাতা সহরে নিজ নিজ গৃহের কোণে বসিয়া সেই সকল গাইড-বুক মুখস্থ করিব? ঘরের কোণে বসিয়া আগরাতে তাজমহল আছে, দিল্লীতে জুম্মামসজিদ আছে, এই কথা কেবল বলিব? তাহা নহে। যাহারা পর্য্যটক তাহাদের জন্য যেমন গাইড বুক, যাঁহারা সাধক তাঁহাদের জন্যই শাস্ত্র অথবা গুরূপদেশ। সাধু সঙ্গের মহোপকার এই যে তদ্দ্বারা মানবের মনন শক্তির বিকাশ করে। যেখানে সাধুসঙ্গ মনন শক্তিকে না বাড়াইয়া মানুষকে বিচার বিমুখ করে, সেখানে মানবের অধোগতির দ্বার উন্মুক্ত হয়। সর্ব্ববিধ জ্ঞান বিষয়ে সেই সকল গুরুরই প্রশংসা শুনিতে পাই, যাঁহারা শিষ্যদিগকে মানুষ করিয়া দিয়া গিয়াছেন, অর্থাৎ স্বাধীনচেতা, বিচারশীল, সাধন-পরায়ণ ও সত্যানুরাগী করিয়া দিয়া গিয়াছেন। আর যেখানে সাধু সঙ্গের ফল এই দেখি যে বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ শিশুর ন্যায় অসহায় ও পরমুখাপেক্ষী হইতেছে, সেখানে বলিতে হইবে, শ্রবণ আছে, মনন

নাই, আহার আছে, হজম নাই, শোনা আছে, জানা নাই।

তৃতীয়তঃ শ্রবণ ও মননের পরে আর একটী আছে, তাহা নিদিধ্যাসন। নিদিধ্যাসন শব্দের অর্থ,—নিশ্চিতরূপে ধ্যান। যখন শ্রবণ ও মননের দ্বারা চিত্তের উদ্বোধ হয়, এবং পরমতত্ত্ব মানবের নিকট প্রকাশ পাইতে থাকে, তখন একান্তে ধ্যান-পরায়ণ হওয়া আবশ্যক। সকল বস্তুরই দুই ভাগ আছে, রূপ ও স্বরূপ। যাহা বাহিরে প্রতীয়মান হয় তাহা রূপ, যাহা অন্তরে নিহিত থাকে তাহা স্বরূপ। রূপকে চর্ম্মচক্ষে দেখি, স্বরূপকে জ্ঞানচক্ষে দেখিতে হয়। বাহিরে রূপে দেখিতেছ ইন্দ্রধনু, যেন কেহ গগনপথে নানা বর্ণের সংযোগে একটী সুন্দর ধনু চিত্রিত করিয়া দিয়াছে; কিন্তু এই রূপের পশ্চাতে তাহার স্বরূপকে অন্বেষণ করিতে গেলে, জ্ঞান ও বিচারকে আশ্রয় করিতে হয়, প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের তলে একটু নিমগ্ন হইতে হয়। এই জন্য স্বরূপ জ্ঞানের রাজ্য নির্জ্জনতার রাজ্য; সেখানে জ্ঞানের তত্ত্ব ও সাধক ভিন্ন আর কেহ থাকে না। এই জন্য ধ্যানের রাজ্য ও নির্জ্জনতার রাজ্য। ধ্যানস্থ না হইলে ব্রহ্মস্বরূপ আমাদিগের নিকট প্রকৃতরূপে ব্যক্ত হয় না। যেমন দশজন গায়কে একত্র হইয়া যেখানে সঙ্গীত করিতেছে, সেখানে উপরে উপরে সাধারণভাবে একটা স্বরতরঙ্গ আমাদের শ্রুতি-গোচর হইয়া থাকে, যদি সেই স্বরতরঙ্গের মধ্যে কোনও বিশেষ গায়কের স্বর লক্ষ্য করিতে হয়, তাহা হইলে সেই তরঙ্গীভূত স্বরলহরীকে ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হইয়া নিবিষ্ট চিত্তে সেই

স্বরবিশেষের দিকে প্রণিধান করিতে হয়, তেমনি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ব্রহ্ম-সত্তার ও ব্রহ্মশক্তির যে খেলা দেখিতেছ, ইহার মধ্যে তাঁহার কোনও স্বরূপ বিশেষকে যদি লক্ষ্য করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে ক্ষণকালের জন্য ঐ ব্রহ্মাণ্ডের খেলাকে ভুলিয়া ধ্যানযোগে সেই স্বরূপ-বিশেষে প্রণিধান করিতে হয়। শ্রবণের দ্বারা জ্ঞানের অঙ্কুর, মননের দ্বারা জ্ঞানের বিকাশ, নিদিধ্যাসনের দ্বারা জ্ঞানের পূর্ণতা। ধ্যানের দ্বারা নিত্যানিত্য বোধ উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়, এবং ব্রহ্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার হয়। সত্যের সাক্ষাৎকার ব্যতীত জ্ঞান সুদৃঢ় ভূমির উপরে স্থাপিত হয় না, নিদিধ্যাসন ভিন্ন সত্যের সাক্ষাৎকার হয় না। অতএব শ্রবণ ও মননের পরেই নিদিধ্যাসন। এই ত্রিবিধ সাধন একত্রীভূত হইলে, পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয়।

দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ।

উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া যত কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে একটী এই ;—

"দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ।"

"তিনি দূর হইতে দূরে আবার নিকট হইতে নিকটে।" একদিকে দেখিতে গেলে জগতে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি হওয়াতে মানবের ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে একটা সুমহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ; ঈশ্বর যেন পূর্ব্বাপেক্ষা মানব-হৃদয় হইতে কিঞ্চিৎ দূরে পড়িয়াছেন। সে কালের প্রেমিক সাধকগণ ঈশ্বরকে অতিশয় নিকটে দেখিতেন। লোকে যেমন পিতামাতাকে বা অপর কোনও নিকটস্থ আত্মীয়কে সম্বোধন করে, তাঁহারা সেইরূপ ঈশ্বরকে সম্বোধন করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ সাধক রামপ্রসাদ সেনের একটী সঙ্গীত আছে ;—

"তারার এমনি বিচার বটে !

যে দিবানিশি দুর্গা বলে, তার কপালে বিপদ ঘটে।"

কেমন হৃদয়-মুগ্ধকারী ঘনিষ্ঠতা ! কেমন সন্তানের ন্যায় অকপটচিত্তে আবদার !

ইংলণ্ডের একজন বিশ্বাসী রাজার নামে একটী প্রার্থনা প্রচলিত আছে, তাহার মর্ম্ম এই ;—"ধিক্ থাক তোমাকে হে পরমেশ্বর ! আমাকে এরূপ অসহায় অবস্থাতে রাখিতে তোমার লজ্জা হয় না ? তুমি তোমার পুরাতন ভৃত্যকে যেরূপে ত্যাগ

করিলে, আমি আমার ভৃত্যের প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতে পারি না। এখনও দাসের সাহায্যের জন্য ত্বরায় এস।”

ইংলণ্ডের নাস্তিকগণ এই প্রার্থনা লইয়া অনেক উপহাস বিদ্রুপ করিয়াছেন; কিন্তু আমার বোধ হয়, ইহার মধ্যে যে প্রেম ও যে নৈকট্য-বোধ নিহিত আছে, তাহা অতীব মনোহর!

বৃদ্ধ য়িহুদী নৃপতি দায়ুদ রাজা প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

“হে প্রভো! তুমি চিরদিন যে সকল করুণা করিতেছ, তাহা স্মরণ কর। আমার যৌবনের পাপ সকল মনে রাখিও না; তোমার নামের খাতিরে আমার পাপের প্রতি সদয় হও; কারণ আমার পাপ অতি মহৎ। তুমি আমার দিকে ফের; এবং আমাকে দয়া কর; দেখ আমি একাকী অসহায় অবস্থাতে পড়িয়াছি ও যাতনা পাইতেছি!”

এইরূপে বেদেও ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতির উদ্দেশে কত প্রার্থনা আছে, যাহার অকপটভাব ও আত্মীয়তা-জ্ঞান দেখিলে হৃদয় মুগ্ধ হয়! ঋগ্‌বেদে মহারাজা বরুণের উদ্দেশে যে সকল স্তুতি আছে তন্মধ্যে একস্থলে নিম্নলিখিত প্রার্থনাটী দৃষ্ট হয়;—“হে বরুণ! আমি কোন্ পাপে তোমার নিকট অপরাধী, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি! আমি জ্ঞানী ও প্রবীণদিগের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাঁহারা সকলেই এক কথা বলেন, সকলেই বলেন, “বরুণ তোমার প্রতি কুপিত হইয়াছেন।”

হে বরুণ! ইহা কি কোনও পুরাতন পাপ, যাহার জন্য তুমি তোমার নিরন্তর-স্তুতিবাদক বন্ধুকে বিনষ্ট করিতে

চাহিতেছ ? হে প্রভো ! আমাকে বল, আমি ত্বরায় স্তুতিবাদ সহকারে পাপ-নির্ম্মুক্ত হইয়া তোমার দিকে ফিরিব।

হে বরুণ ! সে পাপ আমি প্রকৃতিস্থ অবস্থাতে করি নাই ; দায়ে পড়িয়া করিয়াছি, পানীয়ের মাদকতা-শক্তি বশতঃ করিয়াছি ; চিন্তা-বিহীনতাবশতঃ করিয়াছি।"

অনেকে দুঃখ করিয়া থাকেন যে, বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই মনোমুগ্ধকারী নৈকট্য-বোধ অন্তর্হিত হইতেছে। ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে আমরা এক দুর্ভেদ্য কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলকে সৃষ্টি-প্রপঞ্চের নিয়ামকরূপে দেখিতে পাইতেছি। পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর আমরা কোনও প্রকার ভৌতিক সুখদুঃখের জন্য প্রার্থনা করিতে পারি না ; কারণ আমাদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে, যে ভৌতিক জগৎ কার্য্য-কারণের নিয়মাধীন ; সেখানে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই, ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা নিবন্ধন তাঁহার কার্য্য-প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিবেন না। নব-জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ বলিবেন, দেশে অনাবৃষ্টি হইয়াছে, সে জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া কি হইবে ? তদপেক্ষা বৃষ্টিলাভের বৈজ্ঞানিক উপায় যদি কিছু থাকে, তাহার আবিষ্কারের চেষ্টা কর।

ভৌতিক জগতে কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল আসিয়া যেমন ঈশ্বরকে দূরে ফেলিয়াছে, তেমনি অধ্যাত্ম-জগতেও এই কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলের প্রভাব দৃষ্ট হইতেছে। আমাদের দেশে মহাত্মা বুদ্ধ ও তাঁহার শিষ্যগণ এবং জৈন সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিগণ আধ্যাত্মিক বিষয়েও এই কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলের ভাব প্রবলরূপে

অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন ভৌতিক জগতে ঈশ্বর যেমন কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলকে ভগ্ন করিয়া কার্য্য করেন না, অধ্যাত্ম-জগতেও তেমনি কর্ম্মের নিয়মকে লঙ্ঘন করিয়া কার্য্য করেন না। কর্ম্মজনিত ফল অবশ্যম্ভাবী; ঈশ্বর তাহার অন্যথা করিতে পারেন না। অতএব সে ফল হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া বৃথা। তাঁহাদের এই ভাব একজন সংস্কৃত কবি একটী কবিতাতে নিম্নলিখিত প্রকারে প্রকাশ করিয়াছেন। কবি বলিলেন ঃ—

"নমস্যামো দেবান্"— দেবতাদিগকে প্রণাম করিব।" ইহা বলিয়াই চিন্তার উদয় হইল ;—

— নন্বু হতবিধে স্তেপি বশগাঃ"—"দেবতাদিগকে প্রণাম করিয়া ফল কি, তাহারা পোড়া বিধির বশবর্ত্তী"। অতএব স্থির হইল ঃ—

— বিধি র্বন্দ্যঃ"—"বিধিকেই প্রণাম করিতে হইবে।" তাহাতেও সন্দেহ আসিল ;—

—"সোপি প্রতিনিয়ত কর্ম্মৈকফলদঃ"—"বিধাতাও ত কর্ম্মফল দিতে বাধ্য, তাহাকে ত তিনি অতিক্রম করিতে পারেন না।" অতএব স্থির হইল,— নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি নযেভ্যঃ প্রভবতি।"—অতএব কর্ম্মকেই প্রণাম, যাহার উপরে বিধিরও হাত নাই"।

এইরূপে ঈশ্বরের উপরে কর্ম্মফলকে শ্রেষ্ঠতা দেওয়াতেই বোধ হয় বৌদ্ধাদি মতাবলম্বিগণ নাস্তিক নামে উক্ত হইয়াছেন।

যাহা হউক যাঁহারা কর্ম্মফলের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া

থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে ঈশ্বরকে অজ্ঞেয় ও অনাবশ্যক বোধে দূরে পরিহার করা স্বাভাবিক কার্য্য।

এইরূপে বিজ্ঞান ও দর্শনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে একদিকে ঈশ্বর যেন মানবাত্মা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া পড়িয়াছেন। অথচ প্রেম ও ভক্তির স্বভাব এই যে ইহা নৈকট্য চায়। ভক্তি সর্ব্বদাই বলিতেছে ;—

'দূরে থেকনা নাথ! সম্পদকালে, ঘোর বিপাকে,
পাপ বিকারে, চিরদিন আমি তোমারি!"

এই যে ভক্তির স্বভাব নৈকট্যস্পৃহা, ইহা হইতেই বোধ হয়, প্রায় সমুদায় ভক্তি-প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে অবতারবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। জ্ঞান ঈশ্বরকে ইন্দ্রিয়াতীত অনন্ত সত্তারূপে প্রতিপন্ন করে। আমরা যখন তাঁহার অনন্তস্বরূপ ধ্যান করি, তখন দেখি তিনি যেন আমাদের আত্মা হইতে বহু লক্ষ যোজন দূরে রহিয়াছেন। তাঁহার মহৎস্বরূপের সন্নিধানে আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়া যাই। তাঁহাকে নিকটস্থ বলিয়া অনুভব করা দূরে থাকুক, তাঁহার বিষয়ে চিন্তা করিতেও চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। ভক্তি কিন্তু এ দূরত্ব সহ্য করিতে পারে না। এই কারণেই উপনিষদে ঋষিগণ জ্ঞান ও ধ্যানযোগে ঈশ্বরের অনন্ততা প্রতিপন্ন করিলে, তাহার প্রতিঘাতে যখন ভক্তিমার্গের আবিষ্কার হইল, তখন অবতারবাদ-পূর্ণ বৈষ্ণব পুরাণ সকল রচিত হইতে লাগিল। অবতারবাদ এই কারণেই ভক্তহৃদয়ের পক্ষে এত স্পৃহণীয়, যে, ইহাতে উপাস্য দেবতাকে ভক্তের নিকটে আনিয়া দেয়। ভক্ত বৎসল ভক্তের সঙ্গে লীলা

করিবার জন্য মানবীয় রূপ ধারণ করিয়া তাহার নিকটে আসিলেন। যেমন প্রেমিক পিতা রাজ্যেশ্বর হইয়া ও ক্ষুদ্র শিশুর সহিত খেলিবার জন্য ক্ষণকালের নিমিত্ত শিশুভাব অবলম্বন করেন, তেমনি ভক্ত-বৎসল ভগবান ভক্তসঙ্গে বিহার করিবার নিমিত্ত ক্ষণকালের জন্য মানবীয় ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। অবতারবাদের গূঢ় তাৎপর্য্য এই।

সুখের বিষয় এই, বর্ত্তমান সময়ের উন্নত জ্ঞান যেমন একদিকে ঈশ্বরকে যেন কিঞ্চিৎ দূরে ফেলিয়াছে, অপর দিকে অতি অদ্ভূতভাবে তাঁহার নৈকট্য প্রতিপন্ন করিয়াছে। প্রাচীনকালে লোকের সংস্কার ছিল নারায়ণ বৈকুণ্ঠে বাস করেন। যিহুদী খ্রীষ্টীয় ও মুসলমান ধর্ম্মে এই ভাব অত্যন্ত প্রবল। ঈশ্বর স্বর্গে আছেন, সেখান হইতে যেন জগৎ কার্য্য-পর্য্যালোচনা করিতেছেন। ঈশ্বর স্বর্গে আছেন, যীশু সেখান হইতে আসিয়াছিলেন, আবার মৃত্যুর পর সশরীরে সেখানে গেলেন। মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন, মহম্মদ এক বিশেষ দিনে দেবদূত জেব্রিলের সমভিব্যাহারে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য স্বর্গে গিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ের উন্নত জ্ঞান সৃষ্টির বহিঃস্থিত উন্নতলোকবাসী এই ঈশ্বরের ভাবকে বিনষ্ট করিয়া তৎপরিবর্ত্তে জড়ে ও চেতনে যিনি ওতপ্রোতভাবে সন্নিহিত আছেন, তাঁহার ভাব আমাদিগের হৃদয়ে আনিয়া দিতেছে। বিজ্ঞান বলিতেছে, যে শক্তি ও যে জ্ঞান সুদূরবর্ত্তী জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতিবিধির মধ্যে, সেই শক্তি ও সেই জ্ঞান তোমার পদতলবর্ত্তী রেণুকণাতে। বিজ্ঞান জগতের আদিকারণ-

রূপে যে শক্তিকে ধারণা করিতেছে, সেই শক্তি সম্বন্ধে ইহাও অনুভব করিতেছে, যে তাহা অনাদি অনন্ত ও অক্ষয়। পশ্চাতে চাহিলে তাহার আদি কল্পনাতে আসে না; সম্মুখে চাহিলে তাহার অন্ত ধারণা হয় না; এবং সেই শক্তির এক কণিকার হ্রাস বা বৃদ্ধি নাই। আস্তিক ভক্তগণ এই অনাদি, অনন্ত ও অক্ষয় শক্তিকেই ভগবদিচ্ছা বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন। ইহাকে ভগবদিচ্ছারূপে প্রতীতি করিলেও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয়, যে ইহা দেশের প্রত্যেক অণু ও কালের প্রত্যেক মূহূর্ত্তকে পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে। "দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াং—তিনি দূর হইতে দূরে এবং নিকট হইতেও নিকটে, এবং এই ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে হৃদয়-গুহাতেই নিহিত হইয়া রহিয়াছেন।"

উন্নত জ্ঞান তাঁহার যে নৈকট্য প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছে, প্রেমের দ্বারা সেই নৈকট্যকে ধারণ করিতে হইবে। জ্ঞান ধর্ম্মজীবনের অস্থি-সংস্থান করে, প্রেম তাহাতে রক্ত মাংস যোজনা করিয়া থাকে। তাঁহার এই সান্নিধ্য আমাদের আন্তর প্রত্যক্ষের গোচর করিতে হইবে।

তাঁহাকে পরম সত্তা ও নিকটস্থ রূপে জানিলে প্রেম তাঁহাকে স্বভাবতঃ আলিঙ্গন করিবে। প্রেমের সঙ্গে সঙ্গেই নির্ভর; নির্ভরের সঙ্গে সঙ্গেই প্রার্থনা। এরূপ অবস্থাতে প্রার্থনা স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য ভাবে উদিত হইয়া থাকে। মনে কর একজন গৃহস্থের পুত্র বিপথগামী হইয়াছে। সে যখন বিপথে পদার্পণ করে, তখন তাহার পিতা তাহাকে বারবার সতর্ক

করিয়াছিলেন, তাহার বিপদ তাহাকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন, এবং কুসঙ্গিদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। দুর্ব্বৃত্ত সন্তান যৌবন-মদে মত্তপ্রায় হইয়া তখন পিতার সেই হিত-বাক্যের প্রতি কর্ণপাত করে নাই; যথেচ্ছ আচরণে ও নানা প্রকার পাপানুষ্ঠানে নিযুক্ত হইয়াছিল। ক্রমে নানা প্রকার বিপদে পড়িয়া যখন তাহার চৈতন্যের উদয় হইল, তখন সে আবার সুপথে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য প্রয়াসী হইল। এই সংগ্রাম যখন তাহার হৃদয়ে জাগিল, তখন সে ভাবিতে লাগিল, যে এত দিনের পর তাহার পিতার মনোরথ পূর্ণ হইল; তাঁহার উপদেশ বাক্য সার্থক হইল; এখন তাহার পূর্ব্বাপরাধ বিস্মৃত হইয়া পিতা তাহাকে পুনরায় স্নেহালিঙ্গন দিবেন। যিনি সৎপথে রাখিবার জন্য এত প্রয়াস পাইয়াছেন, তিনি এক্ষণে তাহাকে সৎপথে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সহায়তা করিবেন। এরূপ আশা করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক কি না? সেইরূপ মানব যখন ধর্ম্মজীবনের সংগ্রাম মধ্যে পতিত হয়, তখন আশা ও নির্ভর-পূর্ণ দৃষ্টি ঈশ্বরের কৃপার উপরে স্থাপন করাও স্বাভাবিক। আমরা যখন পাপ-পথে পদার্পণ করি তখন ঈশ্বর হৃদয়ে থাকিয়া আমাদিগকে এইরূপে সতর্ক করেন; এবং আমরা যখন পাপ-পথ পরিহার করিয়া আবার পুণ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা করি, তখন এইরূপে তিনি আমাদিগের সহায়তা করিয়া থাকেন। এই যে ধর্ম্মজীবনের সংগ্রামের মধ্যে তাঁহার দিকে নির্ভর-পূর্ণ ভাবে উন্মুখ হওয়া ইহাই প্রকৃত প্রার্থনা।

প্রকৃত প্রার্থনার অবশ্যম্ভাবী চিরসহচর সংগ্রাম। যাহার

অন্তরে সংগ্রাম নাই, তাহার প্রার্থনাও নাই; অর্থাৎ যে আত্মোন্নতি-সাধনের জন্য সতত সচেষ্ট নহে, তজ্জন্য বিবিধ প্রকার উপায় অবলম্বন করিতেছে না, সে প্রার্থনার অধিকারীও নহে। প্রার্থনা অলসের জন্য নহে। যে নিজের সংগ্রামের ভার ঈশ্বরের উপর ন্যস্ত করিতে চায়, তাহার প্রার্থনা পূর্ণ হয় না। বৃদ্ধ দায়ুদ রাজা প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"হে প্রভো! আমি যখন তোমার পথে চলি, তখন আমাকে ধরিয়া রাখ, যেন আমার পদস্খলন না হয়।" যে ব্যক্তি চলিতেছে অন্ততঃ চলিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছে তাহার এ প্রকার প্রার্থনা করিবার অধিকার আছে। যে চলে না, যতটুকু সাধ্য আছে, তদ্দ্বারা চলিতে চেষ্টাও করে না, কিন্তু এই বলিয়া বসিয়া থাকে যে স্বর্গ হইতে রথ আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবে, তাহার জন্য রথ আসে না। প্রার্থনার অপরিহার্য্য সহচর সংগ্রামে ইহা বিস্মৃত হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

এই ভাবে যে প্রার্থনা করে সে সাহার্য্য পায়। কিন্তু বর্ত্তমান জ্ঞানালোক-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ হয়ত প্রশ্ন করিবেন, মানবের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক ভাব ও প্রত্যেক কার্য্যও ত কার্য্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ; তবে কি ঈশ্বর সেই শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া মানবের প্রার্থনা পূর্ণ করেন। ইহার উত্তরে এই মাত্র বলা যায়, যে মানবের ইচ্ছার দ্বারা ঈশ্বরেচ্ছার ব্যাঘাত হয় না, কিন্তু তাঁহারাই প্রতিষ্ঠিত এক নিয়মের দ্বারা অপর নিয়মের ব্যাঘাত প্রকার নিরন্তরই ঘটিতেছে। চিকিৎসা ও আরোগ্য লাভ স্থলে আমরা প্রতিদিন তাহা লক্ষ্য করিতেছি। দেহ-মধ্যে

কোনও বিষাক্ত পদার্থ প্রবিষ্ট হইয়াছে, যাহা অন্তরস্থ ধাতু সকলকে বিনষ্ট করিতেছে, সেজন্য রোগের উৎপত্তি। যদি তাহার প্রতিবন্ধক কোন প্রকার উপায় অবলম্বিত না হয়, তাহা হইলে সেই বিষ স্বাভাবিক নিয়মে নিজ কার্য্য করিয়া যাইবে; ক্রমে অন্তরস্থ ধাতু সকলকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে। এই বিনাশ স্বাভাবিক নিয়মে ঘটিবে, কার্য্যকারণ শৃঙ্খলের গুণেই ঘটিবে। কিন্তু চিকিৎসক এমন একটী ঔষধ প্রয়োগ করিলেন, যাহা দেহ মধ্যে আর একটী নূতন শক্তি প্রবিষ্ট করিল। তাহার কার্য্য ও কার্য্যকারণ শৃঙ্খলের অনুসারেই হইতে লাগিল; ফল হইল রোগ-মুক্তি। সেইরূপ প্রার্থনারও একটী স্বতন্ত্র নিয়ম আছে; তাহার কার্য্য ও কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলের অনুসারেই ঘটিয়া থাকে; তাহাকে অতিক্রম করিয়া কিছু হয় না; ঈশ্বর মানব-ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া কিছু করেন না, বরং মানব তাঁহার ইচ্ছার বশবর্ত্তী হয় বলিয়াই কার্য্য হয়। চিকিৎসকের ঔষধ যেমন দেহ মধ্যে এক নবশক্তিকে প্রবিষ্ট করে, যাহা রোগীকে চরমে রোগমুক্ত করে, তেমনি প্রার্থনাও মানবের আত্ম-মধ্যে এক নবশক্তিকে প্রবিষ্ট করে, যাহা তাহাকে পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত করে। প্রার্থনার এই অদ্ভুত নিয়ম কি প্রণালীতে কার্য্য করে, তাহা সম্পূর্ণ লক্ষ্য করিতে পারা যায় নাই। প্রেমিক সাধকগণ তাঁহাদের অভিজ্ঞতা দ্বারা এই মাত্র দেখিয়াছেন, যে গভীর সংগ্রামের মধ্যে পড়িয়া সকাতরে ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনা করিলে তাহা পূর্ণ হয়, এইমাত্র। এই কারণেই তাঁহারা বলিয়াছেন, যে চায় সেই পায়।

"অস্তীতি ব্রুবতোন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে"

উপনিষদের একটী বচনে আছে :—

"অস্তীতি ব্রুবতোন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ?"

অর্থ—"যে ব্যক্তি বলে তিনি আছেন, সেরূপ ব্যক্তি ভিন্ন অপরের দ্বারা তিনি কি প্রকারে উপলব্ধ হইবেন ?"

যে সুকোমল কুসুম স্বর্গের শিশির দ্বারা প্রতিপালিত হয়, এবং সুন্দর সমীরণের করস্পর্শেই আপনার গন্ধ ভার প্রদান করিয়া থাকে, সে যেমন মানবের কঠিন অঙ্গুলির সংস্পর্শ পাইলেই ম্লান হইয়া যায়, তেমনি অনেক সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ভাব আছে যাহা সংশয়ের স্পর্শও সহ্য করিতে পারে না। তুমি যদি বল আছে. তাহা হইলে তাহা বাস্তবিক তোমার পক্ষে আছে, আর যদি বলিলে "নাই" তবে তাহা তোমার পক্ষে নাই। প্রাচীন গ্রীসদেশীয় পুরাণে এই মহা সত্যের পরিপোষক একটী সুন্দর আখ্যায়িকা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গ্রীক কবিগণ মানবাত্মাকে একটি পরম রূপবতী রমণী বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। তাহার নাম Psyche সাইকী। Eros ঈরস বা প্রেম সাইকীর প্রণয়ে আসক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি রাত্রির অন্ধকারে ভিন্ন সাইকীর নিকটে আসিতেন না ; এবং আপনার নাম ধাম বলিতেন না। সাইকী কেবল প্রেমের মধুর বাণী শুনিতেন, তাঁহার মুখ কখনও দেখিতে পাইতেন না। ঈরস সাইকীকে বলিয়াছিলেন যে—"তুমি আমার মুখ দেখিতে পাইবে না, যদি কখনও আমার মুখ

দেখিবার প্রয়াস পাও, তাহা হইলে তোমার সহিত আমার চিরবিচ্ছেদ ঘটিবে। সাইকী সেই ভয়ে আর ঈরসের মুখ দেখিবার ইচ্ছা করিতেন না। তাঁহার মধুর বাণী শুনিয়াই তাঁহার প্রতি প্রীতি স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু এজন্য সাইকীর ভগিনীগণ সর্ব্বদাই তাঁহাকে উপহাস ও বিদ্রুপ করিত। তাহারা বলিত—"তুই না জানিয়া কাহার হস্তে প্রাণ দিলি? সে দেব, কি মানব, কুরূপ কি সুরূপ, সৎ কি অসৎ তাহার কিছুই জানিলি না, অথচ তাহার সহিত প্রণয়ে আবদ্ধ হইলি। তুই অতি নির্ব্বোধ, তুই নিশ্চয় প্রতারিত হইয়াছিস।" সাইকী অনেক দিন এই উপহাস ও বিদ্রুপের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু অবশেষে এক দিন ভাবিতে লাগিলেন—"তাইত এ দেব কে? কিরূপ আকৃতি, কিরূপ প্রকৃতি, তাহা একবার দেখিলাম না; একবার দেখাতে হানি কি?" এইরূপ ভাবিয়া অবশেষে স্থির করিলেন যে, সেই দিন ঈরস ঘুমাইলে প্রদীপ জালিয়া তাঁহার মুখ দেখিবেন। তদনুসারে রাত্রি-শেষে উঠিয়া সাইকী বাতি জ্বালিয়া দেখেন যে মোহন-মূর্ত্তি প্রেম অকাতরে ঘুমাইতে-ছেন। এমন রূপ সাইকী কখনও চক্ষে দেখেন নাই। দেখিয়াই সাইকীর মন প্রাণ মুগ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই প্রদীপ্ত বাতি গলিয়া মুখে পড়িয়া ঈরসের নিদ্রাভঙ্গ হইল। ঈরস দেখিলেন সাইকী মন্ত্র-মুগ্ধার ন্যায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। ঈরস বলিলেন—'সাইকি! সাইকি! এ কি করিলে! কেন চিরবিচ্ছেদ ঘটাইলে? তবে বিদায়! বিদায়! এই জন্মের মত বিদায়, আর আমাকে দেখিতে পাইবে

না; প্রেম সংশয়ের অঙ্গুলি স্পর্শও সহিতে পারে না। আমি চলিলাম। এই বলিয়া ঈরস অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। সেই শোকে সাইকী ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া ঈরসের অন্বেষণে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এই আখ্যায়িকাটী যে কবি রচনা করিয়াছিলেন, তিনি যে মানব হৃদয়ের গভীর তত্ত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রেমের স্বভাবই এই যে ইহাকে পরীক্ষা করিলে, সন্দেহ করিলে, আর ইহা থাকে না। দেখি, দেখি প্রেম কিরূপ, ইহা যদি একবার বলিলে, তবেই প্রেম অন্তর্হিত হইল। ঈরস অন্ধকার ভিন্ন আলোকে কখনও সাইকীর নিকট আসিতেন না। ইহার তাৎপর্য্য এই, প্রেম অদৃশ্য রাজ্যে বাস করে। চক্ষে যতদূর দেখা যায়, প্রেম প্রেমাস্পদের চরিত্রে, তদপেক্ষা আরও অনেক সৌন্দর্য্য ও সাধুতা দেখিয়া থাকে; প্রেম বিনাপ্রমাণে বিশ্বাস স্থাপন করে। এই জন্যই উক্ত হইয়াছে প্রেম রাত্রির অন্ধকারে আসে এবং আত্মপরিচয় দানে বিমুখ। একবার সংশয়ের ধ্বনি উত্থিত কর, অমনি প্রেম আর থাকিবে না। একবার বল—"কই প্রেম?" অমনি ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিধ্বনি শুনিবে—"নাই প্রেম।" প্রেমের অস্তিত্বে সন্দেহ করিও না, প্রেমকে পরীক্ষা করিতে চাহিও না, ভোগ করিয়া যাও প্রচুর প্রেম পাইবে। পরীক্ষা করিতে যাও, যাহা ভোগ করিতেছ তাহাও হারাইবে। প্রেম দেখিতে ও প্রেমের শক্তি অনুভব করিতে হইলে, প্রেমকে—"অস্তি",—আছে বলিতে হয়। আমরা সংসারে প্রতিদিন ইহার ভূরি ভূরি

দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিতেছি। এক জনের প্রতি অপর একজনের প্রেম চিরদিন বিদ্যমান আছে, অথচ সে তাহা দেখিতে পায় না। তাহার নিজের হৃদয় প্রেম বিহীন বলিয়া তাহার প্রেম দেখিবার চক্ষু নাই। সে চক্ষু থাকিতে অন্ধ হইয়া রহিয়াছে সে যদি বলিত,—ওই আমার আমার জন্য প্রেম রহিয়াছে; তাহা হইলে সে প্রেমের পক্তি অনুভব করিতে পারিত। এখন দেখিতেছ না, কিন্তু যে দিন বলিবে—ওই যে আমার প্রেম অপেক্ষা করিতেছে; সেই দিন দেখিবে ও তাহার শক্তি বুঝিবে। Moncure D, Conway তাঁহার সংকলিত Sacred Anthology" নামক গ্রন্থে চীনদেশীয় একটী সুন্দর আখ্যায়িকা উদ্ধৃত করিয়াছেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সে আখ্যায়িকাটী এই ঃ—

এক ধনী গৃহস্থের একমাত্র পুত্র ছিল। পিতা মাতা শৈশব হইতে অতিশয় আদর দিতেন। সে যখন যে বাসনা করিত তাহা পূর্ণ করিতে কালবিলম্ব করিতেন না। এইরূপে সে বালক অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল। এ জগতে যে নিজ ইচ্ছাকে সংযত করিয়া চলিতে হয়, এ শিক্ষা আর তাহার হইল না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে যথেচ্ছচারী হইয়া পড়িল। কুসঙ্গি-দিগের প্ররোচনায় সর্ব্বদাই বিবিধ দুষ্ক্রিয়াতে লিপ্ত হইত। জনক জননী যে কি প্রকার ভগ্ন-হৃদয় হইয়া রহিয়াছেন তাহা একবার চিন্তা ও করিত না। এইরূপে কিছুকাল যায়, অবশেষে সেই দুর্ব্বৃত্ত যুবকের দৌরাত্ম্য এতই বর্দ্ধিত হইল যে, জ্ঞাতি কুটুম্ব প্রতিবেশী সকলে উত্যক্ত হইয়া উঠিল। একদিন সকলে

সম্মিলিত হইয়া বৃদ্ধ বৃদ্ধার নিকটে আসিয়া বলিল—"তোমরা যদি এমন সন্তানকে বর্জ্জন না কর, তাহা হইলে আমরা তোমা-দিগকে বর্জ্জন করিব।" অগত্যা পিতা মাতা দুরাচার সন্তানকে বর্জ্জন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। একটা দিন স্থির হইল। নির্দ্ধারিত দিনে নগরবাসী সকলে দলে দলে সভাস্থলে সম্মিলিত হইতে লাগিল। নগরে জনরব অমুক ধনী আজ স্বীয় একমাত্র পুত্রকে জন্মের মত বর্জ্জন করিবেন। কিন্তু যাহার বর্জ্জনক্রিয়ার জন্য এত সমারোহ পূর্ব্বক আয়োজন, তাহার গ্রাহ্য নাই। সে সঙ্গিগণের সমভিব্যাহারে আমোদ প্রমোদ করিয়া বেড়াইতেছে, সেও আজ কৌতুক দেখিবার জন্য বয়স্যগণের সঙ্গে সভাস্থলে উপস্থিত। সে এই বলিয়া বন্ধুদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছে—"চল্‌রে ভাই দেখি গিয়ে আমার বর্জ্জনব্যাপারটা কিরূপ হয়।" এই বলিয়া অলক্ষিত ভাবে আসিয়া পশ্চাতে বসিয়া সমুদায় কথা বার্ত্তা শুনিতে লাগিল। কিন্তু আজ সভাস্থলে আসিয়া তাহার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ জনক জননীর গভীর মনো-বেদনাব্যঞ্জক ভাব দেখিয়া তাহারও অন্তর বিগলিত হইয়া গেল এদিকে সুগভীর ভাষাতে লিখিত বর্জ্জনপত্র পঠিত হইতে লাগিল। পাঠান্তে স্বাক্ষর করিবার জন্য বৃদ্ধ বৃদ্ধার হস্তে অর্পিত হইল। কি হয়, কি হয় সকলে উৎসুক অন্তরে অপেক্ষা করিতেছে। এই সেই সন্ধিক্ষণ যাহার পরে ঐ যুবক জন্মের মত পিতা মাতার গৃহ, সম্পত্তি ও স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইবে। ভগ্ন-প্রাণা জননী কিয়ৎকাল সেই বর্জ্জন-পত্র হস্তে লইয়া কাঁদিতে লাগি-লেন। অবশেষে তাহা ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন—"আপনারা

আমাকে মাপ করুন, আবশ্যক হয় আমাকে জন্মের মত বর্জ্জন করুন, আমি যাহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছি, স্তনদুগ্ধ দ্বারা পালন করিয়াছি, তাহার সংশোধনের আশাতে নিরাশ হইয়া তাহাকে জন্মের মত বর্জ্জন করিতে পারিব না।” সকল লোকে তাঁহার ভাব দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। ইতিমধ্যে কে একজন সকলের পশ্চাত হইতে দ্রুতবেগে সকলকে ঠেলিয়া আসিয়া সেই রোদন-পরায়ণা নারীর চরণে পড়িয়া গেল; এবং উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিতে লাগিল;—“ওগো মা এই অধম পুত্রের প্রতি আর দয়া করো না, তোমার দয়া ও স্নেহের যথেষ্ট হয়েছে! কর কর সর্ব্বসমক্ষে আমাকে বর্জ্জন কর! আমি তোমার স্নেহের উপযুক্ত নই।” রোদন-পরায়ণা জননী সেই চরণে পতিত সন্তানকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন, মাতা ও পুত্র পরস্পরের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহাদের চক্ষের জলে সে বর্জ্জনপত্র যেন কোথায় ভাসিয়া গেল। এই দৃশ্য দেখিয়া সভাস্থ সকলে আনন্দ ও বিস্ময়ে একেবারে মগ্ন হইল! এখন প্রশ্ন এই, তাহার জননী কি সেই দিন প্রথমে তাহার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিলেন? মাতার সে প্রেম কি চিরদিন তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল না? তবে সে প্রেমের শক্তি সে এতদিন অনুভব করে নাই কেন? আজ যেমন সে মাতার প্রেমের দ্বারা পরাজিত হইল, ইতিপূর্ব্বে কেন সে প্রকার হয় নাই? উত্তর—নিজে প্রেমহীন হইয়া সে এতদিন সে প্রেম দেখে নাই বলিয়া। প্রেম আছে, একথা যদি সে বলিত, তাহা হইলে প্রেমের শক্তি ও অনুভব করিতে পারিত।

প্রেম সম্বন্ধে যেরূপ সুখ সম্বন্ধেও সেইরূপ। জগতে যথেষ্ট সুখ তোমার জন্য আছে; কিন্তু সে সম্বন্ধে দুটী নিয়ম আছে; প্রথম, সুখ চাহিবে না; বালক বালিকারা যেরূপ জোনাকি ধরিতে বাহির হয় সেরূপ সুখ ধরিতে বাহির হইবে না; দ্বিতীয় নিয়ম, দেখি সুখ কিরূপ বলিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া সুখের মুখ দেখিবে না। যদি এ জগতে সুখকে একটা বড় জিনিস মনে কর, নিজ কর্ত্তব্যসাধন অপেক্ষা সুখকে অধিক প্রিয় জ্ঞান কর, তাহা হইলে সুখ তোমার হইবে না। তুমি ধরিবার জন্য যতই ছুটিবে, সুখ ততই তোমার হাতছাড়াইয়া পলাইবে। সুখ-নিরপেক্ষ হইয়া নিজ কর্ত্তব্য সাধিয়া যাও, সুখ আপনাপনি তোমার হৃদয়ে আসিবে। দ্বিতীয়তঃ কখনও প্রদীপ জ্বালিয়া সুখের মুখ দেখিতে চাহিও না। সুখের মুখ দেখিতে চাহিলে, সুখী কিনা এই সন্দেহ করিলে, সুখ অন্তর্হিত হয়।

ঋষিরা বলিয়াছেন, ঈশ্বর সম্বন্ধেও একথা সত্য। সচরাচর আমরা মনে করিয়া থাকি যে, সুযুক্তি পরম্পরা দ্বারা ঈশ্বরের সত্তা নির্ণীত হইতে পারে; কিন্তু তাহা নহে। ঈশ্বরের সত্তা প্রতীতি করা ও সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হওয়া, হৃদয় ও মনের অবস্থার উপরে নির্ভর করে। যেমন স্বার্থপর কঠোরহৃদয় ব্যক্তির নিকটে যুক্তির পরে যুক্তি প্রদর্শন করিলেও সে প্রেমের সত্যতা গ্রহণ করিতে পারে না, কারণ যে বস্তু হৃদয়ে থাকিলে মানুষ প্রেম চিনিতে পারে সে বস্তু তাহার নাই, সেইরূপ হৃদয় মনের কলুষিত অবস্থাতে মহাযুক্তি প্রদর্শন করিলেও মানুষের ঈশ্বর-জ্ঞান উজ্জ্বল হয় না। এই জন্য সাধুরা বলিয়াছেন, যে ঈশ্বর

আছেন ইহা অনুভব করিবার জন্য সুযুক্তি ও প্রখর মেধা অপেক্ষা অকপটচিত্ততা অধিক প্রয়োজনীয়। এ বিষয়ে সকল দেশের ও সকল কালের ঈশ্বর-পরায়ণ সাধুগণের একবাক্যতা দেখা যায়। উপনিষদ বলিয়াছেন—"বিশুদ্ধ-সত্ত্ব ব্যক্তি ধ্যান-পরায়ণ হইলেই তাঁহাকে দেখিতে পায়।" যীশু বলিয়াছেন—"নির্ম্মলচিত্তেরা ধন্য, কারণ তাঁহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবেন।" যাঁহার হৃদয়, মন ও চরিত্রের অবস্থা এরূপ যে ঈশ্বরের সত্তা ও স্বরূপের উল্লেখ মাত্রই অন্তরাত্মা স্বতঃই বলে তিনি আছেন, প্রমাণান্তরের প্রয়োজন হয় না, সেই ব্যক্তির হৃদয়ই ঈশ্বর--জ্ঞান লাভের অধিকারী। নতুবা যাহার হৃদয়, মন ও চরি-ত্রের অবস্থা এরূপ যে ঈশ্বর না থাকিলেই তাহার পক্ষে ভাল, সে ব্যক্তিকে কোনও যুক্তির দ্বারা ঈশ্বর-জ্ঞান দেওয়া যাইতে পারে না। অতএব একথা সত্য যে, তিনি আছেন ইহা যে না বলিল, তাহাকে আর কোনও যুক্তির দ্বারা তাঁহার সত্তা বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না।

মানুষের নিজ অন্তরে যাহা নাই মানুষ তাহা অন্যত্র দেখিতেও পায় না। ঈশ্বর সত্যস্বরূপ, ন্যায়স্বরূপ, প্রেম-স্বরূপ। যাঁহার হৃদয় সত্যানুরাগে উদ্দীপ্ত, সত্যকে যিনি প্রিয় জ্ঞান করিতে শিখিয়াছেন, যাঁহার আত্মা সত্যে বাস ও বিহার করিতে সমর্থ হইয়াছে, ঈশ্বর সত্যস্বরূপ এ কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে কি আর তাঁহার বিলম্ব হয়? সত্যস্বরূপের উল্লেখমাত্রেই কি তিনি "অস্তি" এই কথা বলেন না? সেইরূপ যিনি ন্যায়কারী, ন্যায়ের শক্তি যিনি আপনার অন্তরে অনুভব করিয়াছেন ও তাহার

অধীন হইয়াছেন, অন্যায়ের প্রতি দ্বেষ ও ন্যায়ের প্রতি আস্থা যাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক ভাব হইয়াছে, ঈশ্বর ন্যায়স্বরূপ এ কথা বলিলে কি তিনি তৎক্ষণাৎ "অস্তি" বলিয়া উঠেন না? তাঁহাকে কি আর যুক্তি পরম্পরার অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়? সেইরূপ নিস্বার্থ প্রেম যে হৃদয়ে আছে, ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ এ কথা বুঝিতে আর তাহার বিলম্ব হয় না, উচ্চারণ মাত্র সে হৃদয় বলে, ঠিক অস্তি, অস্তি, তিনি প্রেমস্বরূপই বটে। অতএব আমাদের সত্য-প্রিয়তার দ্বারা জানি তিনি সত্যস্বরূপ, ন্যায়পরায়ণতার দ্বারা জানি তিনি ন্যায়স্বরূপ, প্রেমিকতার দ্বারা জানি তিনি প্রেমস্বরূপ এবং পবিত্রতার দ্বারা জানি তিনি পবিত্র স্বরূপ। অর্থাৎ যে পরিমাণে আমরা তাঁহার স্বরূপের অনুরূপ হই, সেই পরিমাণে তাঁহাকে জানিবার অধিকারী হই। নির্ম্মল-চিত্ত ব্যক্তি শুনিবামাত্র বলেন—"অস্তি", এবং সেইরূপ ব্যক্তিই তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারেন। এরূপ চিত্তে সংশয়ের উদয় হয় না। ঈশ্বর ন্যায়ের একটা সিদ্ধান্ত নহেন যে তাঁহাকে সর্ব্বদাই তর্কশাস্ত্রের বিশুদ্ধ রীতি অনুসারে নির্ণয় করিতে হইবে, তিনি আধ্যাত্মিক শক্তি, সুতরাং অপরাপর শক্তি সম্বন্ধে যেমন এই নিয়ম দেখি যে সংশয়ের অঙ্গুলির স্পর্শ মাত্রেই তাহা অন্তর্হিত হয়, তাঁহার সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। সংশয়ের রেখাপাত মাত্র তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই জন্য ঋষিগণ বলিয়াছেন—

অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।

ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিঃ।

উপনিষদের একটী বচনে আছেঃ—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।

অর্থ—"সেই পরাৎপর পরম পুরুষকে দেখিলে হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সকল সংশয় ছেদন হয়, একং কর্ম্ম সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।"

কর্ম্ম-ক্ষয় শব্দের অর্থ পাপ ও পুণ্য উভয়বিধ কর্ম্মের ক্ষয়। এই মতটি অদ্বৈতবাদ এবং নির্ব্বাণ মুক্তির মতের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। জন্ম কর্ম্মাধীন, সুতরাং কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই জন্মেরও ক্ষয় হয়; তাহারই নাম অপুনরাবৃত্তি বা মুক্তি। ব্রাহ্মসমাজ অপুনরাবৃত্তি-মূলক শক্তির মত গ্রহণ করেন নাই, সুতরাং কর্ম্মক্ষয়ের মত আমাদের নহে। তবে কর্ম্মক্ষয়কে আমরা আর এক ভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমি কর্ত্তা, আমি করিতেছি, এ সদনুষ্ঠান আমার, এতন্নিবন্ধন প্রাপ্য গৌরব আমার, ইত্যাকার অহংকার বা অভিমান-বুদ্ধি-প্রসূত কর্ম্ম সর্ব্বথা বন্ধন স্বরূপ, কারণ তাহা ভক্তির আধারভূত বিনয়কে উৎপন্ন না করিয়া, বরং অহমিকাই অভ্যুদয় করে, মানবত্মাকে ঈশ্বরের সন্নিধানে উপনীত না করিয়া আত্ম-মধ্যেই বদ্ধ রাখে, এবং মনকে পার্থিব হীন বিষয় সকলের উপরে উন্নীত না করিয়া তন্মধ্যেই নিমগ্ন করে। সেই পরাৎপর পরমেশ্বরকে

দর্শন করিলে এরূপ কর্ম্ম যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এইরূপ তাঁহাকে সত্যের সত্য প্রণের প্রাণরূপে দর্শন করিলে সকল সংশয়েরও ছেদন হয়। ইহার মধ্যে একটু গূঢ় অর্থ আছে; অনেক আধ্যাত্মিক সংশয়ের প্রকৃতি এরূপ যে তাহা যুক্তি বা তর্কের দ্বারা দূর করা যায় না। তাহা কেবল ধর্ম্ম-জীবনের উন্নতি ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ হইলেই নিরস্ত হইয়া থাকে! সামান্য লৌকিক জ্ঞানলাভ সমন্ধে ইহা অনেক সময় লক্ষ্য করা যায়। পঠদ্দশাতে যখন আমরা বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে পাঠ করিতাম, তখন এমন অঙ্ক ছিল, যাহা করিতে পারি নাই, বুঝিতেও পারি নাই; সে স্থানগুলি সংশয়ে আকুল ও অন্ধকারাবৃতই থাকিয়া গিয়াছিল। তৎপরে কয়েক বৎসর গত হইল, আমরা দেখিতে দেখিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরের শ্রেণীতে আসিলাম, তখন একদিন নিম্নশ্রেণীর বালকেরা কষিয়া দিবার জন্য সেই অঙ্কগুলিই আনিল। তখন দেখি সেগুলি জলবৎ সহজ বোধ হইতেছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেগুলি করিয়া দিলাম। প্রশ্ন এই, যে বিষয় গুলি এক সময়ে সংশয়ে আকুল ছিল, সে গুলি কিরূপে পরিষ্কার হইয়া গেল? ইহার উত্তর এই মধ্যবর্ত্তী কয়েক বৎসর শিক্ষার উন্নতি নিবন্ধন যে মানসিক শক্তির বিকাশ হইয়াছে তাহারেই গুণে পূর্ব্বোক্ত সংশয়গুলি আপনাপনি ছেদন হইয়া গিয়াছে। আধাত্মিক বিষয়েও সেই প্রকার। আজ যে ব্যক্তির মনে ঈশ্বরের স্বরূপ, নিরাকারের পূজার সাত্যতা, প্রার্থনার আবশ্যকতা, ও পরকাল

প্রভৃতি বিষয়ে নানা সন্দেহের উদয় হইতেছে, কিছুদিন অপেক্ষা কর, তাঁহাকে দৈনিক উপাসনামন্ত্রে দীক্ষিত হইতে দেও, নিজ আত্মাতে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ কার লাভ করিতে দেও, দেখিবে সমুদায় সংশয় আপনাপনি ভঞ্জন হইয়া যাইবে; আর সে সকল সন্দেহ তাঁহার হৃদয়কে আন্দোলিত করিবে না।

পূর্ব্বোক্ত বচনে ঋষিগণ আর একটী কথা বলিতেছেন ;— পরাৎপর পরমপুরুষকে দেখিলে হৃদয়ের গ্রন্থি ছিন্ন হয়। এই হৃদয়-গ্রন্থি কি? গ্রন্থি শব্দের অর্থ যদ্দ্বারা কোনও বস্তু বাঁধিয়া রাখা যায়। হৃদয়-গ্রন্থি শব্দের অর্থ সেই সকল গূঢ় আসক্তি, যদ্দ্বারা আমাদের হৃদয় পার্থিব পদার্থ সকলের সহিত আবদ্ধ হইয়া থাকে। ঋষিগণ সেই পরাৎপর পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শনকে এই সকল আসক্তিপাশ হইতে উদ্ধারলাভের প্রধান উপায়স্বরূপ মনে করিতেন।

এই জগতে মানুষ যতদিন বাস করিতেছে, এই রক্তমাংসময় দেহ যতদিন আছে, ততদিন সে রোগ, শোক, জরা ও মৃত্যুর অধীন। এসকল দুঃখ সে কখনই নিবারণ করিতে পারে না; ইচ্ছা করিলেও ইহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। ইহার উপরে আবার নানাপ্রকার অন্য দুঃখ আছে। মানুষ সামাজিক জীব, তাহাকে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে হয়, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার আত্মীয় স্বজনকে পোষণ করিতে হয়, ধনোপার্জ্জন, ধনসঞ্চয়, বিষয়-বাণিজ্য প্রভৃতি করিতে হয়, তন্নিবন্ধন অনেক প্রকার দুঃখ প্রতিদিন উৎপন্ন হয়, যাহা মানব-হৃদয়কে অনিবার্য্যরূপে পীড়ন করে।

এতদ্দেশীয় ধর্ম্মসাধকগণ চিরদিন এই প্রশ্নের বিচার করিতেছেন,—কিরূপে মানুষকে এই সকল দুঃখ হইতে উদ্ধার করা যায়? ধর্ম্ম যে পরম শান্তির আশা দিয়া থাকেন, তাহা কি এই দুঃখময় সংসারে বাস করিয়া পাওয়া যাইতে পারে? বৌদ্ধগণ এবং এদেশীয় অদ্বৈতবাদিগণ স্থির করিয়াছিলেন যে সংসারে বাস করিয়া ধর্ম্মসাধন সম্ভব নহে। বাসনার নিবৃত্তি ব্যতীত কেহ পরম শান্তি লাভ করিতে পারে না; অথচ সংসারে বাস করিয়া বাসনাকে নিবৃত্ত করাও সম্ভব নহে; সুতরাং বুদ্ধের ধর্ম্ম, যতী ও ভিক্ষুদিগের ধর্ম্ম এবং অদ্বৈতবাদের ধর্ম্ম সন্ন্যাসীদিগের ধর্ম্ম হইয়াছে। এই যতিধর্ম্ম বা সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রচারিত হওয়াতে দুই প্রকার অনিস্ট ঘটিয়াছে। প্রথম, যাঁহারা ধর্ম্ম-পিপাসু ও সাধনপরায়ণ তাঁহাদের অধিকাংশ সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে তাঁহাদের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা জনসমাজের যে কল্যাণ হইত, তাহা হইতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ, সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন হয় না এই সংস্কার অন্তরে বদ্ধমূল হওয়াতে, যাহারা বাধ্য হইয়া সংসারে রহিয়াছে, তাহারা নিরাশকূপে ডুবিয়া আরও বিষয়াসক্তির পাশে বদ্ধ হইয়াছে।

ভক্তিপথাবলম্বিগণ এ পথে না গিয়া আর এক উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহারা বলিলেন—"যতদিন এ জগতে বাস, ততদিন রোগ, শোক, জরা, মৃত্যুর অধিকার হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় নাই। অতএব এরূপ পন্থা আবিষ্কার করিতে হইবে, যদ্দ্বারা আমরা এই রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু ও বিবিধ

প্রকার দুঃখের মধ্যে বাস করিয়াও পরম শান্তি লাভ করিতে পারি। ভক্তিই সেই পন্থা। ভক্তির শ্রেষ্ঠ উপদেশ এই,—বিষয় মধ্যে বাস করিয়াও নির্লিপ্তভাবে তাঁহার সেবা করিতে হইবে। এই নির্লিপ্ত ভাব-সাধনের উপদেশ দিবার জন্যই ভগবদ্গীতা গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল। ইঁহাদের উপদেশের সার মর্ম্ম এই,—"হে মানব! তুমি আপনাকে সুখ দুঃখের দ্বারা অভিভূত হইতে দিও না। সুখ দুঃখ তোমার আত্মার বহির্ভাগকে স্পর্শ করিয়া থাকুক; কিন্তু তাহার অন্তরভাগ সুখ দুঃখের অতীত থাকিয়া শান্তিময় ধামে বাস করুক।

কিন্তু আমরা জীবনের প্রতিদিনের পরীক্ষাতে দেখিতেছি যে, জগতের সুখ দুঃখের মধ্যে বাস করিয়াও আত্মাকে সুখ দুঃখের অতীত স্থানে রাখা অতীব দুষ্কর। জনসমাজে সময়ে সময়ে এমন মনস্বী পুরুষ ও মনস্বিনী নারী দেখা যায়, যাঁহারা সুখ দুঃখের দ্বারা অভিভূত হন না। তাঁহাদের আত্মা যেন দ্বিভাগ-বিশিষ্ট! বহির্ভাগের দ্বারা তাঁহারা দৈনিক জীবনের সুখ দুঃখকে স্পর্শ করিয়া থাকেন, অন্তর্ভাগের দ্বারা যেন আর কোনও জগতে বাস করেন। তাঁহাদের অন্তরাত্মা যেন সর্ব্বদা কর্ত্তব্যপরায়ণতার বিমল বায়ুতে বাস করে; কিন্তু এরূপ মনস্বী ও মনস্বিনীর সংখ্যা জগতে অল্প। সাধারণ লোকের অবস্থা এইরূপ দেখা যায় যে, তাহারা সর্ব্বদা সুখ দুঃখের গ্রাসের মধ্যেই বাস করে। দুঃখ ক্লেশ আসিলে এমনি অভিভূত হয় যে, আপনাদের দুঃখের ভিতর হইতে মনকে তুলিয়া জগতের সুখ দুঃখের প্রতি চাহিবার সময় হয় না। নিজ নিজ জীবনের

সুখ দুঃখ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া একটু দূরে দাঁড়াইবার শক্তি ইহাদের নাই।

মানুষকে নিজ জীবনের সুখ দুঃখের উপরে তুলিবার উপায় কি? অনেক মানুষ যে নিজ নিজ জীবনের সুখ দুঃখ ভিন্ন আর কোনও বিষয় চিন্তা করিতে পারে না, তাহার কারণ এই, তাহারা সে প্রকার চিন্তা করিতে অভ্যস্ত নহে। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহারা কেবল নিজের চিন্তাই করে। কিসে নিজের সংসারের উন্নতি করিবে, কিসে কিঞ্চিৎ ধনাগম হইবে, কিসে নিজ পরিবারটী সুখে থাকিবে, কিসে বিষয় বিভবের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, এই চিন্তাই অহর্নিশ তাহাদের চিত্তকে অধিকার করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন তাহারা আর কোনও বিষয়ে ভাবে না, এক বর্ণ পড়ে না, জগতের কোনও প্রকার উন্নতির সংবাদ রাখে না। আমাদের দেশের বহুসংখ্যক লোক এই শ্রেণীভুক্ত। এমন কি যাঁহারা বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন, ও নানা প্রকার জ্ঞান সঞ্চয়ের সুবিধা পাইয়াছেন, তাঁহারাও স্বীয় স্বীয় জ্ঞানের উন্নতি-সাধনে বিমুখ। তাঁহাদেরও অধিকাংশের এই অবস্থা দেখি যে, তাঁহারা নিজ নিজ দৈনিক কার্য্যের অতিরিক্ত আর কোনও বিষয়ে চিন্তা করেন না। প্রতিদিনের কাজ, আহার নিদ্রা, আমোদ প্রমোদ, ইহার অতিরিক্ত ভাবিবার বা করিবার যেন-কিছু নাই। এইরূপ ব্যক্তির চিত্ত যে সম্পূর্ণরূপে নিজ সুখ দুঃখে ডুবিয়া থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যাঁহাদের যৌবন এবং প্রৌঢ়াবস্থা এইরূপে গত হয়, বার্দ্ধক্যেও তাঁহাদের চিত্ত

পরমার্থ চিন্তনে উন্মুখ হয় না। তখন্ যদি তাঁহাদিগকে উপদেশ দেওয়া যায়,—"বিষয়-চিন্তা হইতে বিরত হও, সংসার কোলাহল হইতে অবসৃত হও, ঈশ্বরচিন্তাতে মনোনিবেশ কর—" সে সকলি বৃথা। মন ৪০।৫০ বৎসর যে সকল বিষয় চিন্তা করে নাই, তাহার চিন্তাতে কি হঠাৎ ব্যাপৃত হইতে পারে? বিষয়-কোলাহল ত্যাগ করিতে বলিলে কি হইবে, তাহাই যে ভাল লাগে! এইরূপ বিষয়ীদিগের মৃত্যুকাল দেখিয়া সাধুরা অনেক শোক করিয়াছেন।

এইজন্য চিত্তকে নিজ জীবনের সুখ দুঃখের উপরে তুলিবার নিমিত্ত প্রথম উপদেশ এই,—মনকে সর্ব্বদা জ্ঞানালোচনা দ্বারা উদার ও প্রশস্ত কর এবং জগতের কল্যাণ-চিন্তাতে আপনাকে অভ্যস্ত কর! যে কোনও উপায়ে মানুষকে নিজের গণ্ডীর ভিতর হইতে বাহির করিয়া আনে এবং স্বার্থচিন্তা হইতে দূরে লইয়া যায়, তাহাই অবলম্বনীয়।

এতদ্ভিন্ন ভক্তিপথাবলম্বীগণ যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন আমাদিগকেও সেই পথ ও অবলম্বন করিতে হইবে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মকে গৃহীর ধর্ম্ম এবং সামাজিকের ধর্ম্মরূপেই প্রচার করিয়াছিলেন, সুতরাং সুখ দুঃখময় সংসারে বাস করিয়াও আত্মা যাহাতে শান্তিতে থাকিতে পারে সেই পথ আমাদিগকে আবিষ্কার করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত বচনে সেই বিষয়েরই উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। সেই পরাৎপর পরম-পুরুষকে দেখিলে, মন আর ক্ষুদ্র বস্তুতে আসক্ত থাকে না, এই জীবনের সুখ দুঃখ আর সমগ্র হৃদয়কে অধিকার করিতে পারে না।

ঈশ্বরের সন্নিধানে থাকা ও তাঁহাকে প্রেমালোকে দর্শন করার অর্থ কি? কি প্রকার আত্মা ঈশ্বর-সন্নিধানে বাস করে? ও তাঁহাকে দেখিবার অধিকারী হয়? এই স্থলে সধুগণের উপদেশ স্মরণ হয়। সকল দেশে সাধু মহাত্মারা একবাক্যে বলিয়াছেন যে, নির্ম্মল-চিত্তেরাই ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিয়া থাকেন। নির্ম্মল-চিত্ত কাহাকে বলে? অর্থাৎ যাঁহার চিত্ত সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত সত্যের অনুসরণ করিতে প্রস্তুত, যাঁহাতে স্বার্থপরতা নাই, অথবা অন্য কোনও প্রকার অভিসন্ধি নাই। মানুষ যদি সর্ব্বদা আপনাকে কর্ত্তব্যপরায়ণতার বিমল বায়ুতে রক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলে এই নির্ম্মল-চিত্ততা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া যায়। কারণ কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে গেলেই মানুষকে স্বার্থপরতা ও সুখ-প্রিয়তার উপরে উঠিতে হয়। যে ব্যক্তি স্বার্থপর ও সুখপ্রিয় সে কখনই কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে পারে না। স্বার্থপরতা ও সুখপ্রিয়তা তাহার চিত্তের গতিকে বক্রপথে লইয়া যাইবেই যাইবে। অতএব যে ব্যক্তি কর্ত্তব্যপরায়ণতার উচ্চ ভুমিতে আরোহণ করিয়াছেন, তিনি স্বার্থ ও সুখাসক্তির উপরেও বাস করিতেছেন। এরূপ আত্মা যে ঈশ্বরের বিমল সন্নিধানে সর্ব্বদা বাস করিতেছেন তাহাতে কি সন্দেহ আছে? ঈশ্বরে যাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, এবং ঈশ্বরেচ্ছা সম্পাদনই যাঁহার জীবনের পরমানন্দ, তিনিই প্রকৃত ভাবে কর্ত্তব্যপরায়ণতাতে প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য কর্ত্তব্যপরায়ণতাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া জীবনের সুখ দুঃখের উপরে উঠিবার একটী প্রধান উপায়। সমগ্র ভগবদ্গীতার এই উপদেশ, ইহা বলিলে

অত্যুক্তি হয় না। ভগবদ্গীতাতে যে সুখ দুঃখে সমভাবাপন্ন হইয়া কার্য্য করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে তাহার অর্থও এই। "তুমি তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধান করিয়া যাও; কোন প্রকার ফলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করিও না; লোকের অনুরাগ বিরাগ গণনা করিও না; নিজের সুখ বা দুঃখের প্রতি দৃষ্টি রাখিও না; কিন্তু উহা তোমার কর্ত্তব্য, এই জন্যই কর। ফলস্বরূপ যদি দুঃখ আসে তবে অপরাজিত চিত্তে সে সমুদায় দুঃখ বহন কর।" ঈশ্বর সেতুস্বরূপ হইয়া ধর্ম্মকে ধারণ করিয়া আছেন, ইহা দিব্যচক্ষে না দেখিলে কেহ প্রকৃতরূপে কর্ত্তব্য-পরায়ণতাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না; এবং তাঁহার প্রতি অকপট প্রীতি না জন্মিলে কেহ ফলকামনা পরিত্যাগ করিতে পারে না। প্রেমের স্বধর্ম্ম এই,—ইহা স্বার্থপরতাকে বিদায় করিয়া তবে হৃদয় ঘরে প্রবেশ করে। প্রেমাস্পদ যিনি তাঁহার ইচ্ছা সম্পাদনেই সুখ, ইহার অতিরিক্ত অন্য উদ্দেশ্য বা কামনা প্রেমিকের হৃদয়ে থাকে না। অতএব তিনিই এজগতে কর্ত্তব্য-পরায়ণ, ঈশ্বর-প্রীতি যাঁহার কার্য্যের চালক। এরূপ ব্যক্তি নানাবিধ কার্য্য করেন, সংসারে নানা অবস্থাতে বিচরণ করেন, নানা সুখ দুঃখ ভোগ করেন, অথচ কিছুতেই তাঁহার চিত্তকে আবদ্ধ করিতে পারে না। কারণ প্রেমাস্পদের ইচ্ছার অধীন হওয়া ভিন্ন তাঁহার অন্য আকঙ্ক্ষা নাই। এরূপ নিত্যযুক্ত ব্যক্তি সর্ব্বদা শান্তিতে বাস করিয়া থাকেন। তিনি নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া নিরুদ্বেগে নিদ্রা যান; ফলাফল ফল-দাতার হস্তেই থাকে।

আমরা তাঁহার প্রতি এতটা নির্ভর করিতে পারি না বলিয়াই এ সংসারে এত আন্দোলিত হই। আমরা কিরূপ অল্পবিশ্বাসী তাহা যখন চিন্তা করি, তখন বাস্তবিক লজ্জাতে অধোবদন হইতে হয়। আমরা মনে করি যেন আমরা এই জীবনের কর্ত্তা, যেন ইহার সকল সুখ দুঃখ আমাদের হস্তে! এ কথা আমাদের মনে হয় না যে, যে শক্তি ও যে জ্ঞান অবলীলাক্রমে এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডকে রক্ষা করিতেছে, যাঁহার হস্তে অযুত লোকমণ্ডলী, অগণ্য প্রাণী নিরুপদ্রবে রহিয়াছে, আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবন সেই শক্তির ক্রোড়েই শায়িত ও সেই কৃপার দ্বারাই রক্ষিত। চন্দ্র, সূর্য্য, তাঁহার ইচ্ছাধীন থাকিয়া নিরুপদ্রবে আছে, আমরাও তাঁহার ইচ্ছাধীন থাকিলে নিরুপদ্রবে বাস করিতে পারি। ফলাফলের বিষয় এত চিন্তা কেন? আমরা ভবিষ্যতের কতদূর দেখিতে পারি? মানুষের কাজের যত ফল হয় সে কি তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারে? আজ আমরা যে পথে দাঁড়াইয়াছি দশ বৎসর পূর্ব্বে কি জানিতাম এই পথে আসিব? তবে ফলাফল তাঁহার হস্তে দিয়া যাহা সৎ, যাহা সাধু তাহারই অনুসরণ কি কর্ত্তব্য নয়? যাহা সৎ এ জীবনে যদি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাহার অনুসরণ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। সকল সময়ে যে কৃতকার্য্য হইব তাহা নহে, সকল সময়ে যে সুখে থাকিব তাহাও নহে, হয়ত সে পথে দুঃখ আসিতে পারে, ক্লেশ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু যে রূপ অবস্থাই

ঘটুক ঈশ্বরেচ্ছার অনুসরণ জনিত যে বিমল আত্মপ্রসাদ তাহা হইতে কেহই আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। আমাদের আত্মা সংসার-কোলাহলের মধ্যে থাকিয়াও শান্তিধামে বাস করিবে। অতএব বিশ্বাসচক্ষে সেই পরাৎপর পরমপুরুষকে সত্য বলিয়া যতই আমরা দর্শন করিব, ততই আমাদের চিত্ত সকল প্রকার গ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হইয়া সুখ দুঃখের অতীত স্থানকে অধিকার করিতে সমর্থ হইবে।

হিরন্ময় পরম কোষ।

উপনিষদের একটী বচনে প্রাপ্ত হওয়া যায়ঃ—

"হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।

তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদোবিদুঃ॥"

অর্থ—"হিরণ্ময় পরম কোষে বিশুদ্ধ নিষ্কল ব্রহ্ম বিরাজিত আছেন, তিনি শুভ্র, জ্যোতির জ্যোতি, আত্মবিদ ব্যক্তিগণই তাঁহাকে জানিতে পারেন।'

কিরূপে মানব মনে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হইল? এই প্রশ্ন বর্ত্তমান সময়ে অনেক চিন্তাশীল পণ্ডিতের চিত্তকে আন্দোলিত করিতেছে। আদিম বর্ব্বর অবস্থার মনুষ্য পশু অপেক্ষা অধিক উন্নত ছিল না। তখন মনুষ্যও পশুর ন্যায় সম্পূর্ণরূপে নিজ দৈহিক অভাব সকলের পূরণের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকিত; ক্ষুধার তাড়নায় অরণ্য মধ্যে খাদ্যান্বেষণে বিচরণ করিত; এবং বর্ত্তমান প্রবৃত্তির চরিতার্থতার অতিরিক্ত আর কিছু জানিত না। দৃশ্য জগৎ ও বর্ত্তমানকাল এই দুইটী যেমন সম্পূর্ণরূপে পশুদিগের চিত্তকে অধিকার করিয়া থাকে, তেমনি আদিম মনুষ্যেরও চিত্তকে অধিকার করিয়া থাকিত। সেই মানবের মনে কিরূপে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হইল?

এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে অনেকে হয় ত বলিবেন, ইহাতে আর বিচিত্র কি? সেই আদিম বর্ব্বর অবস্থার

মনুষ্য যদি কাল সহকারে বিষয় বাণিজ্যের বিস্তার, শিল্প সাহিত্যের বিকাশ, জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি, এবং সভ্যতার নানাপ্রকার অদ্ভুত উপাদানের সৃষ্টি করিয়া থাকে, তবে এবিষয়েও যে উন্নতি লাভ করিবে তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি? বস্তুতঃ সেই আদিম বর্ব্বর অবস্থার মনুষ্য বর্ত্তমান ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্য জগতের মানুষ হইয়াছে, ভাবিলে বিস্মিত ও স্তব্ধ হইয়া থাকিতে হয়। কোথায় আন্দামান দ্বীপবাসী, নগ্নদেহ, বন্যপ্রকৃতিসম্পন্ন মানব, আর কোথায় সুসভ্য দেশের অন্যতম নেতা গ্লাডষ্টোন! এই উভয়ের প্রভেদ কত! কোথায় অরণ্যবিহারী বর্ব্বরদিগের তরুপত্রাচ্ছাদিত কুটীর, আর কোথায় সমৃদ্ধিশালী লণ্ডন বা পারিস নগরী! যে ধীশক্তির গুণে মানব এতটা করিয়াছে, সেই ধীশক্তির গুণেই মানব পরমার্থ চিন্তাতে নিযুক্ত হইয়াছে, ইহাতে বিস্ময়ের ব্যাপার কি!

ইহার মধ্যে একটু কথা আছে। বিষয় বাণিজ্যের বিস্তার শিল্প সাহিত্যের উন্নতি প্রভৃতি মানবের যত কিছু শ্রীবৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহার কোনটীই এই দৃশ্য জগৎ ও এই মর্ত্ত্য জীবনকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে না। বরং ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, এই মর্ত্ত্য জীবনের সুখ সৌকর্য্য বৃদ্ধির উদ্দেশেই তাহার অধিকাংশের সৃষ্টি হইয়াছে। সে সকলের চিন্তনে মানব এই মর্ত্ত্য জীবনকে অতিক্রম করে না। কিন্তু ব্রহ্মজিজ্ঞাসার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। ইহা এই মর্ত্ত্য জীবনকে অতিক্রম করিয়া, দৃশ্য জগতের পশ্চাতে

গিয়া অদৃশ্য জগতের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত। মানবের এত দেখিবার, শুনিবার, ভাবিবার ও করিবার বিষয় রহিয়াছে, যদ্দ্বারা মানব-মন সম্পূর্ণরূপে এই মর্ত্ত্য জীবনে ও এই দৃশ্য জগতে আকৃষ্ট ও আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে, তথাপি কেন মানবের মন দৃশ্য ও ভোগ্য বিষয় সকলকে পশ্চাতে ফেলিয়া অদৃশ্য বিষয়ের জন্য লালায়িত হইয়াছে ?

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বর্ত্তমান সময়ের অনেক চিন্তাশীল পণ্ডিত এই দুরূহ প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। দুই দলে ইহার দুই প্রকার উত্তর দিয়াছেন। এক দল বলেন যে আদিম বর্ব্বর অবস্থার মনুষ্য স্বপ্নাবস্থাতে দেখিল যে, সে যখন নিদ্রিত থাকে, তখন তাহার আত্মা কোথায় যায়, কত কি দেখে, কত সুখ দুঃখ ভোগ করে। ইহা দেখিয়া বিবেচনা করিল, শরীরের অতিরিক্ত একটা আত্মা আছে, শরীর যখন নিশ্চেষ্ট তখন সে ক্রিয়াশীল, তখন সে নানা স্থান ভ্রমণ করে ও নানা বিষয় পরিদর্শন করে! এই বিশ্বাস হইতেই কোনও ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার পরকালযাত্রার সহায়রূপে নানাপ্রকার ভোগ্য সামগ্রী ও যুদ্ধের প্রহরণ প্রভৃতি তাহার সমাধি-মন্দিরে দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এইপ্রকার বিশ্বাস হইতেই আদিম অবস্থার মনুষ্যগণ স্বাভাবিক ভাবে আর একটী বিশ্বাসে উপনীত হইয়াছিল। সেটী এই, প্রভাবশালী পিতৃপুরুষগণ এবং জাতীয় নেতাগণ মৃত্যুর পরেও স্বগণের ও স্বজাতির হিতসাধনে নিযুক্ত থাকেন। এইরূপে আদিম মানব-সমাজে পিতৃপুরুষ-পূজা ও জাতীয়

অভিভাবকস্বরূপ মহাজন-পূজা প্রবর্ত্তিত হয়। ইঁহারাই কালে জাতীয় অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে পূজিত হইতে থাকেন, তৎপরে ইহাঁদের মধ্যে একজন হয় ত অপরাপর সকলের উপরে শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন, এবং তিনি সর্ব্বগুণসম্পন্ন বলিয়া আদৃত হন। উত্তরকালে ইনি সর্ব্বারাধ্য ঈশ্বররূপে গৃহীত হইয়াছেন। এইরূপে যিহুদী জাতীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জাভে বা যিহোভা উত্তরকালে সমগ্র জগতের অধীশ্বররূপে অবলম্বিত হইয়াছেন।

আর একদল বলেন, নির্ভরের ভাব হইতেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উৎপত্তি! মানব আদিম অবস্থাতেই নিরন্তর আপনাকে দুর্ব্বল, সীমাবদ্ধ ও পরতন্ত্র দেখিয়াছে। দেখিয়াছে যে, এ ব্রহ্মাণ্ডে তাহার ইচ্ছাকে কেহ গ্রাহ্য করে না; তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হয় না, বরং পদে পদে চূর্ণ হইয়া যায়। সুতরাং চিন্তার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই সে অনুভব করিয়াছে যে ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে অপর কোনও শক্তি বিরাজিত, যে শক্তি সৃষ্টি প্রলয় প্রভৃতি করিতেছে। তৎপরে যখন দেখিল যে জল বায়ু অগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থ সকল প্রভূত শক্তিশালী, দুর্জ্জয় বেগবান ও অপরাজেয়, তখন মনে করিল তাহারাই বুঝি ঐ ব্রহ্মাণ্ড-শাসিনী-শক্তি; সুতরাং তাহাদের পূজা আরম্ভ করিল। ক্রমে জ্ঞানের উন্নতিসহকারে বুঝিতে পারিল, জল বায়ু প্রভৃতি আদর্শশক্তি নহে, তখন আবার তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতে উপনীত হইল।

উক্ত উভয় প্রকার উত্তর দ্বারা যে আদিপ্রশ্নের মীমাংসার

পক্ষে বিশেষ সহায়তা হইয়াছে এরূপ বোধ হয় না। তাহার সদুত্তর যে প্রকারই হউক, ইহা নিশ্চিত যে মানব অগ্রে নিজ হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের ভাব পাইয়াছে, সেখানে এক, অনাদি, অনন্ত, অবিনাশী পরমসত্তার আভাস পাইয়াছে, তৎপরে তাঁহাকে সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিয়াছে। অতএব প্রথম যাত্রা ভিতর হইতে বাহিরে। প্রথমে জড়ের মধ্যে তাঁহাকে অন্বেষণ, তৎপরে চেতনরাজ্যে তাঁহাকে অন্বেষণ, তৎপরে মনুষ্য-সমাজে তাঁহাকে অন্বেষণ।

জগতের এক এক জাতির মধ্যে এই এক একপ্রকার অন্বেষণের ভাব বিশেষ রূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক-গণ প্রধানতঃ জড়রাজ্যে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন। জড়রাজ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহার শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য আমাদের চিত্তকে স্বভাবত আকৃষ্ট করে। সুতরাং গ্রীকগণ জগতের শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্যে ঈশ্বরকে দর্শন করিতেন। এই কারণেই যাহা কিছু সুশৃঙ্খল ও সুন্দর তাহাই তাঁহাদের স্পৃহণীয় হইয়াছিল। এই জন্যই তাঁহাদের মধ্যে চিত্রবিদ্যা ভাস্করবিদ্যা প্রভৃতি সুন্দর শিল্পের অদ্ভুত বিকাশ হইয়াছিল। এই সৌন্দর্য্য-স্পৃহা তাঁহাদের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার মধ্যেও প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তাঁহাদের মতে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল কার্য্যই পুণ্য এবং বিশৃঙ্খল ও কুৎসিত কার্য্যই পাপ।

যিহুদীগণ মানবসমাজে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহারা তাঁহাকে ধর্ম্মাবহ পাপনুদ বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। রাজা মানব-সমাজের শাসনকর্ত্তা সুতরাং

ইহাঁরা ঈশ্বরকে মহারাজারূপে দর্শন করিয়াছিলেন ও সেই ভাবেই অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। ইহাঁদের মতে ঈশ্বরের বিধির অনুগত হওয়াই পুণ্য এবং তাঁহার বিধির বিরুদ্ধাচারী হওয়াই পাপ।

বাহিরে যতক্ষণ ঈশ্বরকে অন্বেষণ করা যায় ততক্ষণ তাহার সত্তার প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না; এবং তাঁহার সঙ্গে প্রকৃত যোগও স্থাপিত হয় না! তিনি যতক্ষণ বাহিরে ততক্ষণ আমা হইতে দূরে। যে শাসন-শক্তি বাহির হইতে আসিয়া শাসন করে, তাহার ভিত্তি ভয়ের উপরে, ও তাহাতে বিধি পালনের দিকেই অধিক দৃষ্টি থাকে। এই কারণেই বোধ হয় যিহুদীদিগের মধ্যে বিধি পালনের ভাব এত প্রস্ফুটিত হইয়া থাকিবে। সে যাহাই হউক, ঈশ্বরের মহিমা বোধ করিবার জন্য যেমন অগ্রে ভিতর হইতে বাহিরে যাত্রা হইয়াছিল, তাঁহার স্বরূপ প্রকৃতভাবে লক্ষ্য করিবার জন্য আবার বাহির হইতে ভিতরে যাত্রা করিতে হয়; আবার তাঁহাকে আত্ম-মন্দিরে অন্বেষণ করিতে হয়।

ভারতীয় হিন্দুসাধকগণ তাঁহাকে আত্ম-মন্দিরে অন্বেষণ করিয়াছিলেন। এই আত্ম-কোষকেই তাঁহারা হিরণ্ময় পরমকোষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হিরণ্ময় পরমকোষ বলিবার অভিপ্রায় কি? হিরণ্য বা সুবর্ণের দুইটী গুণ আছে। প্রথম, ইহা সামান্য মৃত্তিকা হইতে বিভিন্ন, ইহা ধাতু; দ্বিতীয়, ইহা দীপ্তিশালী। যে আত্ম-কোষে ব্রহ্ম বিরাজিত আছেন, তাহা সামান্য জড়ীয় কোষ নহে, তাহা আধ্যাত্মকোষ;

দ্বিতীয়, তাঁহা জ্ঞানজ্যোতি ও পুণ্যজ্যোতিতে উজ্জ্বল কোষ। সেই আত্মকোষে নিষ্কল বিরজ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায়।

এই আত্মকোষ মধ্যে দেখিলেই আমরা তাঁহাকে সত্য ভাবে দেখি। এইরূপ সত্যভাবে তাঁহাকে না দেখিলে শাশ্বত শান্তিলাভ করা যায় না! মানব-মনের প্রকৃতিই এই যে ইহা সত্যান্বেষী এবং সত্য ভিন্ন তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। নিম্নাভিমুখী জল যেমন চরম আশ্রয়ে উপস্থিত না হইলে দাঁড়ায় না, তেমনি মানব-মন ও প্রকৃত সত্যকে না পাইলে শাশ্বত শান্তি লাভ করিতে পারে না। সুখাদ্যের সহিত উদরের যেমন অদ্ভুত নৈসর্গিক আত্মীয়তা, খাদ্য উদরের জন্য, উদর খাদ্যের জন্য, তেমনি সত্যের সহিত মানবাত্মার অদ্ভুত নৈসর্গিক আত্মীয়তা! সত্যকে পাইলেই আত্মা পরিতুষ্ট ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। অতএব আত্ম-মন্দিরে সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিলে আত্মা চরিতার্থ হয়,—"পরাং নির্বৃতিমেতি' পরম শান্তি লাভ করে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই হিরণ্ময় পরম কোষে সেই পরব্রহ্মকে কি ভাবে দেখিতে হইবে? আমাদের যে ঈশ্বর-জ্ঞান তাহা কি পরোক্ষ জ্ঞান না সাক্ষাৎ জ্ঞান? একজন ঈশ্বরের সত্তা ও স্বরূপে বিশ্বাস করিয়াও একথা বলিতে পারেন যে, জগতের অপরাপর আত্মার জ্ঞান যেমন আমাদের পরোক্ষ জ্ঞান, ঈশ্বর-জ্ঞানও তেমনি পরোক্ষ জ্ঞান। অর্থাৎ আমরা এজগতে অপরাপর আত্মাকে যে জানি, তাহা পরোক্ষ ভাবে

তাহাদের বাক্য, গতি, চেষ্টা, ইঙ্গিত প্রভৃতি দর্শনে অনুমান-লব্ধ জ্ঞান মাত্র। তাঁহারা আমাদের সদৃশ প্রকৃতি সম্পন্ন, সুতরাং আমাদের নিজ নিজ বাক্য গতি চেষ্টাদির পশ্চাতে যে নিজ নিজ স্বরূপ দেখিতে পাই, অপরের বাক্য, গতি, চেষ্টাদির পশ্চাতেও সেইরূপ স্বরূপের অনুমান করি এই মাত্র। ফলতঃ আমরা সাক্ষাৎভাবে কেবল আপনাকেই জানিতে পারি, অপরের যে জ্ঞান তাহা অনুমান-লব্ধ জ্ঞান। ঈশ্বর-জ্ঞানও কি সেইরূপ? সৃষ্টি দেখিয়া স্রষ্টার অনুমান মাত্র? যদি তাহাই হয় অনুমানের অতিরিক্ত ঈশ্বর-জ্ঞানের উপায় যদি না থাকে, তাহা হইলে সংশয়ের স্থল বিদ্যমান রহিল। এদেশীয় প্রাচীন দর্শনকারদিগের কেহ কেহ বলিয়াছেন "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" অর্থাৎ অনুমান দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হয় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের অনেকেও এইপ্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার উত্তরে উপনিষদকার ঋষিগণ বলিয়াছেন,—"যদাত্মবিদোবিদুঃ" অর্থাৎ আত্মবিদ্ ব্যক্তিগণই তাঁহাকে জানেন। ইহাঁদের অভিপ্রায় এই, জড়বস্তুর জ্ঞান ও তাহার প্রতিষ্ঠাভূমি স্বরূপ যে আকাশ তাহার জ্ঞান যেমন দুই স্বতন্ত্র জ্ঞানক্রিয়ার কার্য্য নহে, কিন্তু এক জ্ঞানেরই অন্তর্গত সেইরূপ আত্মজ্ঞান ও তাহার প্রতিষ্ঠা ভূমি স্বরূপ পরমাত্ম জ্ঞান একই জ্ঞানের অন্তর্গত। আত্মা তাঁহাতে এরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠিত যে আত্মাকে জানিলেই তাঁহাকে জানা হয়।

আত্মার স্বরূপ প্রকৃতি অতি অদ্ভুদ। সংসারের দিক দিয়া দেখিলে ইহা সীমাবদ্ধ। ইহার জ্ঞান অজ্ঞানতা দ্বারা আবৃত,

ইহার শক্তি দুর্জ্জয় বিঘ্ন বাধা সকলের দ্বারা অভিভূত. ইহার প্রেম আসক্তির দ্বারা পরাজিত, কিন্তু এই সীমাবদ্ধ জীবের আর একটা দিক আছে, যেদিকে ইহা অনন্তের সহিত মিশ্রিত। ইহার জ্ঞান, ও প্রেম ও শক্তি অনন্ত-মুখীন। যেদিকে মানব-জীবন অনন্তের ক্রোড়ে শায়িত এবং অনন্তের সহিত মিশ্রিত। অতএব ঋষিগণ যে বলিয়াছেন,—"এই সুন্দর বর্ণ বিশিষ্ট পক্ষী এক বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। তাহা সত্য। এই দেহ-মন্দিরে জীব ও ব্রহ্ম অদ্ভুত ভাবে সম্মিলিত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের যোগ এত গাঢ় ও এত ঘনিষ্ঠ যে একজনকে পরিহার করিয়া অপরকে জানা যায় না। একজনকে জানা অপরের জানা সাপেক্ষ।

এইরূপে যখন আত্ম-মন্দিরে পরমাত্মদর্শন হয়, তখন বিশ্বাস প্রকৃত ভূমির উপরে স্থাপিত হয়। তখন সেই বিশ্বাস অন্তরের জীবনের উৎসরূপ নিহিত থাকিয়া সমগ্র জীবনকে অধিকার করিতে থাকে। তখন আর শাসনশক্তি বাহির হইতে আসে না; কিন্তু অন্তর হইতেই সমুত্থিত হয়। এই অবস্থাই ধর্ম্ম-জীবনের প্রকৃত অবস্থা। যে অবস্থাতে মানব আর সংশয়ের দ্বারা আন্দোলিত হয় না, এ সেই অবস্থা।

সাধনের প্রথমাবস্থাতে মানুষ রূপ-রস-গন্ধবিশিষ্ট পদার্থ সকলকেই সার ও সত্য বলিয়া প্রতীতি করে, এবং তাহাদের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া সারাৎসার ব্রহ্ম বস্তুকে অন্বেষণ করিতে থাকে, কিন্তু সাধনের পক্কাবস্থাতে সেই চিন্ময় সত্তাকেই সত্য বলিয়া দেখে, এবং রূপ-রস-গন্ধবিশিষ্ট পদার্থ সকলকে সেই

সত্তা-সাগরের বুদ্‌বুদের ন্যায় লক্ষ্য করিতে থাকে। তখন দেখিতে পায় যে, সেই সত্তা-মহাসিন্ধু দেশ কালকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে ; সেই বর্ণহীন সত্তাই বিবিধ বর্ণ প্রসব করিতেছে, সেই শক্তিই ব্রহ্মাণ্ডে, সর্ব্বত্র, জড়ে ও চেতনে,—ভাঙ্গিতেছে গড়িতেছে। এই পরম সত্তা ও পরম জ্ঞানের আশ্রয়ে আপনাকে আশ্রিত দেখিলে মানুষ "অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে" অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে ; ইহা ঋষিগণ বাব বার বলিয়াছেন। বাস্তবিক আমরা যদি বিশ্বাস-নেত্রে আপনাদিগকে এই মহাশক্তির ক্রোড়ে শায়িত ও এই মহাশক্তির দ্বারা সুরক্ষিত দেখিতে পাই, তাহা হইলে কি আর ভয় থাকে ? আমাদের সে বিশ্বাস নাই, সে আত্ম-মন্দিরে পরমাত্মদর্শন নাই, বলিয়াই আমরা অভয়-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারি না।

অভয়-ধাম।

উপনিষদে একটি বচন আছে ঃ—

"যদা হ্যেবৈষএতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতোভবতি॥"

অর্থ—"সাধক যখন এই অদৃশ্য, নিরবয়ব, অনির্দ্দেশ্য, ও নিরাধার পরব্রহ্মে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন।",

এই অভয় প্রতিষ্ঠা কি? অভয়ধাম, অভয় পদ, প্রভৃতি কথা আমরা সর্ব্বদাই শুনিয়া থাকি। এই অভয়ধাম কোথায়? ইহলোকে কি পরলোকে? অভয় শব্দের অর্থ ভয় নিবৃত্তি। ইহা কোন ভয়ের নিবৃত্তি?

সাধকমাত্রেই বলিয়া থাকেন অভয়ধাম এই জগতেই লাভ করা যায়; কিন্তু প্রায় সমুদায় ধর্ম্মেই এ জগতকে যে চক্ষে দেখিয়াছেন, তাহাতে ইহাকে অভয়ধাম বা সুখময় স্থান বিবেচনা করা সম্ভব নহে। কোনও স্থানকে অভয়ধাম বলিয়া ভাবিবার পক্ষে তিনটীর প্রয়োজন, তাহা ক্রমে উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথম, জীবমাত্রেরই প্রকৃতি এই যে, যে স্থানকে সে নিজের স্থান বলিয়া মনে করে না, অর্থাৎ যে স্থান তাহার প্রকৃতির অনুকূল নহে, সে স্থানে থাকিয়া সে সুখী হয় না। মৎস্যকে জল হইতে তুলিয়া স্থলে রাখিলে, পক্ষীকে আকাশ হইতে

ধরিয়া পিঞ্জরে বদ্ধ করিলে, ব্যাঘ্রকে অরণ্য হইতে লইয়া অনাবৃত বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ছাড়িয়া দিলে, নিতান্ত অসুখী হয়। এইরূপ ভূগর্ত্তবাসী জীবকে যদি আলোকে লইয়া যায়, অথবা আলোকবাসী জীবকে যদি ভূগর্ভে রাখে, তাহারা উভয়ে মহা অসুখে কালযাপন করিতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ যেখানে জীবের কোনও প্রকার ক্ষতির আশঙ্কা আছে, সেখানেও জীবের মন কখনও নিরুদ্বেগে বাস করিতে পারে না; কোন সুখই অকুণ্ঠিত চিত্তে উপভোগ করিতে পারে না। প্রতিদিনই আমরা ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দর্শন করিতেছি। একটা সহরে একবার রাজপথের কুকুরদিগকে হত্যা করিবার জন্য বিশেষ আজ্ঞা প্রচার হইল। তদনুসারে ঘাতকগণ প্রতিদিন কুকুরদিগকে হত্যা করিতে লাগিল। সেই সময়ে আমাদের একজন বন্ধু সেই সহরে বাস করিতেন। তিনি একদিন দেখিলেন যে তাঁহার ভবনের একটা লুক্কায়িত এবং আবর্জ্জনা ও অন্ধকারপূর্ণ কোণে একটী কুকুর আশ্রয় লইয়া রহিয়াছে। সে সমস্ত দিনের মধ্যে সেই আশ্রয় হইতে বহির্গত হয় না; বরং দৈবাৎ যদি কেহ কোনও কার্য্যোপলক্ষে সেইদিকে গমন করে, অমনি সে বিকট আর্ত্তনাদ করিতে থাকে, ও মহা শঙ্কা প্রকাশ করে। কিন্তু সন্ধ্যার পর যখন ঘাতকদিগের ভয় থাকে না, তখন সে রাজপথে বাহির হয় এবং আপনার আহার অন্বেষণ করে। জীবনের আশঙ্কাতে জীবের সুখকে কিরূপ হরণ করে তাহার কেমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! মানবের ত কথাই নাই, ভয় নিবন্ধন এই ক্ষুদ্র প্রাণী সমস্ত

দিন যেরূপ যাতনাতে অতিবাহিত করিত, মানুষ অনেক সময় তদপেক্ষা অধিক যাতনাতে কাল কাটাইয়া থাকে। যাহারা দস্যুতা বা নরহত্যা প্রভৃতি কোনও গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইয়া রাজ দণ্ডের ভয়ে পলাতক হয়, তাহাদের অনেকে অনেক সময় স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া রাজপুরুষদিগের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়া থাকে; কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে তাহারা ছদ্মবেশে বিচরণ করিয়াও শান্তিলাভ করিতে পারে না; সর্ব্বদাই ধৃত হইবার আশঙ্কা শাণিত তরবারের ন্যায় তাহাদের মস্তকের উপরে ঝুলিতে থাকে ও তাহাদের মনের সকল শান্তিকে হরণ করে। অবশেষে এই আশঙ্কা-জনিত উদ্বেগের অবস্থা এমনি অসহনীয় হইয়া উঠে যে, তদপেক্ষা কারাবাস বা ঘাতক-হস্তে বিনাশকেও স্পৃহণীয় বলিয়া মনে হয়। অবশ্য অনুতাপের তীব্র যাতনাও অনেক সময়ে এরূপ আত্ম-সমর্পণের কারণ। মানব যে আপনার দুষ্কৃতির জন্য অনুতাপ করিতে পারে ইহাই মানবের বিশেষত্ব ও মহত্ত্ব; এ যাতনা অন্য জীবের নাই। কিন্তু ধৃত হইবার আশঙ্ক-জনিত ক্লেশও যে অনেকের পক্ষে অসহ্য হইয়া থাকে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

তৃতীয়তঃ, জীব যদি অনুভব করে যে এমন স্থানে গিয়া পড়িয়াছে যেখানে তাহাকে বিনাশ করিবার উপযোগী কারণ সকল বিদ্যমান কিন্তু রক্ষা করিবার উপযোগী উপায় নাই, সে স্থানে জীবের বল বুদ্ধি উড়িয়া যায়। একটা অতি সামান্য দৃষ্টান্তের দ্বারা এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

মনে কর একটী কুকুর একাকী ও অসহায় অবস্থাতে অপর কুকুর দলের মধ্যে পড়িয়াছে ; তাহারা সকলে দলবদ্ধ হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিতেছে, তখন তাহার কি প্রকার অবস্থা হয় ? সে কিরূপ ভীরুতা ও যাতনা প্রকাশ করে ? কিন্তু এমন সময় হঠাৎ যদি তাহার প্রভু সেই স্থানে উপস্থিত হন, তখন কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় ! সেই ভীরু ও দুর্ব্বল প্রাণী তখন সাহসী হইয়া উঠে এবং আপনাকে প্রভুর পদদ্বয়ের মধ্যে সুরক্ষিত করিয়া সেই সমুদায় আততায়ীকে তিরস্কার করিতে থাকে।

তবে দেখা যাইতেছে যে কোনও স্থানকে নিরুদ্বেগ শান্তির স্থান মনে করিবার পক্ষে তিনটীর প্রয়োজন। প্রথম, সে স্থানটী তার নিজের স্থান বোধ হওয়া চাই ; দ্বিতীয়, স্থানটী সম্পূর্ণরূপে আশঙ্কা-রহিত হওয়া চাই ; তৃতীয়, সেখানে আত্ম-রক্ষার সদুপায় থাকা চাই। এ জগৎকে আমাদের আত্মার পক্ষে নিরুপদ্রব শান্তির স্থান ভাবিবার পক্ষেও ঐ তিনটীর প্রয়োজন। আমরা কি চক্ষে জগতকে দেখি তাহার উপরে আমাদের শান্তি বা অশান্তি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে বিভিন্ন ধর্ম্মে জগতকে যে বিভিন্ন ভাবে দেখিয়াছে, তাহা স্মরণ হয়। প্রায় সকল প্রাচীন ধর্ম্মেই দেখি তাঁহারা জগৎকে প্রেমের চক্ষে দেখেন না। তাঁহাদের সত্যযুগ পশ্চাতে। তাঁহারা বলেন, জগত এক সময়ে সুখের অবস্থাতে ছিল, তৎপরে সে অবস্থা হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে ; এবং দিন দিন অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে। এখন ঘোর

কলি উপস্থিত সুতরাং জনসমাজের গতি অধোদিকে। এই ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ জগতের বর্ত্তমান জ্ঞান ও সভ্যতার উন্নতির প্রতি কখনই প্রসন্ন-নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে পারেন না। তাঁহারা চক্ষে একপ্রকার দুঃখময় নীল চশ্মা পরিধান করিয়াছেন, যাহাতে মানবভাগ্য সর্ব্বদা দুঃখময় দেখাইতেছেন। যে সকল লক্ষণ দেখিয়া অপরাপর লোকে আনন্দ-ধ্বনি করিতেছে, হয়ত তাঁহারা সেই সকল লক্ষণের মধ্যেই অধোগতি প্রমাণ সকল প্রাপ্ত হইয়া বিষাদে ম্লান হইতে-ছেন। হিন্দুধৰ্ম্ম জন্মান্তর বাদ ও কর্ম্মফলের মত সৃষ্টি করিয়া এই বিষাদময় ভাবকে আরও ঘনীভূত করিয়াছেন। কৰ্ম্মফল-ভোগের জন্যই এই জন্ম এবং অপুনরাবৃত্তিই মুক্তি; সুতরাং এ জগত-বাস কারাবাস এবং জন্মই ঘোর বিড়ম্বনা! এরূপ যাঁহাদের ভাব, তাঁহারা কি প্রকারে এ জগৎকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন? অথবা এখানে থাকিয়া অভয়ধাম লাভ করিতে পারেন? বরং ইহাকে পরিত্যাগ করিলেই তাঁহাদের শান্তি; এই কারণে এরূপ মতের অনিবার্য্য ফলস্বরূপ সন্ন্যাস-ধৰ্ম্ম এদেশে বিকশিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান বিজ্ঞান ইহার বিরোধী ভাব প্রমাণ করিয়াছেন ও প্রচার করিতেছেন। বিজ্ঞানের অতি প্রিয় যে বিবর্ত্তনবাদ তাহা বলে যে, বিবর্ত্তন প্রক্রিয়ার গুণে জড়রাজ্যে বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা, ও কদর্য্যতার মধ্যে সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটি হইতেছে এবং মানবরাজ্যে বর্ব্বরতা ঘুচিয়া সভ্যতার অভ্যুদয় হইতেছে এবং সেই সঙ্গে উন্নত ও আধ্যাত্মিক ভাব সকল মানব-হৃদয়ে

আধিপত্য করিতে আরম্ভ করিতেছে। ঐতিহাসিক গবেষণা ও ভূতত্ত্ববিদ্যার আলোচনা প্রভৃতির দ্বারা জগতের সভ্যতার বিকাশের ক্রম সকল নির্দ্দিষ্ট, হইয়াছে। এখন আর বলিবার উপায় নাই যে সত্যযুগ পশ্চাতে তবে প্রাচীন ও অতীতের প্রতি লোকের যে অতিরিক্ত অনুরাগ; তাহার একটা কারণ আছে। মানুষ যখন অতীতের সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করে, তখন সেই তুলনার বিচারে অতীতকে অধিক সুন্দর দেখিবার কথা। মানুষের যে বর্ত্তমানের জ্ঞান, তাহা প্রতিদিনের জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। কিন্তু সে অভিজ্ঞতার মধ্যে সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য নানবিধ সামগ্রী আছে। বর্ত্তমানে যেমন পাঁচটা সাধু দৃষ্টান্ত দেখিতেছি তেমনি অসংখ্য অসাধু দৃষ্টান্তওদেখিতেছি, যেমন দশজনের ব্যবহারে সুখ পাইতেছি, তেমনি অপর দশজনের ব্যবহারে দুঃখ পাইতেছি; সুতারং বর্ত্তমান বলিলেই সে সমুদায় আমাদের স্মৃতি-পথে আরূঢ় হয়; জনসমাজের চতুর্দ্দিকের পাপ তাপের কথা স্মরণে আসে; জাল, জুয়াচুরি, প্রবঞ্চনা, হত্যা, প্রভৃতি যাহা কিছু প্রতিদিন দেখিতেছি ও শুনিতেছি সে সমুদায়ই মনে হয়। এ সকলকে পরিহার করিয়া আমরা বর্ত্তমানের চিন্তা করিতে পারি না। কিন্তু অতীত কালের বিষয়ে আমাদের যে জ্ঞান আছে, তাহা কিরূপ? তাহা সাহিত্য বা ইতিহাসলব্ধ, না হয় জনশ্রুতিলব্ধ। কিন্তু মানুষ কিরূপ কথা সাহিত্য বা ইতিহাসে লিখিয়া রাখে? অথবা জনশ্রুতিতে বলে? যাহা স্মরণীয়, যাহা কীর্ত্তনীয়, যাহা চিন্তনীয়,

যাহার স্মরণে ও চিন্তনে সুখ, তাহাই লোকে রক্ষা করিবার উপযুক্ত মনে করে এবং তাহাই সাহিত্যে বা ইতিহাসে নিবদ্ধ করে। প্রাচীন বা অতীতের জ্ঞান বলিলে এই সকলকে বুঝায়। যদি এই গুলির সহিত পাপতাপ-সম্বলিত বর্ত্তমানের তুলনা করা যায়, তাহা হইলে স্বভাবতঃই কি অতীতকে উৎকৃষ্টতর বোধ হইবে না? অতএব সত্যযুগ পশ্চাতে এ বিশ্বাসের একটা স্বাভাবিক কারণ আছে, তাহা না হইলে ইহা সকল ধর্ম্মের মধ্যে ফুটিত না।

আমরা এই উভয় প্রকার ভাবে সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছি। প্রশ্ন এই, আমরা জগতকে কি ভাবে দর্শন করিব? ইহা বিদেশ ও বিভূমি, নানা প্রকার আশঙ্কাতে আকুল, এবং সহায় ও রক্ষক-বিহীন এই ভাবে দেখিব? কি, ইহা আমাদের নিজের স্থান, এখানে আমরা সুরক্ষিত, এবং এখানকার কর্ত্তা যিনি তিনি আমাদিগকে নিরাপদে রক্ষা করিতে সমর্থ—এই ভাবে দেখিব?

এই প্রশ্ন মনে উঠিলেই প্রেমের আশ্চর্য্য শক্তির কথা স্মরণ হয়। প্রেম এমনি বস্তু, ইহা যাহাকে স্পর্শ করে, তাহার প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়। যে এখন আপনাকে শ্মশানে পতিত বলিয়া ভাবিতেছে, অথবা কারার বন্দী বলিয়া অনুভব করিতেছে, একবার প্রেম পদার্পণ করুক, অমনি সে প্রমুক্ত বিহঙ্গমের ন্যায় স্বাধীনতা-সুখ অনুভব করিবে এবং সে স্থানকে নিজের স্থান বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিবে। যে পক্ষী পিঞ্জরে আবদ্ধ হইবার সময় স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য

বিবিধ প্রকারে প্রয়াস পাইয়াছিল, সে একবার পোষ মানুক অর্থাৎ গৃহস্থকে ভাল বাসিতে আরম্ভ করুক, তৎপরে দেখিবে সে আপনি আপনার পিঞ্জরে আসিবে। এতৎসম্বন্ধে ইতিবৃত্তে একটি বিচিত্র আখ্যায়িকা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মক্কানগরে আবু সেফিয়ান নামে মহম্মদের একজন প্রবল শত্রু ছিলেন। মহম্মদ মদিনাতে পলায়ন করিবার পরেও ঐ ব্যক্তির শত্রুতার বিরাম হয় নাই। তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মহম্মদের বিনাশ সাধনার্থ যুদ্ধযাত্রা করিলেন। অবু সোফিয়ানের পত্নী ও কন্যা মহম্মদের প্রতি এমনি বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন যে তাঁহারা মহম্মদের মৃত্যু দেখিবার আশায় সেই সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে আর এক প্রকার ঘটিল। মহম্মদ পরাজিত না হইয়া আবু সোফিয়ান পরাজিত হইলেন। আবু সোফিয়ানের সৈন্যদল যখন বিদ্রাবিত হইয়া পলায়ন করিল, তখন তাঁহার কন্যা মহম্মদের অনুচরবর্গের হস্তে বন্দীকৃতা হইলেন। এই সংবাদ কর্ণগোচর হইবামাত্র মহম্মদ তাঁহাকে রাজকন্যোচিত সম্মান প্রদর্শন করিবার আদেশ প্রচার করিলেন। তদনুসারে তিনি রাজকন্যার ন্যায় সম্ভ্রমে ও যত্নে সুরক্ষিতা হইতে লাগিলেন। তাঁহার পরিচর্য্যার জন্য দাস দাসী নিযুক্ত হইল; এবং তাঁহার ইচ্ছা সম্পাদন করিবার জন্য শত শত ব্যক্তি ব্যগ্র হইয়া রহিল। কিন্তু তথাপি ঐ রমণী আপনাকে হতভাগিনী জানিয়া সর্ব্বদাই আর্ত্তনাদ ও শিরস্তাড়ন করিতে লাগিলেন। রাজযোগ্য সম্মান তাঁহার বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে কিছুকাল গত

হইলে ক্রমে মহম্মদ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি ও অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। কিছুদিনের আলাপ ও পরিচয়ের পরেই মহম্মদের প্রতি তাঁহার এমনি অনুরাগ জন্মিল যে তিনি তাঁহার পত্নীত্বে বৃতা হইতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহাদের বিবাহের প্রায় এক বৎসর পরে আবু সোফিয়ান সন্ধি-প্রার্থী হইয়া মেদিনা নগরে স্বীয় কন্যার ভবনে উপস্থিত হইলেন। তখন কন্যার গৃহে একটি সামান্য মাদুর বিছান ছিল। মহম্মদ ঐ মাদুরে বসিতেন। আবু সোফিয়ান মাদুরটিতে বসিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে কন্যা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দৌড়িয়া আসিলেন; বলিলেন—"ও বাবা! কর কি ঈশ্বর-প্রেরিত মহাজনের আসনে বসিও না, তোমাকে স্বতন্ত্র আসন দিতেছি।" কি ঘোর পরিবর্ত্তন! কোথায় মহম্মদের মৃত্যুদর্শনার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন, আর কোথায় স্বীয় পিতাকে মহম্মদের আসনে বসিবার উপযুক্ত মনে না করা! কোথায় রাজোচিত পরিচর্য্যাকে বিষবৎ বোধ, আর কোথায় ফকীরাণীর জীবনেও স্বর্গসুখ বোধ! এ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন কেবল প্রেমেরই সাধ্য।

এখন চিন্তা করিয়া দেখি আমরা এজগতকে প্রিয় স্থান মনে করি কি না? প্রত্যেকে নিজ নিজ হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখুন জীবন কি মিষ্ট বোধ হইতেছে না তিক্ত লাগিতেছে? এজীবনটা কি কারাবাস না পিতার গৃহে বাস? আমরা ডুবিতে যাইতেছি কি একজন আমাদিগকে তুলিয়া লইতেছেন? সম্মুখে সর্ব্বনাশ আসিতেছে, কি পিতার করুণা আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে?

যাঁহারা বলেন যে এ জগতের আদ্দিকারণ যদি কেহ থাকেন

তবে তিনি নিষ্ক্রিয়; জগতের সুখ দুঃখ ভদ্রাভদ্রের সহিত তাঁহার কোনও সম্পর্ক নাই; তাঁহারা যদি প্রচার করেন যে অমঙ্গলের দিকেই জগতের গতি, তাহা হইলে বরং একদিন শোভা পাইতে পারে, কিন্তু আমাদের ন্যায় যাঁহারা মঙ্গলময় বিধাতার বিধাতৃত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা কিরূপে নৈরাশ্যের শাস্ত্র অবলম্বন করিবেন? ঈশ্বর আছেন ইহা যদি সত্য হয়, এবং তিনি মঙ্গলময় বিধাতা ইহাও যদি সত্য হয়, তবে আমরা তাঁহার মঙ্গলবিধানের অন্তর্গত ইহাও ত সত্য। আমরা যদি তাঁহার মঙ্গল বিধানের অন্তর্গত তবে তাঁহার এই জগতে বাস করিতে আমাদের ভয় কি? এ যুক্তিও ত বিচার সঙ্গত। কিন্তু বিচার দ্বারা তাঁহার বিধাতৃত্ব স্বীকার করা এক কথা, আর বিশ্বাস-চক্ষে তাহা দর্শন করিয়া তদুপরি আপনার জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করা আর এক কথা। প্রেমই এই বিশ্বাস চক্ষু লাভের প্রধান উপায়। ভক্তির সঞ্চার হইলেই তাঁহার বিধাতৃত্ব অতি নিকটে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা নিশ্চিত যে পরমেশ্বরের প্রতি যতদিন প্রকৃত প্রেম না জন্মিতেছে ততদিন আমরা এ জগতকে আপনাদের স্থান মনে করিতে পারিতেছি না, এবং এখানে নির্ভয় শান্তিতে বাস করিতে পারিতেছি না। প্রেমিকের নিকট যে সকল কথা অতি সহজ ও সুখ-বোধ অপরের নিকট তাহা বহু যুক্তি সাপেক্ষ। প্রেমিক বলেন,— "কি আশ্চর্য্য! পক্ষীর শাবক নিজ কুলায়ে বসিয়া থাকে, যিনি তাহার মাতার মুখ দিয়া তাহাকে আহার দেন, তিনি কি আমার অমর আত্মাকে রক্ষা করিতেছেন না?"

"হংসাঃ শুক্লীকৃতা যেন শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ"—

যিনি হংস সকলকে যথাসময়ে শুক্ল পক্ষের দ্বারা আচ্ছাদন করেন, এবং শুকদিগকে হরিদ্বর্ণ পক্ষাবলির দ্বারা আবৃত করেন," তিনি কি আমার ঐহিক পারত্রিক কল্যাণ বিষয়ে উদাসীন? তাঁহার নিকট একটা পক্ষীর যে মূল্য আছে আমার অমরাত্মার কি সে মূল্য নাই? যাঁহার মঙ্গল নিয়মে চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহমণ্ডলী স্বীয় স্বীয় কক্ষে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিশ্বের কার্য্য সাধন করিতেছে, মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে না, আমি কি সেই জ্ঞান ও প্রেমের দ্বারা সুরক্ষিত নহি? না, না, এমন অবিশ্বাস করিব না, অবিশ্বাসই মহা অপরাধ।" যে হৃদয়ে ঈশ্বর-প্রীতি প্রবল নহে, সে হৃদয় বলিবে এ কি একটা যুক্তি? তিনি পক্ষীর শাবককে রাখিতেছেন বলিয়া তোমাকেও যে রাখিবেন তাহার প্রমাণ কি? প্রেমিক এ প্রশ্নের নিকট নিরুত্তর। তিনি কেবল এইমাত্র বলেন;—"তোমাকে সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারি, আমি জানি আমি সেই প্রেমময়েরই প্রেমের দ্বারা সুরক্ষিত।"

যে প্রেম বিশ্বাসকে উৎপাদন করে, সেই প্রেম মনকে অভয়-ধামে উপনীত করে। প্রেমিক জন আপনাকে সেই মহান অনির্ব্বচনীয়, সর্ব্বগত, ও সর্ব্বমূলাধার পরম শক্তির ক্রোড়ে আশ্রিত দেখিয়া অভয়পদ প্রাপ্ত হন। তখন এ জগত নিজের স্থান মনে হয়; মনে ভয় ভাবনা থাকে না; এবং আত্মা তাঁহার অভয় আশ্রয়ে বলীয়ান হইয়া এখানে শান্তিতে বাস করিতে থাকে।

উপনিষদের পূর্ব্বোক্ত বচনের মধ্যে দেখা যাইতেছে, যে

ঈশ্বরের যে স্বরূপগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে, সে সমুদায়ই অনন্তের ভাব ব্যক্ত করিতেছে। তাঁহার অনন্ত স্বরূপ ধ্যান করিলে মন স্বভাবতঃ তাহা হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়; আপনাকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভাবিয়া অভিভূত হইয়া পড়ে; অথচ ঋষিগণ বলিতেছেন,—সাধক তাঁহাতেই অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন। ইহার অর্থ কি? তাঁহার অনন্ততার সঙ্গে ও আমাদের অভয় লাভের সঙ্গে কি সম্বন্ধ আছে? নিগূঢ়ভাবে চিন্তা করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, যে তাঁহার মহত্ত্ব যখন আমরা' ধ্যান করি এবং যখন দেখি সেই মহানেরই আশ্রয়ে এই জীবনবিন্দু রহিয়াছে, তখন ইহার জন্য আর চিন্তা থাকে না। যে শক্তি সেতুস্বরূপ হইয়া অগণ্য লোক মণ্ডলীকে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ তাহা আমাকেও রাখিতে সমর্থ। এই জ্ঞান হইতেই অভয়ভাব উৎপন্ন হয়।

ধর্ম্ম কি? ও ধার্ম্মিক কে?*

প্রাণোহ্যেষযঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।

আত্মক্রীড়আত্মরতিঃ ক্রিযাবানেষব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।—উপনিষদ।

অর্থ—প্রাণরূপে সকল ভূতে যিনি প্রকাশ পাইতেছেন, সেই পরব্রহ্মকে জানিয়া ধীর ব্যক্তি আর তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কথা কহেন না; তিনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, পরমাত্মাতে রমণ করেন এবং সৎকর্ম্মশীল হয়েন।"—উপনিষদ।

ধর্ম্ম, ধার্ম্মিক, ধার্ম্মিকতা, প্রভৃতি শব্দ আমরা সচারাচর শুনিয়া থাকি, এবং ধার্ম্মিকতা আমাদের সকলেরই আকাঙ্ক্ষার বস্তু। ধার্ম্মিক কাহাকে বলে?—এই প্রশ্নের উত্তর কেহ বিশেষ চিন্তা করিয়া পরিস্কার ভাবে না দিলেও প্রায় সকল সম্প্রদায়ের সকল লোকের মনে ইহার কি প্রকার উত্তর বিদ্যমান আছে; এবং সেই আদর্শ অনুসারে প্রত্যেকেই পরস্পরের বিচার করিতেছে। আমরাও প্রতিদিন তদনুসারে পরস্পরের বিচার করিতেছি। জগতে সচরাচর ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকতা লইয়া যে সকল বিবাদ চলিতেছে, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে তাহাদের অধিকাংশের মনে ধর্ম্মের যে আদর্শটা রহিয়াছে, তাহা উদার নহে। লোকের বাড়ীতে যেমন এক একটী ঠাকুর ঘর থাকে

অধিকাংশ স্থলেই সে ঘরটী অপরাপর ঘর অপেক্ষা ক্ষুদ্র, সেইরূপ এই সকল লোকের ভাব দেখিয়াও বোধ হয় যেন তাঁহারা ধর্ম্মকে জীবনের একটী ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছেন, ধর্ম্ম সমগ্র জীবন ব্যাপ্ত নহে; কিন্তু জীবনের অপরাপর দশ কাজের মধ্যে একটা কাজ। ধর্ম্মের আদর্শ সম্বন্ধে অদ্য পর্য্যন্ত জগতে যত প্রকার বিভিন্ন ভাব দৃষ্ট হইয়াছে, ক্রমে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথম, অনেক লোকের মনের ভাব এই, কতকগুলি বিশেষ বিশেষ মতে বিশ্বাস স্থাপনই ধর্ম্ম। এই ভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের মতের একতার দিকে অতিশয় তীব্র দৃষ্টি। সুতরাং চিন্তার বৈচিত্র্য বশতঃ যদি কাহারও মতের ব্যতিক্রম ঘটে, যদি কেহ দূষিত মত অবলম্বন ও প্রচার করে, তবে আর তাঁহারা সেরূপ লোককে ধার্ম্মিক বলিয়া গণনা করিতে পারেন না। সে ব্যক্তি যদি অশেষ গুণসম্পন্নও হন, তথাপি ইহাঁদিগের নিকট আর তাঁহার আদর থাকে না। যাঁহার মত দূষিত তাঁহার প্রকৃতিও দূষিত এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া, ইঁহারা ঐ বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদিগকে নির্য্যাতন করিতে থাকেন। য়িহুদী, খ্রীষ্টীয় ও মুসলমান ধর্ম্মে এই মতগত ধর্ম্মের প্রাবল্য, সুতরাং ইঁহাদের মধ্যে মত নিবন্ধন নিযাতনের ভাব অত্যধিক মাত্রায় প্রস্ফুটিত হইয়াছে। য়িহুদীগণ যে যীশুকে হত্যা করিয়াছিল, তাহা কি দোষে? তিনি কোন্ গুরুতর দোষ করিয়াছিলেন, যে জন্য একজন দস্যু বা তস্করের ন্যায় প্রাণদণ্ড পাইবার উপযুক্ত হইয়াছিলেন? অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য তিনি যে ভাবে প্রাচীন

কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তিদিগকে আক্রমণ করিতেন, তাহাতে বিপক্ষগণের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবারই সম্ভাবনা; কিন্তু ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে তাহা একমাত্র কারণ নহে। যীশু য়িহুদীদিগের চিরপ্রচলিত মতের বিরোধী কথা বলিয়াছিলেন বলিয়াই য়িহুদীগণ তাঁহার প্রতি জাতক্রোধ হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল। মত বিষয়ক অনুদারতা য়িহুদী ধর্ম্মের একটী প্রধান লক্ষণ। এই লক্ষণ খ্রীষ্টধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্মে সংক্রান্ত হইয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম্মের ইতিবৃত্ত এই মত-প্রধান ধর্ম্মভাবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছে। সামান্য মত-বিরোধের জন্য রোমান কাথলিকগণ শত শত পুরুষ ও রমণীর প্রাণনাশ করিয়াছে; এবং ঈশ্বরানুরাগী, সত্যনিষ্ঠ, মানব-হিতৈষী ব্যক্তিদিগকে দস্যু তস্করের ন্যায় হত্যা করিয়াছে। মহম্মদীয় ধর্ম্মের ত কথাই নাই! এই ধর্ম্মে কাফেরদিগকে হত্যা করা পুণ্য কার্য্যের মধ্যে বিবেচিত হইয়াছে। এখনও জীবন ও চরিত্র অপেক্ষা মত বিশেষে বিশ্বাস স্থাপনের দিকে এতদুভয় ধর্ম্মের অধিক দৃষ্টি দেখা যাইতেছে। এখনও কোনও নবাগত দীক্ষার্থীকে গ্রহণ করিবার সময় খ্রীষ্টীয় বা মহম্মদীয় ধর্ম্মাচার্য্য-গণ সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বপ্রধান রূপে ইহাই দেখিয়া থাকেন যে ঐ ব্যক্তি কতকগুলি প্রচলিত মতে বিশ্বাস করে কিনা? অর্থাৎ যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষার্থী, সে যীশুর ঈশ্বরত্ব, মধ্যবর্ত্তিতা, অলৌকিক জন্ম, পুনরুত্থান, অলৌকিক ভাবে স্বর্গারোহণ, নরকাগ্নির অনন্তত্ব, প্রভৃতি মতে বিশ্বাস করে কিনা? যে মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষার্থী সে একমাত্র অংশি-বিহীন ঈশ্বরে

ও মহম্মদের দৌত্যে বিশ্বাস করে কিনা ? যদি দেখা যায় সে ব্যক্তি ঐ সকল বিশেষ মতে বিশ্বাসী, তাহা হইলেই তৎ তৎ ধর্ম্মের আচার্য্যগণ মনে করেন যে, সে দীক্ষিত হইবার উপযুক্ত। ধর্ম্মের বিচার করিতে গিয়া মতের প্রতি অতিরিক্ত দৃষ্টি রাখাতে জনসমাজের অনিষ্ট হইয়াছে। মানবচিন্তার স্বাধীনতার হ্রাস হইয়াছে ; এবং মানবচরিত্রের উন্নতি হইতে পারে নাই।

দ্বিতীয়, ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেকের ভাব এই যে গ্রন্থ বিশেষে যে সকল বিধি ও নিষেধ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অবহিতচিত্তে তাহার অনুগত হইয়া চলাই ধর্ম্ম। এইভাবে হিন্দুগণ বেদের, খ্রীষ্টীয়গণ বাইবেলের এবং মুসলমানগণ কোরাণের অনুসরণ করিয়া থাকেন। ইহারও অনিষ্ট ফল জগতের ইতিবৃত্তে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। প্রথম অনিষ্ট ফল এই, ইহাতে মানুষের দৃষ্টিকে নিকটস্থ, প্রাণস্বরূপ ও প্রতি মুহূর্ত্তের উপদেষ্টা স্বরূপ ঈশ্বর হইতে তুলিয়া ইতিহাসে ফেলিয়া দিয়াছে। মুক্তিদাতা ঈশ্বর তোমার অন্তরে, প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার পরিত্রাতা হইয়া নিকটে রহিয়াছেন,—এই মহাসত্যের পরিবর্ত্তে পূর্ব্বোক্ত মতাবলম্বিগণ বলিয়া থাকেন, "মানবের পরিত্রাণের জন্য যাহা বলিবার ঈশ্বর তাহা একবার বলিয়া চুকিয়াছেন, এখন যদি, পরিত্রাণ চাও, ইতিহাসের অমুক পৃষ্ঠা অন্বেষণ কর, অমুক গ্রন্থ পাঠ কর।" এইরূপে মানবের পরিত্রাণ গ্রন্থ-সাপেক্ষ হইয়াছে। ধর্ম্ম লাভ করিতে হইলে একটা প্রাচীন ভাষা পড়িতে হইবে ও বিশেষ বিশেষ টীকা-কর্ত্তার শরণাপন্ন হইতে হইবে। এই কারণে, এই মতে একদল

পুরোহিত বা যাজক বা শাস্ত্র-ব্যখ্যাকারের সৃষ্টি ও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। ইঁহারাই কালে দেব ও মানবের মধ্যে মধ্যবর্ত্তী-রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছেন।

তৃতীয়, অনেকের সংস্কার এই যে কতকগুলি লৌকিক আচার অবলম্বন করাই ধর্ম্ম। এই সকল আচার ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম অনেকটা এই ভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তুমি যদি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ সকল কর, বার মাসে তের পার্ব্বণ কর, গো ব্রাহ্মণের সেবা কর, দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতিতে মনোযোগী থাক, পান ভোজনাদি বিষয়ে কৌলিক আচার সকল রক্ষা কর, তাহা হইলেই তুমি ধার্ম্মিক ও নিষ্ঠাবান্ হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইবে। তৎপরে যদি তুমি সামান্য ধন লোভে কোনও বিধবার দুই বিঘা জমি হরণ কর, বা আদালতে মিথ্যা সাক্ষী দেও, বা জাল দলীল প্রস্তুত কর, ইহার কিছুতেই তোমার হিন্দুত্বের লোপ হইবে না। এইরূপ ভাবের যে অনিষ্ট ফল তাহা বর্ণন করাই নিরর্থক, সকলেই তাহা লক্ষ্য করিতেছেন। ইহাতে প্রকৃত সদাচার হইতে দৃষ্টিকে তুলিয়া লৌকিক আচারের উপরেই তাহাকে নিবদ্ধ করে, তদ্দারা সামাজিক নীতির দুর্গতি হয়।

চতুর্থ, অনেকের সংস্কার আত্ম-শাসনের উপায় বিশেষ অবলম্বন করাই ধর্ম্ম। এই ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ আত্ম-নিগ্রহ করিবার জন্য সর্ব্বদা বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন কৃচ্ছ্র সাধন ইঁহাদের চক্ষে অতীব প্রশংসনীয় এবং যেখানে

কৃচ্ছ্র-সাধন নাই, সেখানে ধর্ম্ম নাই, এই ইহাঁদের ভাব। ভারতবর্ষে এই প্রকার ধর্ম্মসাধনের পরাকাষ্ঠা আমরা দেখিয়াছি। এখানকার তপস্বিগণ যে প্রকার দুষ্কর তপস্যা করিয়াছেন ও অনেকে অদ্যাপি করিতেছেন, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় স্তম্ভিত হয়। পঞ্চতপা হওয়া, গজালের শয্যাতে শয়ন করিয়া থাকা, ঊর্দ্ধবাহু হইয়া একখানি হস্ত বিশুষ্ক করিয়া ফেলা, এ সকল আমরা প্রতিদিন লক্ষ্য করিতেছি। যাঁহারা এতদূর না যাইতেছেন, তাঁহাদেরও অনেকে চিত্তের একাগ্রতা সাধনের জন্য মন্ত্রজপ, প্রাণায়াম, কুম্ভক প্রভৃতি অভ্যাস করিয়া থাকেন। কৃচ্ছ্র সাধনের ধর্ম্মের প্রধান অনিষ্ট ফল এই যে, ইহাতে আধ্যাত্মিক অহঙ্কার বা ধর্ম্মাভিমান উৎপন্ন করে। হৃদয়ে অকপট ঈশ্বর-প্রীতি থাকিলে যে স্বার্থত্যাগ, বা যে বৈরাগ্য স্বাভাবিক ভাবেই উৎপন্ন হয়, তাহা ধর্ম্মবোধে আচরণ করাতে আচরণকারীদিগের অন্তরে ধর্ম্মাভিমান উদ্দীপ্ত করে। তাঁহারা মনে করিতে থাকেন, তাঁহারাই ধার্ম্মিক, তাঁহারাই কৃচ্ছ্র-সাধন করিয়া থাকেন।

পঞ্চম, অনেক সম্প্রদায়ের সংস্কার এই, ভাবের চরিতার্থতাই ধর্ম্ম। ইহাঁরা সর্ব্বদা ভাবের উচ্ছ্বাসের দ্বারা আপনার প্রেম ও ভক্তির বিচার করিয়া থাকেন। যদি হৃদয় ভাবে গদ গদ হয়, উচ্ছ্বাসে অধীর হয়, মানুষ নৃত্য করে ও গড়াগড়ি দেয়, তবেই ইহাঁরা সন্তুষ্ট হইয়া মনে করেন যে ধর্ম্মে অনেকটা অগ্রসর হওয়া যাইতেছে। এই ভাবুকতা-প্রধান ধর্ম্মে এক প্রকার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দুর্ব্বলতা উৎপন্ন করে, যাহা

অতীব শোচনীয়! ইহার অনিষ্ট ফল এতদ্দেশে বিবিধ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হইতেছে।

এস্থলে এ কথা বলা আবশ্যক যে মত, গ্রন্থ, লৌকিক আচার, আত্মনিগ্রহ এবং ভাবোচ্ছ্বাস, প্রভৃতি কিছুই ধর্ম্ম-সাধনার্থীর পক্ষে উপেক্ষণীয় নহে। ধর্ম্মজীবন গঠনের পক্ষে সকলেরই প্রয়োজনীয়তা আছে। যেমন অন্তঃস্থিত অস্থিময় দেহ ভিন্ন এই স্থূল রক্ত মাংসময় দেহ দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না, তেমনি কতকগুলি সুচিন্তিত, সুনির্দ্দিষ্ট মতে দৃঢ় বিশ্বাস ব্যতীত কোনও ধর্ম্মসমাজ বা ধর্ম্মসাধন-প্রণালী দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না। কিন্তু তাহা বলিয়া কেবল অস্থি সকলকে দেহ বলিলে যেরূপ ভ্রম হয়, কেবল মতকে ধর্ম্ম বলিলেও সেই ভ্রম হয়।

এইরূপ জগতের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল যে মানবের ধর্ম্মজীবন গঠন বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। অদ্যাপি কোটি কোটি খ্রীষ্টীয় নরনারীর মনের উপরে বাইবেলের যে শক্তি রহিয়াছে, এবং কোটি কোটি মুসলমান পুরুষ ও রমণীর মনে কোরাণ যে কার্য্য করিতেছে, তাহা স্মরণ করিলে বিস্মিত ও স্তব্ধ হইতে হয়। খ্রীষ্টীয় প্রোটেষ্টাণ্ট ইংলণ্ডের হস্ত হইতে বাইবেল কাড়িয়া লও, পদ্ম ছিড়িলে মৃণাল যেরূপ জলে ডুবিয়া যায়, ঐ সকল খ্রীষ্টীয়ের মন সেইরূপ ঘোরান্ধকারে নিমগ্ন হইবে। আর ইহাও সহজে অনুভব করা যায় যে এই সকল ধর্ম্মগ্রন্থ ধর্ম্মসাধনার্থিদিগের গভীর শ্রদ্ধার বস্তু হওয়া উচিত; কারণ শাস্ত্র আর কিছুই নহে, মানবের সঞ্চিত

জ্ঞান-ভাণ্ডার। বিধাতা যুগে যুগে যে সকল সত্য অভিব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার অনেকগুলি ঐ গ্রন্থে সঞ্চিত আছে। কিন্তু এতদূর স্বীকার করিয়াও এটা বলিতে হয় যে কোন ধর্ম্মগ্রন্থ বিশেষের অনুগত হওয়া ধর্ম্ম নহে।

লৌকিক আচার প্রভৃতি সম্বন্ধেও ঐ প্রকার। তাহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে ধর্ম্মজীবনের সহায় হইলেও কেহ ধর্ম্মের সমগ্র স্থান অধিকার করিতে পারে না। ধর্ম্ম এরূপ কোনও আংশিক পদার্থ নহে। ধর্ম্ম কি? তাহা যদি কেহ আমাকে সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিতে বলেন, তাহা হইলে বলি, মানব প্রকৃতির যে ঈশ্বরাভিমুখীন উচ্ছ্রায় তাহার নাম ধর্ম্ম। এই উচ্ছ্রায় শব্দটীর ব্যখ্যার প্রয়োজন। উচ্ছ্রায় শব্দের অর্থ উন্নতি। ইহার একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ভূ-তত্ত্ববিৎপণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যে পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ তাপের প্রভাবে ভূপৃষ্ঠ উচ্ছ্রিত হইয়া উঠিয়া পর্ব্বত, অধিত্যকা উপত্যকা, গ্রাম জনপদ প্রভৃতি জীবের বাসোপযোগী জগৎ প্রকাশ পাইয়াছে। সেইরূপ যে ঈশ্বরানুরাগের প্রভাবে সমস্ত মানব প্রকৃতি সমুন্নত হইয়া উঠে, জ্ঞান, প্রীতি, ইচ্ছা সকলি উন্নত হয়, তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম মানবজীবনের এক অঙ্গের বস্তু নহে, এক দিনের কাজ নহে। একজন দুই ঘণ্টাকাল কোনও বিশেষ স্থলে বদ্ধ হইয়া কোনও বিশেষ নাম জপ করিল, সেইটুকু তাহার ধর্ম্ম হইল, তৎপরে বিষয় কার্য্যে গেল, সে তাহার বিষয় কার্য্য; সেখানে ধর্ম্মের কিছু নাই এরূপ নহে; বরং এই কথা বলিলেই প্রকৃত সত্য বলা হয়,

যে সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বাবস্থাতে, জ্ঞান, প্রীতি ও ইচ্ছাযোগে ঈশ্বরের সহিত নিত্যযুক্ত থাকিতে পারাই ধর্ম্ম।

ধর্ম্মের এই মহৎ ও উদার ভাব ব্যক্ত করিবার জন্যই পূর্ব্বোক্ত উপনিষদের বচন উদ্ধৃত করা গিয়াছে। এই বচনে ধার্ম্মিকের দ্বিবিধ লক্ষণের উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে। প্রথম আধ্যাত্মিক; দ্বিতীয় লৌকিক। আধ্যাত্মিক লক্ষণ এই, প্রকৃত ধার্ম্মিকের আত্মা আত্মক্রীড় এবং আত্মরতি হয় অর্থাৎ তিনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন ও পরমাত্মাতে রমণ করেন। পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, এ কথার অর্থ কি? মৎস্য যেমন জলে ক্রীড়া করে, অর্থাৎ জলকেই আপনার প্রকৃত বাসস্থান বলিয়া অনুভব করে, তেমনি প্রকৃত ধার্ম্মিকের আত্মাও ঈশ্বরের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনে আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। ঈশ্বর সত্যস্বরূপ অতএব এরূপ আত্মা সত্যের চিন্তনে আনন্দ পায়; ঈশ্বর ন্যায়স্বরূপ, সুতরাং ন্যায়ের আচরণে আনন্দ পায়, এবং প্রেম পবিত্রতার অনুশীলনে আনন্দ পায়। এই হইল অন্তরের লক্ষণ। বাহিরের লক্ষণ দ্বিবিধ, সে রূপ ব্যক্তি ঈশ্বরকে অতিক্রম করিয়া কথা কহেন না। ঈশ্বরকে অতিক্রম করিয়া কথা কহার অর্থ কি? অর্থ এই,—তিনি এমন কথা কহেন না বা এমন কাজ করেন না, যাহা ঈশ্বরকে না ভুলিলে বলা বা করা যায় না। সংক্ষেপে বলিতে গেলে সে রূপ ব্যক্তির জীবনে ধর্ম্মভীরুতা স্বাভাবিক হয়। অধর্ম্মকে তিনি সর্ব্বদা বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় লৌকিক লক্ষণ। তিনি

সৎকর্ম্মশীল হন। লতাতে যেমন পুস্প যথাসময়ে স্বাভাবিক ভাবে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে তেমনি প্রকৃত ধার্ম্মিকের চরিত্রে সদনুষ্ঠান সকল স্বভাবতঃ প্রস্ফুটিত হয়। একটা সত্য আমাদিগকে সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে প্রকৃত ধর্ম্মের গতি পরিধি হইতে কেন্দ্রের দিকে নহে; কিন্তু কেন্দ্র হইতে পরিধির দিকে। যেমন বৃক্ষের মূল কর্ত্তন করিয়া কেবল শাখা প্রশাখাতে জলসেচন পূর্ব্বক বৃক্ষকে জীবিত রাখা যায় না, সেইরূপ ঈশ্বরানুরাগের পথে না গিয়া লৌকিক নীতির অনুসরণ ও লৌকিক আচারের আচরণাদি দ্বারা ধর্ম্মকে লাভ করা যায় না। জাগ্রত ঈশ্বর-প্রীতি হৃদয়ে বাস করিলে তাহা স্বভাবতঃ যেরূপে বাহিরের চরিত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার নাম ধর্ম্মজীবন। এই ধর্ম্মজীবন আংশিক নহে; কোনও কাল বিশেষে বা কার্য্য বিশেষে বদ্ধ নহে, ইহা সমগ্র জীবন-ব্যাপী। ইহা অশনে বসনে শয়নে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ইতিবৃত্তের এই এক গূঢ় রহস্য, যে সকল ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাত্মার নাম অবগত আছি, যাঁহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে মানবকুলে মহাবিপ্লব ঘটাইয়াছেন, তাঁহারা কেহই ধার্ম্মিকের বেশ ধারণের জন্য বা ধার্ম্মিকতার খ্যাতি লাভের জন্য ব্যগ্র ছিলেন না। তাঁহারা ধর্ম্মসাধন বলিয়া স্বতন্ত্র একটা কিছু করিতেন না, অথচ উঠিতে বসিতে শুইতে জাগিতে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হইত। ধর্ম্ম যেন তাঁহাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে ছিল; যেন চক্ষের দৃষ্টিতে ছিল; যেন মুখের হাস্যে ছিল, এইরূপ ঈশ্বর-প্রীতির সর্ব্বগ্রাসিতা ও স্বাভাবিকতাই ধর্ম্ম।

ঈশ্বর-লাভে নিপুণতা।

"শ্রবণয়াপি বহুভি র্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যন্ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ।"

অর্থ—"শুনিবার উপায়াভাবে অনেকে যে পরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে না, শুনিয়াও অনেকে যাঁহাকে চিনিতে পারে না, তাঁহার বিষয়ে সম্যক্ উপদেশ করিতে পারে এরূপ বক্তা দুর্লভ; নিপুণ ব্যক্তিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে, নিপুণরূপে অনুশিষ্ট ব্যক্তিই তাঁহাকে জানিতে পারে, কিন্তু সেরূপ ব্যক্তিও দুর্লভ।"

পদার্থতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, সকল পদার্থের উপরেই সূর্য্যের তাপ পতিত হয়, কিন্তু সকল পদার্থ সমানভাবে সে তাপকে গ্রহণ করিতে পারে না। উপলখণ্ড যত শীঘ্র ও যে পরিমাণে উত্তপ্ত হয়, মৃৎপিণ্ড তত শীঘ্র ও সে পরিমাণে উত্তপ্ত হয় না। আবার মৃত্তিকা যত শীঘ্র উত্তপ্ত হয়, জলরাশি তত শীঘ্র উত্তপ্ত হয় না। পদার্থ সকলের মধ্যে তাপ-ধারণা-শক্তির যেরূপ তারতম্য দেখি, জ্ঞানের ধারণা সম্বন্ধেও যেন সেই প্রকার তারতম্য লক্ষিত হয়। একই সময়ে, একই প্রণালীতে দশ ব্যক্তি পাঠ করে, কিন্তু ফলে কত তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়! এই তারতম্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই একজন সংস্কৃত কবি বলিয়াছেন;—

"বিতরতি গুরুঃ প্রাজ্ঞে বিদ্যাং যথা তথৈব জড়ে,
নতু খলু তয়ো র্জ্ঞানে শক্তিং করোত্যপহন্তি বা।
ভবতি চ পুন র্ভূয়ান্ ভেদঃ ফলং প্রতি, তদ্যথা
প্রভবতি শুচি র্বিম্বোদ্গ্রাহে মণি র্ন মৃদাং চয়ঃ॥"

অর্থ—গুরু প্রাজ্ঞ এবং মন্দমতি উভয় ছাত্রকেই বিদ্যা বিতরণ করিয়া থাকেন, তিনি কাহাকেও বুদ্ধিবৃত্তি দেন না, বা কাহারও বুদ্ধিবৃত্তি হরণ করেন না; অথচ ফলে মহৎ প্রভেদ লক্ষিত হয়, যেমন পরিশুদ্ধ মণিই বস্তু সকলের প্রতিবিম্বকে গ্রহণ করিতে পারে, মৃৎপিণ্ড তাহা পারে না।"

বাস্তবিক এই জ্ঞানের ধারণা-শক্তির তারতম্য আমরা প্রতিদিন লক্ষ্য করিতেছি। জ্ঞানের উপকরণ সামগ্রী সকলেরই নিকটে সর্ব্বদা বিদ্যমান। জগতে যতই জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি, শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ, বিষয় বাণিজ্যের বিস্তার, সম্পদ ঐশ্বর্য্যের শ্রীবৃদ্ধি ও সুখ সভ্যতার প্রসার হউক না কেন, তাহার এক কণিকাও মানুষ আপনি সৃষ্টি করে নাই, বা স্বর্গ হইতে আনে নাই। যে সকল উপকরণ ও উপাদান লইয়া ঐ সমুদায়ের উন্নতি সাধিত হইয়াছে ও অদ্যাপি হইতেছে, তৎসমুদায় এই জগতে, তোমার আমার হাতের নিকট চিরদিন ছিল ও চিরদিন রহিয়াছে। কলিকাতার ন্যায় একটী সহরে কত প্রাসাদ আছে একবার চিন্তা কর, এ সকল প্রাসাদে কত ইষ্টক, কত প্রস্তর, কত দ্বার গবাক্ষ, টেবল, চেয়ার প্রভৃতি কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্রব্য, কত ধাতুজ দ্রব্য, আছে একবার মনে মনে গণনা কর, কত গৃহ কত পণ্য দ্রব্যে পূর্ণ একবার বিবেচনা কর, তৎপরে জগতে

এরূপ কত সহর আছে তাহা স্মরণ কর, সমুদ্রবক্ষে ভিন্ন ভিন্ন জাতিদিগের কত শত সহস্র অর্ণবপোত ভাসিতেছে তাহা চিন্তা কর, এই সমগ্র ছবিটী হৃদয়ে ধারণ করিবার চেষ্টা করিলে জগতের সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির কি অদ্ভূত ভাব হৃদয়ে উপস্থিত হয়! কিন্তু এই বিচিত্র ও অত্যাশ্চর্য্য শ্রীবৃদ্ধির মধ্যে এমন কোন্ দ্রব্য আছে, যাহা মানব সৃষ্টি করিয়াছে বা স্বর্গ হইতে আনিয়াছে? প্রান্তরের মৃত্তিকা, পর্ব্বতের প্রস্তর, বনের কাষ্ঠ, খনির ধাতু একত্র করিয়াই এই অদ্ভুত লীলা বিস্তার করিয়াছে এবং অদ্যাপি করিতেছে। তাই বলিতেছি, মানবের সর্ব্ববিধ উন্নতির উপকরণ সামগ্রী সর্ব্বদা আমাদের নিকটে বিদ্যমান। সক্রেটীস্, বুদ্ধ, কংফুচ প্রভৃতি প্রাচীনকালে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিদিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা যে সকল উপকরণ সামগ্রীর সাহায্যে সে জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা এখনও তোমার আমার নিকটে বিদ্যমান। সেইরূপ দিবারাত্রের পরিমাণ প্রাচীন ও আধুনিক, জ্ঞানী ও অজ্ঞ সকলেরই পক্ষে ২৪ ঘণ্টা; কাহার পক্ষে ন্যূন বা কাহার পক্ষে অধিক নহে। একজন সেই সকল উপকরণ সামগ্রীর ও সেই চব্বিশ ঘণ্টার সমুচিত ব্যবহার করিয়া জ্ঞানী, পণ্ডিত, কৃতী ও যশস্বী হইতেছে, অপর একজন ঐ সকলের সমুচিত ব্যবহারের অভাবে, অজ্ঞ, মূর্খ ও অবজ্ঞার পাত্র হইয়া পড়িয়া থাকিতেছে। বর্ত্তমান সভ্য জগতের জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি যতই বিস্ময়জনক হউক না কেন, তাহার এক অক্ষরও ঈশ্বর-প্রদত্ত দুই মহাগ্রন্থকে অতিক্রম করিয়া যায় নাই। সে দুই মহাগ্রন্থ এই জগৎ ও মানব-প্রকৃতি। এই দুই

মহাগ্রন্থ সর্ব্বদা সকলেরই চক্ষের সমক্ষে প্রসারিত রহিয়াছে। সকল জ্ঞানের তত্ত্ব ইহার মধ্যেই আছে। গ্রন্থ বা শাস্ত্র আর কিছুই নহে, বিভিন্ন জাতির সুধীগণ এই উভয় গ্রন্থের মধ্যে যে সকল তত্ত্বকথা পাঠ করিয়াছেন, তাহাই মসী লেখনীর সাহায্যে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বর-প্রদত্ত উক্ত উভয় মহাগ্রন্থে পাণ্ডিত্য লাভ করিবার জন্য যে সকল স্থলেই মানব-প্রণীত বিবিধ গ্রন্থ ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করা প্রয়োজন হইয়াছে তাহাও নহে। জগতে এরূপ অনেক লোক দেখা গিয়াছে, যাঁহারা বিদ্বান ছিলেন না, কিন্তু জ্ঞানী ছিলেন। বুদ্ধ, যীশু বা মহম্মদ ইহাঁরা বিদ্যার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই, কিন্তু জ্ঞানের জন্য চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ইহাঁদের জ্ঞান কোথা হইতে উৎপন্ন হইল ? ইহাঁরা সাক্ষাৎ ও অব্যবহিতভাবে জগৎ ও মানব-প্রকৃতিরূপ উক্ত দুই মহাগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। একটু নিগূঢ়ভাবে চিন্তা করিলেই দৃষ্ট হইবে যে সাক্ষাৎ ও অব্যবহিতভাবে জগৎ ও মানব-প্রকৃতিকে অধ্যয়ন করিবার যে শক্তি, তাহাকে বিকাশ করিবার উদ্দেশেই অধ্যয়ন ও বিদ্যার প্রয়োজন ; এবং সেই জন্য জ্ঞানিগণ গ্রন্থ সকল রচনা করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেক লোকের এরূপ শোচনীয় দশা দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাদের বিদ্যা তাহাদের জগৎ ও মানব-প্রকৃতির দর্শনের শক্তিকে বিকাশ না করিয়া তাহাদের বুদ্ধিকে আরও জড়ীভূত করিয়া দেয়। এই সকল লোক অবশেষে পণ্ডিত-মুর্খ-শ্রেণীগণ্য হইয়া থাকে।

জ্ঞান-রাজ্যে যেমন এক শ্রেণীর পণ্ডিত-মুর্খ আছে, যাহারা

পরের কথা মুখস্থ করিয়াছে, ও পরের কথাই চিরদিন বলিতেছে জ্ঞানের বা সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করে নাই, তেমনি ধর্ম্মরাজ্যেও এক শ্রেণীর পণ্ডিত-মূর্খ আছে, যাহারা অনেক গুরুর সেবা করিয়াছে, অনেক ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িয়াছে, অনেক কথা বলিতে পারে, কিন্তু বিমল সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করে নাই। যেমন জগৎ ও মানব প্রকৃতির নিকটে সাক্ষাৎভাবে উপনীত করিবার জন্যই গ্রন্থের রচনা ও গ্রন্থকারদিগের প্রয়াস, তেমনি ঈশ্বর-চরণে মানবকে সাক্ষাৎভাবে উপনীত করিবার জন্যই ধর্ম্মশাস্ত্রের সৃষ্টি ও সাধু মহাত্মাদের উপদেশ। কিন্তু অনেক পণ্ডিত-মূর্খ ব্যক্তি চিরদিন ঐ সকল আদেশ ও উপদেশের মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকে, চিরদিন পরের অভিজ্ঞতার কথা বলিতে থাকে, চিন্তাবিহীন হইয়া নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুসরণ করে, ঈশ্বর-চরণে আর সাক্ষাৎভাবে উপনীত হয় না।

ইহা দেখিয়াই ঋষিগণ বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের প্রকৃত জ্ঞাতা দুর্লভ এবং নিপুণ ব্যক্তি ভিন্ন অপরে তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না।" এই নিপুণতার প্রকৃতি কি? কি সেই বিশেষ সদ্‌গুণ, যাহা থাকিলে মানুষ তাঁহাকে লাভ করিতে সমর্থ হয়? বিদ্যার্থীদিগের মধ্যে কোন্ বিশেষ নিপুণতা থাকাতে একজন বিদ্বান ও কৃতী হইয়া উঠে, এবং যাহার অভাবে অপর ব্যক্তি তাহার সহাধ্যায়ী হইয়াও অজ্ঞ ও অক্ষম হইয়া পশ্চাতে পড়িয়া থাকে? সাধারণ ভাবে এই বলা যায় এক ব্যক্তি এমন একটু বিদ্যার রসাস্বাদন করিয়াছিল, যাহাতে তাহার চিত্ত সর্ব্বদাই বিদ্যালাভের জন্য লালায়িত ছিল। সে ব্যক্তি সর্ব্বাবস্থাতে

বিদ্যারই অনুসরণ করিয়াছে এবং আপনার চিত্তকে কখনই অন্য কোনও দিকে নীত হইতে দেয় নাই। ঈশ্বর বিষয়ে এরূপ চিত্তের একাগ্রতা হইলে মানুষ ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারে।

যে বিষয়কে মানুষ সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান মনে করে সেই বিষয়েরই জন্য তাহার চিত্তের একাগ্রতা উপস্থিত হয়। এ জগতে সকলে সকল বিষয়কে মূল্যবান মনে করে না। কৃপণ ধনকে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান জ্ঞান করিয়া থাকে, কিন্তু সুখপ্রিয় বিলাসী ধন অপেক্ষা বিলাস-সুখকে প্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকে। কিন্তু রুচি প্রবৃত্তি ও শিক্ষার তারতম্য নিবন্ধন প্রার্থনীয় বিষয় সম্বন্ধে লোকের ভাবের বৈচিত্র্য থাকিলেও এ কথা সকলের পক্ষে খাটে যে যে যাহাকে মূল্যবান মনে করে, তাহার লাভ ও রক্ষার জন্য সে একাগ্রচিত্ত হয়। ইহা আমরা জনসমাজে নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি। যে ব্যক্তি ধনাগমের প্রত্যাশায় এই সহরে আসিয়া বাণিজ্য করিতেছে, এবং সেই কারণেই এখানে বাস করিতেছে, ধনাগমের উপায়ের প্রতি তাহার কেমন সজাগ দৃষ্টি, কেমন একাগ্র চিত্ত। সে ব্যক্তি অন্যান্য কাজও করে, অপরাপর চর্চ্চাতেও যোগ দেয়, সহরের অপর দশজনের ন্যায় আমোদ প্রমোদও করিয়া থাকে, কিন্তু একটী বিষয় আছে, যেদিকে তাহার চিত্ত একাগ্র, যে বিষয়ে সে কখনই উদাসীন নহে, কখনও অমনোযোগী নহে—তাহা ধনোপার্জ্জন। ইহা তাহার লক্ষ্য অপর সমুদায় উপলক্ষ্য। সে যদি যথার্থ নিপুণ বণিক হয় তাহা হইলে যাহাতে ধনাগমের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা এরূপ কার্য্যে কখনই অগ্রসর হয় না; উপলক্ষ্যের জন্য

লক্ষ্যকে নষ্ট করে না। এইরূপে চতুর ও নিপুণ ব্যক্তিরাই সকল বিভাগে স্বীয় স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া লয়।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে নূতন নিয়ম কিছুই নাই। চতুর বিষয়ী বিষয়কে যেরূপে দেখে ও রক্ষা করে, ধর্ম্মকে সেই ভাবে যিনি দেখেন ও রক্ষা করেন তিনিই ধার্ম্মিক। ধর্ম্মকে যদি সেইরূপ মূল্যবান মনে হয়, তাহা হইলে লোকে ইহার জন্যও একাগ্রচিত্ত হয়। কিন্তু ধর্ম্মের বিষয় যত লোকে শ্রবণ করে, ধর্ম্মের বাহ্য সাধনে যত লোক নিযুক্ত থাকে, তাহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি ঈশ্বরকে এইরূপ মহামূল্য ধন বলিয়া অন্বেষণ করে। ইহা দেখিয়াই ঋষিগণ বলিয়াছেন—"তাঁহার প্রকৃত জ্ঞাতা দুর্ল্ভ এবং নিপুণ ব্যক্তি ভিন্ন অপরে তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না।"

ইহার মধ্যে আর একটী কথা আছে। চিত্তের একাগ্রতার পক্ষে ধর্ম্মকে ও ঈশ্বরকে মহামূল্য জ্ঞান করা যেমন প্রয়োজন, তেমনি অনুরাগের যোগ থাকাও আবশ্যক। অনুরাগের যোগ ভিন্ন মানুষ ধর্ম্মসাধনে আনন্দের আস্বাদন পায় না। আনন্দের আস্বাদন না পাইলেও চিত্তের পূর্ণ একাগ্রতা হয় না। অনুরাগের যোগ হইলেই সাধন সংক্রান্ত সমুদায় ব্যাপার মানুষের মিষ্ট লাগিতে থাকে। মন তখন পরের অভিজ্ঞতার ভার বহন করিয়া তৃপ্ত না থাকিয়া সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বর-চরণে উপনীত হইবার জন্য ব্যাকুল হয়। প্রেমের আকাঙ্ক্ষা অসীম। প্রেম প্রেমাস্পদকে নিকটে ও প্রাণে না পাইলে সুস্থির হইতে পারে না। প্রেমের পক্ষে পরোক্ষ ধর্ম্ম অসহনীয় ও অসম্ভব।

প্রেম ও সাক্ষাৎকারের ধর্ম্ম যাঁহারা প্রাপ্ত হন, তাঁহারাই ধর্ম্মের স্থিরভূমি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেটুকু তাঁহাদের নিজস্বভূমি হয়, আর কেহ তাঁহাদিগকে সে ভূমি হইতে বিচলিত করিতে পারে না; তাঁহাদের ধর্ম্ম আর লোকের মুখের উপর বা গ্রন্থের উপর থাকে না; তাহা সত্যজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং তাঁহাদের ধর্ম্মসাধনের মধ্যে সত্যতা, সারবত্তা, ও স্বাভাবিকতা প্রবিষ্ট হয়। এ জীবনে সকল বিভাগেই দেখিতেছি যখন যেখানেই সত্যের সহিত সাক্ষাৎকার সেইখানেই মানব-জীবনের গুরুত্ব ও সেইখানেই প্রগাঢ়তা। প্রতিদিন জগতে আমরা কত ভাবের অভিনয় দেখিতেছি, হৃদয়ে ভাব নাই অথচ মানুষ মুখে ভাব প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু যেদিন সত্যভাব হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছে সেদিন কি ঐকান্তিকতা, কি নিষ্ঠা, কি প্রগাঢ়তা! এইরূপে মানবসমাজের দৈনিক কার্য্য কলাপে কত কল্পিত প্রেম, কল্পিত আত্মীয়তা, কল্পিত, শোক দেখিতেছি, যদ্দারা মানুষ মানুষকে প্রতারণা করিবার প্রয়াস পাইতেছে, কিন্তু যেদিন সেই সকল মানুষেরই হৃদয় সত্য প্রেম, সত্য বন্ধুতা বা সত্য শোকের আবির্ভাব দেখিতেছে, সেদিন তাহাদের ভাব ও গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে, তাহাদের প্রকৃতি গভীর ও প্রগাঢ় হইয়া যাইতেছে; তাহাদের অন্তর হইতে সকল লঘুতা বিলুপ্ত হইতেছে। এই কারণে প্রেম ও সাক্ষাৎকারের ধর্ম্ম যাঁহারা একবার লাভ করেন, ধর্ম্ম তাহাদের জীবনের স্বাভাবিক হয়। প্রেমের স্বভাব এই, ইহা মানুষকে আত্মবিস্মৃত করে। প্রেমাস্পদকে সর্ব্বস্ব দিয়াও বোধ হয় না

কিছু দিয়াছি, অবিশ্রান্ত খাটিয়াও মনে লাগে না যে খাটিতেছি। অতএব প্রেমপথাবলম্বিগণ ধর্ম্মের সকল লক্ষণ প্রকাশ করিয়াও অনুভব করেন না যে, ধর্ম্মের কোনও লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন শিশু যেমন নিজের অজ্ঞাত সৌন্দর্য্যের দ্বারা অপরের চিত্তকে আকৃষ্ট করে, সেইরূপ অকপট ঈশ্বর-প্রেমিকগণও অনেক সময়ে আপনাদের অজ্ঞাত ধর্ম্মভাব দ্বারা অপরের চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া থাকেন। নানক লোকের দ্বারে দ্বারে যখন ঈশ্বরের নাম করিয়া ফিরিতেন, তখন দলে দলে লোক তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইত, ইহাতে নানক বিস্মিত হইয়া ভাবিতেন,—"আমি সামান্য বাণিকের সন্তান, আমার চরণে কেন ইহারা প্রণত হয়! অবশেষে চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, আর কিছুই নহে ইহা কেবল পরমেশ্বরের নামের গুণ। বিমল সাধু দেখিতে পাইলেন না যে উহা তাঁহার প্রেমের সুগন্ধ। এইরূপ মানব ইতিবৃত্তে আমরা যত অকপট ঈশ্বর-প্রেমিকের কথা শুনিয়াছি, সকলেই ধর্ম্মজীবনের এক প্রকার অদ্ভুত স্বাভাবিকতা দেখা যায়। যাহা প্রকৃতিতে মিশিয়াছে, প্রাণে জড়াইয়াছে, চিন্তা ও কার্য্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার জন্য আবার বিশেষ চিন্তা কি? যে স্থানে পতি ও পত্নী অকৃত্রিম প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছেন, তাঁহারা যাহা করেন তাহাতেই প্রেম, সমস্ত দিনই পরস্পরের সেবা সুতরাং সমস্ত দিনই প্রেমের কার্য্য; তাঁহারা কি আর বিশেষ করিয়া অনুভব করেন যে প্রেমসাধন হইতেছে? সেইরূপ অকপট ঈশ্বর-প্রেমিকগণ সমস্ত দিন যাহা করেন তাহাই

প্রেমের কার্য্য, তাহাই ধর্ম্ম, সুতরাং অনুভব করেন না যে প্রেমসাধন হইতেছে।

কিন্তু এরূপ স্বাভাবিক প্রেমের পথ লাভ করা বড় সৌভাগ্যের কর্ম্ম। এরূপ অকপট ঈশ্বর-প্রেমিকের সংখ্যা জগতে সর্ব্বদাই অল্প। অকপট ঈশ্বর-প্রেমিকের তন্ত্র মন্ত্র অতি সংক্ষিপ্ত। ঈশ্বরের দয়াতে বিশ্বাস ও একমাত্র তাঁহাতেই নির্ভর এই দুইটী কথা বলিলেই বোধ হয় প্রেমিকগণের সকল তন্ত্র মন্ত্র বলিয়া ফেলা হয়। এই বিশ্বাস ও নির্ভর এমনি বস্তু যে ইহা পাইলে আর কিছুই পাইতে অবশিষ্ট থাকে না! যেমন সর্ষপপ্রমাণ বটবীজে প্রকাণ্ড বটতরু নিহিত থাকে সেইরূপ এই ক্ষুদ্রকায় ধর্ম্মবীজে সমগ্র ধর্ম্মজীবন নিহিত আছে। এই অকপট প্রীতির পথ সকলে ধরিতে পারে না বলিয়াই আমরা উপনিষদের এই বাক্যের সার্থকতা অনুভব করি—যে "নিপুণ ব্যক্তি ভিন্ন অপরে তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না।"

নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

যে তেজোময়, অমৃতময় ও সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষ জড়ে ও চেতনে ওতপ্রোত ভাবে বাস করিতেছেন, তাঁহার উল্লেখ করিয়া শেষে ঋষিগণ বলিলেন;

"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

অর্থ—তাঁহাকেই জানিয়া এবং লাভ করিয়া সাধক মুক্তি লাভ করেন, যাইবার অন্য পথ আর নাই।

গঙ্গা যেখানে আসিয়া সাগরসঙ্গমে মিলিত হইয়াছে, সেখানে সমুদ্র মধ্যে কিয়দ্দূরে যেমন লোকে এক একটী বয়া দিয়া রাখিয়াছে, বয়াগুলি বিপথগামী নৌকা সকলকে বলিতেছে যে তৎপরেই অতল, আর অগ্রসর হইও না, তেমনি ধর্ম্মরাজ্যের যাত্রীদিগের পথের পার্শ্বে ঋষিগণ তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে চিহ্ন-ফলকে লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন,—"সাবধান! বিপথে পদার্পণ করিও না, যাইবার অন্য পথ নাই মুক্তি-প্রার্থী হও এই একমাত্র পথ অবলম্বন করিয়া যাও।" আমারা যেন অতীতের তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে ঋষিদিগের মহাবাক্যের প্রতি-ধ্বনি শুনিতে পাইতেছি, "হে মানব! এই পূর্ণ পরাৎপর পরম পুরুষকে জানা ও লাভ করা ভিন্ন অন্য গতি নাই; যাইবার অন্য পথ আর নাই।"

তাঁহাকে লাভ করা ভিন্ন অন্য গতি নাই, এই মহোপদেশ আমারা নানা প্রকার অর্থে গ্রহণ করিতে পারি। প্রথম কেহ কেহ বলেন যিনি ইন্দ্রিয়াতীত, যিনি অনন্ত, তাঁহাকে মানুষ কি প্রকারে ধারণ করিবে? তাঁহাকে কিয়ৎ পরিমানে ক্ষুদ্র করিয়া আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির উপযোগী কয়িয়া না লইলে কি আমরা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারি? এই প্রকার ভাব হইতেই অরতারবাদ, সাকারোপাসনা ও গুরুবাদ প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। অবতারবাদী বলেন, ভক্ত-বৎসল ভগবান মানুষকে দুর্ব্বল ও অসমর্থ জানিয়া, কৃপাপরবশ হইয়া, মানুষকে দেখা দিবার জন্য ও মানুষের সহিত লীলা করিবার জন্য মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, মানবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া-

ছিলেন, ও মানবের সুখ দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন। যেমন রাজ্যেশ্বর রাজা ক্ষুদ্র শিশুর সহিত খেলিবার জন্য আপনার রাজাভরণ উন্মোচন পূর্ব্বক শিশুত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমনি সেই অনন্ত পুরুষ কিয়ৎপরিমাণে আপনার ঐশ্বর্য্যকে উন্মোচন করিয়া মানবত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। মানব উঠিত পারে না দেখিয়া তিনি নামিয়া আসিলেন। সর্ব্বদেশের সর্ব্ববিধ অবতারবাদের মূলে এই প্রকার ভাব নিহিত আছে। ঈশ্বরকে মানবের সন্নিকটে আনা সকলেরই উদ্দেশ্য। কিন্তু ঋষিগণ বলিতেছেন, তাহা হইবে না, ঈশ্বরকে ক্ষুদ্র করিলে চলিবে না, সেই অনন্ত, অনাদি হৃদয়বিহারী সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষে তোমার চিত্ত সমাধান করিতে হইবে, অনুকল্প স্থলে মানুষ যেমন মধুর অভাবে গুড় দিয়া কাজ সারে, তেমনি যে ক্ষুদ্র ঈশ্বর দিয়া কাজ সারিবে তাহা হইবে না, অনন্তকে জানিতে ও লাভ করিতেই হইবে তদ্ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

আর বাস্তবিক আমরা চিন্তা করিলেও দেখিতে পাই যে জন্য অবতারবাদের কল্পনা, ইহার ফল ঠিক তাহার বিপরীত হইয়াছে। ঈশ্বরকে মানবের নিকটে না আনিয়া ইহাতে তাঁহাকে আরও দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে। মানব-প্রাণ তাঁহাকে সর্ব্বদাই নিকটে চায়, রোগ শোকে, পাপ বিকারে তাঁহাকে নিকটে চায়, নিরাশার ঘন অন্ধকারে তাঁহারই আশ্বাসবাণী শুনিতে চায়; সেই ব্যাকুল হৃদয়কে যদি বল তিনি পৃথিবীর কোন বিশেষ প্রদেশে ও ইতিবৃত্তের কোনও বিশেষ কালে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে সময়ে তিনি যে লীলা করিয়াছিলেন এখন

তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহাতে তাহার কোনও সান্ত্বনা হয় না। তিনি বৃন্দাবনে বা জুডিয়া প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এ সংবাদে আর লাভ কি? আমি যে প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহাকে চাই, তাঁহার আদেশ চাই, তাঁহার আশ্বাসবাণী চাই। যদি কোনও পল্লীগ্রামের লোক কলিকাতাতে আসিয়া শুনিয়া যায়, আলিপুরের বাগানে সিংহ আছে, তাহা হইলে কি তাহার সিংহ দেখা হয়? সেইরূপ তিনি দেশবিশেষে বা কাল বিশেষে মানবকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা শুনিলে কি আমার ঈশ্বর-দর্শন হয়? ঋষিগণ বলিতেছেন তিনি সর্ব্বান্তর্যামীরূপে প্রতি মুহূর্ত্তে হৃদয়ে বাস করিতেছেন, সেই ভাবেই তাঁহাকে জানিতে ও লাভ করিতে হইবে, তদ্ভিন্ন অন্য পথ নাই।

এইরূপ সাকারবাদী ও গুরুবাদীরাও বলিয়া থাকেন, সেই ইন্দ্রিয়াতীত পরম সত্তাকে কোনও দৃশ্যাধারে ও কেন্দ্রবিশেষে সন্নিহিত না দেখিলে তাঁহার ধারণা হইতে পারে না। এখানে অপরাপর আপত্তির মধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রধান আপত্তি। আমি যাঁহাকে নিকটে চাই, প্রাণে চাই, ও প্রতিমুহূর্ত্তে চাই এই সকল মতে তাঁহাকে দূরে ফেলিয়া দিতেছে; তাঁহাকে দেখিবার জন্য অন্তরে দৃষ্টিকে প্রেরণ না করিয়া সেই দৃষ্টিকে বাহিরে প্রেরণ করিতেছে; বলিতেছে তোমার উপাস্য দেবতা তোমার ভিতরে নয়, ঐ বাহিরে; সুতরাং এ সমুদায় মত মানবের মুক্তির সহায়তা না করিয়া বরং সে পথে অন্তরায় স্বরূপ হয়। এই জন্য ঋষিরা বলিলেন,—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

যিনি হৃদয়বাসী ও অনন্ত তাঁহাকে সেই ভাবেই জানিতে ও লাভ করিতে হইবে, তদ্ভিন্ন অন্য পথ নাই।

আমরা আর এক অর্থে ঋষিদের উক্তিকে গ্রহণ করিতে পারি। আর এক অর্থে বলিতে পারি, তাঁহাকে জানা ও লাভ করা ভিন্ন অন্য গতি নাই। উদ্ভিদের অঙ্কুরটী মৃত্তিকা ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলেই আমরা যেমন বলিতে পারি যে, কালে ফুল ও ফল ধারণ করিবেই করিবে, সেই তার নিয়তি তদ্ভিন্ন আর গতি নাই, গিরি-পৃষ্ঠ হইতে নদী অবতরণ করিলে যেমন বলিতে পারি, সে জলধারা সাগরাভিমুখে চলিবেই, তদ্ভিন্ন গত্যন্তর নাই, তেমনি কি এ কথা বলিতে পারি না, এই আত্মা পরমাত্মাকে লাভ করিবেই করিবে, তদ্ভিন্ন অন্য গতি নাই। বৃক্ষ যেমন আকাশের জন্য, নদী যেমন সাগরের জন্য, তেমনি আমাদের আত্মা ও তাঁহারই জন্য। শীঘ্র হউক, আর বিলম্বে হউক, আরামে হউক আর ক্লেশেই হউক, ইহলোকে হউক আর পরলোকে হউক, হে মানব! তোমাকে ব্রহ্মচরণে উপনীত হইতেই হইবে। ইংলণ্ডবাসিনী ব্রহ্মবাদিনী সুবিখ্যাতা কুমারী কবের গ্রন্থে একটী প্রবন্ধ আছে, তাহার নাম "Doomed to be saved" অর্থাৎ মুক্তিলাভ আমাদের নিয়তি। আমাদিগকে মুক্তিলাভ করিতেই হইবে। ঈশ্বরের স্বরূপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা এ কথার তাৎপর্য্য অনুভব করি; কারণ তাঁহার করুণারই জয় হইবে; তাঁহার করুণার যদি জয় হয়, তাহা হইলে কি আর পাপী চিরদিন পাপে পড়িয়া থাকিতে পারে? তাঁহার

রাজ্যে অনন্ত নরক আছে এ কথা বলিলে এই বলা হইল যে, তাঁহার করুণার জয় না হইয়া পাপেরই জয় হইবে। অনেক সময় ভাবিয়া দেখি আমরা যে তাঁহাকে ভুলিয়া পাপাচরণ করি সে যেন ক্ষুদ্র শিশুর পক্ষে মাতার হাত ছাড়াইবার চেষ্টার ন্যায়। ক্ষুদ্র শিশু মাতার হাত ছাড়াইয়া পলাইতে চায়, কিন্তু সে কোথা পলাইবে? তাহার ক্ষুদ্র চরণদ্বয়ে এরূপ শক্তি নাই, যে মাতার প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া বহুদূরে যায়। তাহার পলাইবার অর্থ প্রাঙ্গণের এক ধার হইতে অপর ধারে যাওয়া, মাতারই গৃহের এক কোণ হইতে অপর কোণে যাওয়া। শিশু এইরূপে কিয়ৎক্ষণ ছুটাছুটী করিয়া অবশেষে গৃহের এক কোণে গিয়া পশ্চাত ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আপনার হস্তে আপনার মুখ আবরণ করিয়া থাকে, মনে করে সে যখন দেখিতেছে না তখন মাও দেখিতেছেন না। ভাবিয়া দেখ ঈশ্বরের সহিত আমাদেরও ব্যবহার অনেক সময়ে কি এইরূপ নয়? আমরা অনেক সময়ে তাঁহার হাত ছাড়াইয়া পলাইতে চাই কিন্তু প্রশ্ন এই কোথায় পলাইব? কোন রাজ্য এমন আছে, যাহা তাঁহার রাজ্য নহে? যেখানে যাই না কেন সে তাঁহারই প্রাঙ্গণ, তাঁহারই ঘরের একটী কোণ। তবে আর ছুটাছুটী কেন? শিশু যদি বেশ বুঝিতে পারিত যে সে ছুটাছুটী করুক আর যাই করুক. মায়ের হাত হইতে তাহার নিষ্কৃতি নাই, তাহা হইলে আর সে বৃথা ছুটাছুটী করিত না; তেমনি মানবেরও যদি এই প্রতীতি দৃঢ় হয়, যে ঈশ্বর চরণে আশ্রিত হওয়া ভিন্ন অন্য গতি নাই, তাহা হইলেও তাহার ছুটাছুটীর বুদ্ধি লোপ প্রাপ্ত হয়।

তৃতীয়তঃ, আর এক অর্থে আমরা বলিতে পারি তাঁহার চরণাশ্রয় ভিন্ন অন্য পথ নাই। প্রত্যেক নিঃস্বার্থ ও নির্ম্মল প্রকৃতির উপরে সত্যের, প্রেমের ও সাধুতার এক প্রকার শক্তি উপস্থিত হয়, যাহা তাহাকে বাধ্য করিয়া একটী বিশেষ পথে লইয়া যায়, অন্য পথ দেখিতে দেয় না। এই বাধ্যতাবোধ মানবের ধর্ম্ম-বুদ্ধির একটী গূঢ় রহস্য। অনেক মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত এই বাধ্যতাবোধকেই ঈশ্বরের আদেশ বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। এই বাধ্যতাবোধ সকল সৎলোকেই অনুভব করিয়া থাকেন। সেণ্টপল বার বার বলিয়াছেন,—"যীশুর প্রেম আমাকে বাধ্য করিতেছে।" তিনি যীশুর প্রেম সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিতেন আমরা কি আপনাপন জীবনে সময়ে সময়ে ঈশ্বর-প্রেমের সেই বাধ্যতা অনুভব করি নাই। হে ব্রাহ্মযুবক! তুমি যে উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছ, আত্মীয় স্বজনের তাড়না সহ্য করিয়াছ, অনেক প্রকারে সামাজিক নিগ্রহ সহ্য করিয়াছ, কে তোমাকে এই সকল সহ্য করিবার জন্য বাধ্য করিয়াছে? তোমার সমক্ষে কি অন্য পথ ছিল না? তুমি কি আংশিকরূপে কপটতা স্বীকার করিলে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিতে না? অপর দশজনকে যেমন সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছ, তুমি কি তাহা করিতে পারিতে না? তবে তুমি সে পথে গেলে না কেন? কে তোমাকে বলিয়াছিল তোমার জন্য পথ নাই? সে বাধ্যতা-শক্তি কার?

একবার একজন ধর্ম্মপরায়ণা খ্রীষ্টীয় মহিলার একটী কার্য্যের

বিষয় পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলাম। তাঁহার পিতার অনেকগুলি ক্রীতদাস ছিল। এই ক্রীতদাস-ব্যবসায়ের বিবরণ যাহারা জানেন, তাঁহারা ইহা জানেন যে গো, মেষ, মহিষ প্রভৃতি যেমন মানুষের সম্পত্তির মধ্যে গণ্য, তেমনি ক্রীতদাস গুলিও প্রভুদিগের সম্পাতির মধ্যে গণ্য ছিল। উক্ত মহিলার পিতা অনেক সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া ঐ দাসদিগকে ক্রয় করিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগকে বিক্রয় করিয়া লাভবান হইবার আশা করিতেন। এমন সময়ে তাঁহার মৃত্যু হইল। তিনি একমাত্র কন্যা ও সম্পাত্তিস্বরূপ ঐ সকল দাস দাসীকে রাখিয়া পরলোকে গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরেই কন্যার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি ক্রীত-দাসপ্রথাকে ধর্ম্ম ও নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন। তখন তিনি কি করেন? যে দাস দাসীগুলি আছে, সেই গুলিই তাঁহার একমাত্র সম্পত্তি। তাহাদিগকে যদি স্বাধীন করিয়া দেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে ক্রয় করিতে যে হাজার হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল সে সমুদায় বৃথা যায়, এবং তিনি একেবারে দরিদ্র ও নিঃসম্বল হইয়া পড়েন, অথচ যাহাকে অধর্ম্ম বলিয়া অনুভব করিতেছেন সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হনই বা কিরূপে? অবশেষে তিনি ঐ সকল দাস দাসীকে স্বাধীনতা দেওয়াই শ্রেয় বলিয়া অবধারণ করিলেন। তাঁহার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব যিনি যেখানে ছিলেন, সকলে দারিদ্র্যের ভয় দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। তিনি বলিলেন,—

"ইহাদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া ভিন্ন আমার অন্য পথ আর নাই।" এই বলিয়া তাহাদিগকে স্বাধীন করিয়া দিলেন; এবং নিজে ঘোর দারিদ্রের মধ্যে পতিত হইলেন। দারিদ্র্যে পড়িয়া অবশেষে একটী সামান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষায়িত্রীর কার্য্য করিয়া জীবনের অবশিষ্ট দিন যাপন করিলেন।

জিজ্ঞাসা করি এই মহিলা কিরূপে অনুভব করিলেন, যে তাহাদিগকে স্বাধীন করিয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য পথ নাই? যে শক্তি তাঁহাকে বাধ্য করিয়া এই কাজ করাইল, সে শক্তির প্রকৃতি কি? তাহা কোথা হইতে উৎপন্ন? তাহা ব্রহ্মশক্তি; তিনি সত্যস্বরূপ, ন্যায়স্বরূপ, প্রেমস্বরূপ ও পবিত্রস্বরূপ, সুতরাং মানব-হৃদয়ের উপরে সত্যের যে শক্তি, ন্যায়ের যে শক্তি, প্রেমের যে শক্তি ও সাধুতার যে শক্তি তাহা তাঁহারই শক্তি, সে স্বয়ং তিনি। তিনিই মানব হৃদয়ে ভর করিয়া মানবকে বাধ্য করিয়া থাকেন। সুতরাং এ কথা অতীব সত্য যে তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন মানবের আর অন্য পথ নাই।

অতএব তাঁহাকে যদি মুক্তির উপায়রূপে চিন্তা কর, বা মানবাত্মার নিয়তিরূপে দেখ, বা আধ্যাত্মিক শক্তিরূপে ধারণা কর, যে রূপেই দেখ, যেদিক দিয়াই বিচার কর, তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন অন্য পথ আর নাই।

ব্রাহ্মদিগের পক্ষে এই সত্যটী উজ্জ্বলরূপে প্রতীতি করার বিশেষ প্রয়োজন। তাঁহারা নানাপ্রকার চিন্তা ও ভাবের স্রোতের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। তাঁহাদের সম্মুখে নানা প্রকার পথ প্রসারিত রহিয়াছে, ও নানা জনে সেই

সকল পথে যাইবার জন্য তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। তাঁহারা যদি সেই সকল আকর্ষণের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া ঋষিদিগের ন্যায় দৃঢ়ভাবে বলিতে না পারেন, "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়," যাইবার অন্য পথ আর নাই, তাহা হইলে তাঁহারা অধিক কাল এ পথে দণ্ডায়মান থাকিতে পারিবেন না। আমাকে অনেকে অনেক স্থলে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম ভিন্ন মুক্তি হইতে পারে কি না? আমি সর্ব্বদা একই উত্তর দিয়াছি, মুক্তির অর্থ ঈশ্বরকে লাভ করা, তাঁহাকে লাভ না করিলে মুক্তি নাই, শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক তাঁহার চরণে উপনীত হইতেই হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহাকেই আশ্রয় করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম ভিন্ন মুক্তি হইতে পারে বলিলে এই বলা হয়, ঈশ্বরকে লাভ না করিয়াও মুক্তি হইতে পারে। বিধাতা কি পথ ব্রাহ্মদিগের নিকটে প্রকটিত করিয়াছেন তাহা তাঁহারা অনুভব করুন ও দৃঢ়চিত্তে তদুপরি দণ্ডায়মান হউন। ঐ দেখুন ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মপূজার উপরে ঋষিদিগের চিহ্নিত ফলক জ্বলিতেছে—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"—হে ধর্ম্মরাজ্যের যাত্রিসকল সাবধান! সাবধান! এ পথ পরিত্যাগ করিও না, মুক্তিপথে যাইবার অন্য পথ আর নাই।

এ কথা স্বীকার্য্য এ পথে গমন অতিশয় আয়াসসাধ্য। সেই ইন্দ্রিয়াতীত অনন্ত পুরুষের শ্রবণ মননে চিত্ত সমাধান করা দুষ্কর। কিন্তু তাহা বলিলে কি হইবে? দুষ্কর হইলেও এই পথে গমন করিতে হইবে; চিত্তের একাগ্রতার দ্বারা এই বস্তু লাভ করিতে হইবে; কারণ যাইবার অন্য পথ আর নাই।

এষাস্য পরমা সম্পৎ।

উপনিষদের একটী উৎকৃষ্ট বচন আমরা অনেকবার ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে পাঠ করিয়াছি, এবং সময়ে তাহার উৎকৃষ্টতা ও সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। হৃদয় মনের যে উচ্চ অবস্থাতে জ্ঞান ও প্রেমে মিশিয়া যায়, এবং মানব এই মর্ত্ত্যধামকে অতিক্রম করিয়া এক প্রকার অমর্ত্ত্য আনন্দ রসের আস্বাদন করিতে থাকে, ঐ বচনটী সেই প্রকার উচ্চ অবস্থাতে রচিত হইয়া থাকিবে। বচনটী এই,—

"এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পৎ এষোঽস্য পরমো-লোক এষোঽস্য পরমআনন্দঃ।"

অর্থ,—এই পরাৎপর পরম পুরুষই এই আত্মার পরম গতি, ইনিই ইহার পরম সম্পদ্, ইনিই ইহার পরম লোক, ইনিই ইহার পরম আনন্দ।"

ঋষিরা সেই পরমাত্মাকে আমাদের আত্মার পক্ষে পরম সম্পত্তি বলিয়া বর্ণন করিলেন কেন? অভিপ্রায় এই—বিষয়ী লোকে মহামূল্য সম্পত্তি লাভ করিলে যে প্রকার আনন্দিত হয়, ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিও সেই পরাৎপর পরম পুরুষকে লাভ করিয়া সেই প্রকার আনন্দিত হইয়া থাকেন।

কেবল যে আমাদের দেশের ঋষিগণ এই প্রকার দৃষ্টান্তের দ্বারা ধর্ম্মধনের মহামূল্যতা প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন তাহা নহে, অপরাপর দেশের সাধুগণও ঐ প্রকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। মাহাত্মা যীশুর উপদেশাবলির মধ্যে

"মহামূল্য মুক্তা" নামে যে দৃষ্টান্তটীর উল্লেখ আছে, তাহা অনেকেরই বিদিত। তথাপি আর একবার তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। সে দৃষ্টান্তটী এই,—একজন বণিক মুক্তার ব্যবসায় করিত, মনে কর সে একবার পারস্য সাগরের উপকূলবাসী ধীবরদিগের পাড়াতে ভাল মুক্তা আছে কি না দেখিতে গেল। পরীক্ষা করিতে করিতে সে একজন ধীবরের নিকটে অতি চমৎকার একটী মুক্তা দেখিতে পাইল। কিন্তু ধীবর সে মুক্তার এত দাম বলিল যে, সে ব্যক্তির যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় না করিলে সে মূল্য উঠে না। অথচ সে মুক্তা এমনি উৎকৃষ্ট যে, যথাসর্ব্বস্ব দিয়া ক্রয় করিলেও শস্তা পাওয়া গেল মনে করিতে হয়। বণিক মনে করিল, গেলইবা আমার যথাসর্ব্বস্ব, এ মুক্তা একবার বাজারে বাহির করিলে, আমি তিন দিনের মধ্যে ধনী হইয়া যাইব। এই ভাবিয়া সে ধীবরকে বলিল, এ মুক্তা তুমি কাহাকেও বিক্রয় করিও না, আমি বায়না করিয়া যাইতেছি, কয়েক দিন পরে আসিয়া দাম দিয়া লইয়া যাইব। এই বলিয়া বণিক গৃহে ফিরিয়া আসিয়া কয়েক দিনের মধ্যে আপনার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া ফেলিল, এবং সেই অর্থ লইয়া মুক্তা আনিতে গেল। যীশু বলিলেন, তাঁহার প্রচারিত ধৰ্ম্ম এই মহামূল্য মুক্তার ন্যায়। ঋষিরা যাহা সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যীশু তাহা বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এইমাত্র প্রভেদ।

পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তে আমরা দেখিতেছি, যে যাহাকে সম্পদ বলিয়া মনে করে, তাহা লাভ করিবার জন্য তাহার চিত্তের

কেমন একগ্রতা হয়। সংসারে প্রতিনিয়ত দেখিতেছি যে যাহাকে সম্পদ বলিয়া মনে করে, সে তাহা লাভ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছে। নিরন্তর সে জন্য কি প্রকার ক্লেশ ভোগ করিতেছে। জগতের প্রতি একবার চিন্তাপূর্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত কর, দেখ সম্পদ লাভের জন্য মানবকুলের মধ্যে কিরূপ ব্যগ্রতা। যে বস্তুর দ্বারা যাহার সম্পদ লাভের আশা, সে বস্তু সংগ্রহ করিবার জন্য তাহার কি রূপ আগ্রহ! ডুবুরিরা মুক্তার লোভে অতল জলে নিমগ্ন হইতেছে, খনি-খননকারিগণ অন্ধকার খনিগর্ভে প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া প্রবেশ করিতেছে, বণিকগণ পণ্য দ্রব্য লইয়া প্রচণ্ড বাত্যা ও ভীষণ সাগর-তরঙ্গ অতিক্রম করিয়া দিকদিগন্তে ধাবিত হইতেছে, এইরূপ সর্ব্ব বিভাগেই মানুষ দলে দলে জীবিকার জন্য জীবন হারাইতেছে। কি আগ্রহ! কি ব্যগ্রতা! কি অবিশ্রান্ত পরিশ্রম! কি প্রবল অভিনিবেশ! সেই পরাৎপর পরম পুরুষকে যাঁহারা পরম সম্পদ বলিয়া অনুভব করেন, তাঁহারাও এই প্রকার একাগ্রতার সহিত তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া থাকেন। ইহা মানব মনের কল্পনা নহে; কিম্বা কবির কবিত্ব নহে। জগতের ইতিবৃত্তে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাই-তেছে। প্রাচীন কালেরও বর্ত্তমান কালের ব্রহ্মপরায়ণ সাধকগণ অনেকেই এরূপ আগ্রহ ও একগ্রতার সহিত পর-ব্রহ্মকে অন্বেষণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, মানুষ যাহাকে সম্পদ বলিয়া বিবেচনা করে, তাহা লাভ করিবার জন্যই যে কেবল প্রয়াসী হয় তাহা নহে,

তাহা রক্ষা করিবার জন্যও সর্ব্বদা সতর্ক থাকে। ক্ষেত্রের শস্য কৃষকের সম্পত্তি, সেই শস্য রক্ষার দিকে তাহার কেমন দৃষ্টি; মেষপাল মেষপালকের প্রধান সম্পত্তি, সে আপনার মেষদলকে রক্ষা করিবার জন্য কেমন ব্যস্ত; এইরূপ সকল বিভাগেই মানুষ যাহাকে মূল্যবান বলিয়া মনে করে, তাহা সহজে বিনষ্ট হইতে দেয় না। সেইরূপ ধর্ম্মধনকে যাঁহারা প্রিয় ও মূল্যবান বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারা ইহার রক্ষার জন্যও সর্ব্ব প্রযত্নে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

ধর্ম্মধনের রক্ষার জন্য যে এই ব্যগ্রতা ইহাকে ধর্ম্মভীরুতা বলে। ধর্ম্মভীরু লোক প্রাণান্তেও অধর্ম্মের আচরণ করিতে পারেন না। রাজভয় বা লোকভয় যে তাঁহাদিগকে ভীত ও সংকুচিত করিয়া রাখে তাহা নহে, কিন্তু হৃদয়স্থ সাক্ষীস্বরূপ সেই পরম পুরুষের আদেশকে তাঁহারা কোন ক্রমেই লঙ্ঘন করিতে পারেন না। যে কার্য্য দ্বারা তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ ঘটে, ও তাঁহাকে হারাইতে হয়, সে কার্য্যকে তাঁহারা বিষের ন্যায় বর্জ্জন করিয়া থাকেন।

তৃতীয়তঃ, মানুষ যাহাকে শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া মনে করে, আপনার সমুদায় কার্য্য ও চিন্তাকে এমন কি সমগ্র জীবনকে তাহার দ্বারা নিয়মিত করিয়া থাকে, এবং তাহার সমগ্র জীবন তদুপরি প্রতিষ্ঠিত হয়। সে এমন সকল কার্য্যের আচরণ করিয়া থাকে, যাহা ঐ ধন লাভের অনুকূল এবং এমন সকল কার্য্য পরিহার করে, যাহা ঐ ধন লাভের প্রতিকূল। বণিক, যে বাণিজ্যের দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করিতেছে,

সে কি এমন কার্য্য করে যদ্দ্বারা তাহার ধনোপার্জ্জনের ব্যাঘাত হয়? সে সেই স্থানেই যায়, যেখানে তাহার ধনোপার্জ্জনের সুবিধা আছে, সেইরূপ সম্বন্ধেই আবদ্ধ হয়, যাহাতে তাহার ধনোপার্জ্জনের আশা আছে। এমন কি তাহার গার্হস্থ্য এবং সামাজিক জীবনও অনেক পরিমাণে সেই সর্ব্বপ্রধান ভাব দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়। একজন এরূপ ব্যক্তির বাড়ীতে যাও, দুই ঘণ্টা বাস কর, তাহার পরিবার পরিজনদিগের আলাপে, দাসদাসী-দিগের আচরণে, শিশুদিগের সরল কথোপকথনে জানিতে পারিবে, সে গৃহ, সে পরিবার, ধন-লালসার উপরে প্রতিষ্ঠিত। তাহাদের চিন্তাতে অর্থলালসা, কথাবার্ত্তাতে অর্থলালসা, আকাঙ্ক্ষাতে অর্থলালসা। তাহারা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সেই এক বিষয়ের জন্য সকল অসুবিধা সহ্য করে, সকল ক্লেশ বহন করে। পূর্ব্বোক্ত যুক্তির অনুসরণ করিলে ইহা স্পষ্টই অনুভব করা যায় যে, যে সাধক পরমেশ্বরকে যথার্থ সম্পদ বলিয়া মনে করেন, তিনি কখনই তাঁহাকে হৃদয় হইতে দূরে রাখিয়া চিন্তা ও কার্য্য করিতে পারেন না। ঈশ্বর-চিন্তা স্বতঃই সেই সাধকের সকল কার্য্যে প্রবিষ্ট হয়, এবং তাঁহার সমগ্র জীবনকে ব্যাপ্ত করে। তিনি নিজের গার্হস্থ্য ও পারিবারিক জীবনকেও তদুপরি প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। স্বর্ণকার যেমন নিজ সন্তানদিগকে অলঙ্কার নির্ম্মাণের কাজ শিখাইয়া দিয়া, এই ভাবিয়া সন্তুষ্ট হয় যে ইহাদিগকে এমন কিছু দিয়া গেলাম যদ্দ্বারা ইহারা সংসারে দাড়াইতে পারিবে, তেমনি তিনি নিজ সন্তানদিগকে এই ধর্ম্মধন দিয়া মনে করেন, ইহাদিগকে পরম সম্পত্তি

দিয়া গেলাম। যাঁহারা ধর্ম্মকে গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে ভয় পান, তাঁহারা ইহাকে মূল্যবান বলিয়া মনে করেন না, তাহা করিলে কখনই সে প্রকার করিতে পারিতেন না।

চতুর্থতঃ, যে ধন সম্পদের অধিকারী, তদুপরি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে নির্ভর করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। যে ব্যক্তি নিজ শ্রমের দ্বারা পঞ্চাশ হাজার টাকা জমাইয়া ব্যাঙ্কে রাখিয়াছে, সে কি এ জগতের সম্পদ বিপদে সেই পঞ্চাশ হাজর টাকা বিস্মৃত হইতে পারে? নিজের ও পরিবার পরিজনের সুখ দুঃখ সংক্রান্ত প্রত্যেক চিন্তার মধ্যে ঐ পঞ্চাশ হাজার টাকার চিন্তা কি আসিয়া প্রবেশ করে না? এই নির্ভর যেমন স্বাভাবিক, তেমনি ইহা হইতে একপ্রকার মানসিক বলেরও উৎপত্তি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আপনাকে দীন দরিদ্র ভাবিয়া মুহ্যমান হইতেছে, সে যদি কল্য প্রাতে শুনিতে পায় যে সে অতুল বিভবের অধিকারী, এত দিন তাহা জানিত না, তাহা হইলে দুই দিনের মধ্যে তাহার চরিত্রে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইবে। তাহার চিত্ত আর ভীত, উদ্বিগ্ন বা সংকুচিত নাই, কি এক প্রকার নব সাহস, নব আশা ও নব আনন্দ তাহার মনে প্রবেশ করিয়াছে, যাহাতে সে আর পূর্ব্বের ন্যায় বিপদের মুখ দেখিয়া ভয় পাইতেছে না। আবার অপর দিকে একজন যদি যথার্থ রাজার তনয় হইয়াও আপনার প্রকৃত অবস্থা বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকে, যদি সে শৈশবাবধি দরিদ্র গৃহে প্রতিপালিত হইয়া আপনাকে দরিদ্র বলিয়াই জানে, তবে আর

রাজপুত্রের গৌরব সে অনুভব করিতে পারিবে না। দরিদ্রের ন্যায় ভীত উদ্বিগ্ন ও সংকুচিত চিত্তে বাস করিবে।

পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে আমরা একটী মহোপদেশ লাভ করিতে পারি। ঈশ্বরের করুণা তোমার আমার সকলের জন্যই রহিয়াছে। আমরা সকলেই সে সম্পদের অধিকারী। কিন্তু আমরা যদি সে করুণা দেখিতে না পাই, যদি তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারি, তবে তাহা আমাদের পক্ষে থাকিয়াও নাই। আমরা যে বিশ্বাস দ্বারা তাঁহার কোন স্বরূপকে গঠন করিব বা বর্দ্ধিত করিব তাহা নহে, নিজেরা বল পাইব, জীবন পাইব এই মাত্র।

পঞ্চমতঃ যে সম্পদের অধিকারী, সে লোকের কথা ও সমালোচনার দ্বারা আপনার শক্তির বিচার করে না, কিন্তু আপনার সম্পদের দ্বারাই আপনার শক্তির বিচার করে। সহরের ধনিদের ধন সম্পদের বিষয়ে আমরা প্রতিদিন কতই মতামত কতই সমালোচনা শুনিতে পাই। কেহ বলেন, অমুক বাবুর দুই লাক টাকার আয়, কেহ বলে না এত হবে না, তাহা হইলে আবার ঋণ করিবে কেন? এইরূপ বাহিরের লোকে ঘরের কথা না জানিয়া কাহাকেও বাড়াইতেছে, কাহাকেও বা কমাইতেছে, কাহাকে বা ধনিদের অগ্রগণ্য করিতেছে, আবার কাহাকে বা দরিদ্রের অধম করিতেছে; কিন্তু সে সকল সমালোচনা দ্বারা কোনও চতুর ধনী প্রতারিত হন না। লোকে না জানিয়া বড় করিয়া তুলিলে তিনি আপনকে বড় ভাবেন না, কিম্বা লোকে দরিদ্র বলিলে তিনি দারিদ্র্য দুঃখ ভোগ করেন

না। তিনি জানেন তাঁহার কোমরে বল কত, তাঁহার সম্পদের পরিমাণ কত, সুতরাং তদ্দ্বারাই আপনার প্রকৃত বলের বিচার করিয়া থাকেন। সেইরূপ ধর্ম্মধনকে যাঁহারা পরমধন বলিয়া জানিয়াছেন, ও অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা লোকের মতামত ও সমালোচনার দ্বারা আপনাদের ক্ষতি বা লাভের গণনা করেন না। তাঁহারা সেই ধনকে প্রাণপণ যত্নে রক্ষা করেন ও তদ্দ্বারাই নিজেদের বলের বিচার করেন। ব্রহ্মসমাজের পক্ষে বর্ত্তমান সময়ে এই সত্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। ব্রাহ্মসমাজের মত ও বিশ্বাস এবং অনুষ্ঠানাদির সমালোচনা চারিদিকেই হইতেছে। বাহিরের লোক ইহার বিষয়ে নানা প্রকার সমালোচনা ও ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন, ব্রাহ্মসমাজ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে ত্বরায় মৃত্যু-দশায় পতিত হইবে; কেহ বলিতেছেন, ইহার মত ও আচরণ দূষণীয়, ইত্যাদি নানাপ্রকার সমালোচনা চলিতেছে। এই সকল আলোচনার মধ্যে ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য কি? তাঁহারা কি অপরের সমালোচনার দ্বারা আপনাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারন করিবেন, না নিজেদের সমক্ষে যে গুরুতর কার্য্য সকল রহিয়াছে তাহাতে মনোযোগী হইবেন? এই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাকে কি মহামুল্য রত্ন বলিয়া অনুভব করেন, না সে সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ আছে? যদি সন্দেহ থাকে, তবে বাহিরের লোককে সমালোচনা দ্বারা তাহাদিগকে মারিতে হইবে না, আপনারাই আপনাদিগকে মারিবেন, কারণ এ জগতে ক্ষীণ বিশ্বাস কোনও দিন সংগ্রামে জয়ী হয় নাই। আর

যদি তাঁহারা বাস্তবিক ইহাকে মহামূল্য বস্তু মনে করেন, তাহা হইলে লোকের সমালোচনার দ্বারা নীত না হইয়া, নিবিষ্ট চিত্তে আপনাদের উদ্দেশ্য সাধন করিয়া যাইতে হইবে। ধীর-ভাবে আপনাদের গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনকে ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ইহা নিজ পরিবার পরিজন পুত্র কন্যা প্রভৃতিকে দিবার জন্য প্রয়াস পাইতে হইবে।

গুরুতর কর্ত্তব্যের ভার যাহাদের হস্তে থাকে, তাহাদের কি অপরের মতামত ও সমালোচনাতে কর্ণপাত করিবার বা তাহাদের সহিত বিবাদ কলহে প্রবৃত্ত হইবার অবসর থাকে? ইহার একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতেছে। একবার একটী কয়লার খনি বসিয়া গিয়া অনেকগুলি লোক চাপা পড়িল। যাহারা খনির মধ্যে কাজ করিতেছিল তাহাদের অনেকে অতি কষ্টে জীবন রক্ষা করিয়া বাহির হইল, কিন্তু অনুমান ৫০।৬০ জন লোক আর বাহির হইতে পারিল না। তাহারা সেই অন্ধকার কারাগারে আবদ্ধ হইয়া রহিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে এই ভয়ানক দুর্ঘটনার বার্ত্তা নিকটস্থ নগরে ছড়াইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে চারিদিক হইতে পিপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায় পুরুষ রমণী, বালক বালিকা সেই দিকে দৌড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সে স্থানে লোকে লোকারণ্য। ওদিকে প্রায় পঁচিশ ত্রিশ জন লোক, সেই কয়লার পাহাড় কাটিয়া আপনাদের সঙ্গীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে। তাহারা সে খনির কোথায় কি আছে, সকলি জানে। তাহারা একটী বিশেষ স্থল মনোনীত করিয়া কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

তাহাদের আশা, সেই স্থলে কাটিলে সত্বর বন্দীদিগকে উদ্ধার করা যাইবে। তাহারা কার্য্য করিতেছে, আর এদিকে নানা প্রকার সমালোচনা চলিতেছে। কেহ বলিতেছে, এখানে কাটে কেন? কেহ বলিতেছে, ত্রিশজন লোকে এই পাহাড়ের কি করিবে? কেহ বলিতেছে, ঐ দিকটায় কাটিলে ভাল হইত, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু উক্ত ত্রিশ জন কার্য্যদক্ষ লোক ইহাদের এ সকল সমালোচনার প্রতি কর্ণপাতও করিতেছে না। তাহাদের মুখে কথা নাই, হাতের কুঠারি দমাদম চলিতেছে। অল্পক্ষণ পরেই চারিদিকে হরিধ্বনি উঠিয়া গেল, কারাগারের বন্দীরা মুক্তি লাভ করিল। ব্রাহ্মগণ যদি মনে করেন তাঁহাদের হস্তে কোনও গুরুতর কার্য্যের ভার আছে তবে এই ভাবে সে কর্ত্তব্যসাধনে মনোনিবেশ করুন। তাঁহারা যদি পরম সম্পত্তি পাইয়া থাকেন, সেই ভাবে তাহা সাধন করুন।

ধর্ম্মের নিবাস-ভূমি।

ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিঃ........তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।

উপনিষদ্

অর্থ—সেই পরাৎপর পরম পুরুষকে দেখিলে হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হয়।"

And ye shall know the truth and the truth shall make you free—John Chap VIII. Vers 32.

অর্থ—তোমরা সত্যকে জানিবে এবং সত্য তোমাদিগকে স্বাধীন করিবে।"

পুর্ব্বোক্ত উভয় বচনেরই বক্তব্য বিষয় এক। উভয়েরই উপদেশ এই যে পরম সত্য যিনি তাঁহাকে জানিলে মানবাত্মা প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করে। এই উভয় বচনের যে তাৎপর্য্য তাহার প্রতি চিত্তকে প্রয়োগ করিলে আমরা ধর্ম্মের উন্নত ও উদার নিবাস-ভূমির কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হই। যেমন এই ধরাপৃষ্ঠস্থিত বায়ুমণ্ডলে অনেক স্তর আছে, এক এক স্তরের এক এক প্রকার অবস্থা, এবং আমরা ধরাপৃষ্ঠ হইতে যতই ঊর্দ্ধে আরোহণ করি, ততই যেমন এক এক প্রকার বায়ুর অবস্থা দেখিতে পাই, এবং সূর্য্যালোকের এক এক প্রকার নূতন অবস্থা লক্ষ্য করি, তেমনি আমরা জীবনের নিম্নভূমি হইতে যতই ধর্ম্মের ভূমিতে আরোহণ করি, ততই এক নূতন আধ্যাত্মিক

বায়ু অনুভব করিতে থাকি। সেই আধ্যাত্মিক বায়ুর ভাব যে কি তাহাই সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

যে স্তরে ধর্ম্মের নিবাস সে স্তরে বায়ুর প্রথম ও প্রধান্ লক্ষণ আত্মার মুক্ত-ভাব, অর্থাৎ প্রকৃত আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা। আত্মার মুক্তভাব এ কথার অর্থ কি? মুক্তি ও মুক্ত শব্দ ব্যবহার করিলেই বন্ধন মনে পড়ে। আত্মার পক্ষে আবার বন্ধন কি? উপনিষদ্ যাহাকে হৃদয়-গ্রন্থি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা কি? সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই বলিতে হয়, যে কিছু আত্মার ধর্ম্মের ভূমিতে আরোহণ করিবার পথে বিঘ্ন উৎপাদন করে তাহাই বন্ধন। এই বন্ধন কি কি আছে, এই চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেই দেখিতে পাই যে স্বার্থ ও ভয় প্রথমেই মুমুক্ষু আত্মার গতিরোধ করিবার জন্য মহাবন্ধন রূপে বিদ্যমান। স্বার্থপরতা ও ভয় অর্থাৎ ইষ্টলাভের লোভ ও অনিষ্টপাতের আশঙ্কা, এই উভয়কে অতিক্রম করিতে না পারিলে মানুষ ধর্ম্মের ভূমিতে আরোহণ করিতে পারে না। বিশুদ্ধ ধর্ম্মত দূরের কথা, এতদুভয়কে অতিক্রম করিতে না পারিলে মানুষ জীবনের সামান্য কর্ত্তব্য কার্য্যও সুচারুরূপে পালন করিতে পারে না। নিজের লাভালাভ ও অপরের অনুরাগ বিরাগ ভুলিতে না পারিলে আমরা প্রকৃত ভাবে সত্যের ও বিবেকের অনুসরণ করিতে পারি না। কিন্তু স্বার্থ সুখাসক্তি ও ভয়ের অতীত হওয়া ও তাহাদের উপরে উঠা মানবের পক্ষে সহজ নহে। মানুষ যদি সত্যের ও ধর্ম্মের শৃঙ্খলকে ঈশ্বরের সিংহাসনের সহিত সম্বদ্ধ দেখিতে না পায় তাহা হইলে কখনই স্বার্থ ও

ভয়কে অতিক্রম করিয়া তাহার বশবর্ত্তী হইতে পারে না। মানুষ যখনি তাঁহাকে সত্যভাবে দর্শন করে, তখনি তাঁহাকে ধর্ম্মাবহরূপে দেখিতে পায়, এবং তখনই সে ধর্ম্মে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং স্বার্থ ও ভয়কে অতিক্রম করে। সেই পরাৎপর পরম পুরুষকে সত্যভাবে প্রতীতি করিলেই আমরা অনুভব করি, যে এই অত্যাশ্চর্য্য জড় জগৎ যেমন দুর্লঙ্ঘ্য ভৌতিক নিয়ম সকলের দ্বারা শাসিত, এবং সেই সকল নিয়মের অনুগত না হইলে আমাদের রক্ষা নাই, তেমনি আধ্যাত্ম-জগৎ ও দুর্লঙ্ঘ্য ধর্ম্মনিয়মের দ্বারা শাসিত, যাহার অধীন না হইলে আমাদের রক্ষা নাই। তখনি আমরা ধর্ম্মনিয়মের দুর্লঙ্ঘ্যতা ও অপরিহার্য্যতার উপরে সর্ব্বান্তকরণের সহিত নির্ভর করিয়া থাকি। অতএব যাঁহারা মহাত্মা বুদ্ধের ন্যায় মুখে ঈশ্বরের ধর্ম্মাবহ স্বরূপের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করিয়াও কার্য্যে ধর্ম্ম-নিয়মের দুর্লঙ্ঘ্যতা বা অপরিহার্য্যতাতে আস্থা স্থাপন করেন, তাঁহারা না জানিয়া সেই পরাৎপর পুরুষের সত্তা ও স্বরূপে বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিয়া থাকেন। যাহা হউক সেই পরাৎপর পুরুষকে সত্য বলিয়া দেখিলে, মানুষ স্বার্থ ও ভয়ের অতীত হইয়া ধর্ম্মের ভূমিতে আরোহণ করে। এই আত্মদর্শন আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা হইতেই ধর্ম্মজীবনের অপর লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। যে চিত্ত স্বার্থ, সুখাসক্তি ও ভয়ের অতীত সে চিত্ত স্বভাবতঃ পবিত্র। সে চিত্ত সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত সত্যকেই অনুসরণ করে এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকে। এইরূপ চিত্তই প্রকৃত ভাবে ন্যায়ের অনুসরণ

করিতে পারে। সত্যানুরাগ, ন্যায়পরতা, সংযম, সকলি স্বাভাবিক ভাবে ইহাতে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে।

কেবল যে সুখাসক্তি ও ভয়ই আত্মার একমাত্র বন্ধন তাহা নহে ; ধর্ম্মপথের যাত্রীদিগের পক্ষে আরও অনেক প্রকার বন্ধন আছে। এমন কি, শাস্ত্র, গুরু ও বিধি, যাহা ধর্ম্ম-সাধনের সহায়তার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাও অনেক সময়ে বন্ধনের কার্য্য করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি সত্যকে সাক্ষাৎভাবে জানিয়াছে তাহার পক্ষে ইহারা সহায়, কিন্তু যে ব্যক্তি তাহা জানে নাই, তাহার পক্ষে ইহারা বন্ধন-স্বরূপ। জগতে সকল বিদ্যা ও সকল জ্ঞানের পক্ষে নিয়ম এই যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান মুক্তি ও স্বাধীনতাকে আনিয়া দেয়, এবং পরোক্ষ জ্ঞান মানুষকে বন্ধনের মধ্যে রাখে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞান বিষয়ে অনেক তত্ত্ব আবিস্কৃত হইয়াছে, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ সে সমুদায়কে স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কেবল যে সেই তত্ত্বগুলিকে তাঁহারা গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের পরীক্ষার প্রণালীও নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য এই যে বিদ্যার্থিগণ তৎ তৎ গ্রন্থের সাহায্যে নিজে নিজে পরীক্ষা করিবেন ও সাক্ষাৎভাবে প্রকৃতির সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া জ্ঞানলাভ করিবেন। কিন্তু যদি কেহ আলস্য বা ঔদাসীন্য বশতঃ প্রকৃতিকে সাক্ষাৎভাবে না দেখে, তবে তাহাকে গ্রন্থ ও গুরুর উপরেই সর্ব্বদা নির্ভর করিতে হয় ; সর্ব্বদাই ভাবিতে হয়, এ বিষয়ে কোন গ্রন্থে কি বলিয়াছে বা কোন জ্ঞানী কি নির্দ্দেশ

করিয়াছেন। সেইরূপ যে ব্যক্তি আপনার আত্ম-কোষে সেই জ্যোতির জ্যোতিকে দর্শন করিতে না পারে, তাহাকে অন্ধপ্রায় ধর্ম্মবোধে শাস্ত্র, গুরু ও বিধির সেবাই করিতে হয়। তখন এগুলি তাহার পক্ষে মুক্তির সহায় না হইয়া বন্ধনের রজ্জু-স্বরূপ হয়; তখন সে জীবন্ত, তাজা, সুমিষ্ট ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত থাকিয়া ধর্ম্মজীবনের বহিঃপ্রাঙ্গণে শাস্ত্র, গুরু ও বিধি লইয়াই বিবাদ বিসম্বাদ করিতে থাকে। এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য ইহা নহে, যে ধর্ম্মজীবনের সহায়তার পক্ষে শাস্ত্র গুরু ও বিধিকিছুই নহে; এইমাত্র বক্তব্য যেমন বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সকল ও বিজ্ঞানবিৎ গুরুগণ কেবল সাক্ষাৎদর্শী ও পরীক্ষাকারী জ্ঞানিদিগের পক্ষেই প্রকৃত সহায়; তেমনি ধর্ম্মজগতেও গুরুশাস্ত্র প্রভৃতি সাক্ষাৎদর্শী জ্ঞানীদিগেরই সহায়। অতএব আমরা সকলেই ইহা অনুভব করিতে পারিতেছি যে ব্রহ্মের সাক্ষাৎদর্শন দ্বারাই আত্মা ধর্ম্মের ভূমিতে আরোহণ করে, এবং সে ভূমির বায়ুর প্রধান লক্ষণ আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা। সে বায়ুর প্রথম লক্ষণ স্বাধীনতা, দ্বিতীয় লক্ষণ প্রেম। স্বাধীনতা ভিন্ন প্রীতির স্ফূর্ত্তি হয় না; আবার যেখানে অকপট প্রীতি সেখানেই আত্মার স্বাধীনতা। প্রীতির পদার্পণ মাত্র পরাধীনতার অন্তর্ধান, আবার পরাধীনতার আবির্ভাবে প্রীতির বিনাশ! সর্ব্ববিধ প্রীতির পক্ষে এই নিয়ম। কি ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি, কি সাধুজনের প্রতি প্রীতি, কি সদনুষ্ঠানের প্রতি প্রীতি, কি মানব সাধারণের প্রতি প্রীতি, সর্ব্ববিধ প্রীতিই ধর্ম্মের নিবাসভূমির বায়ুর মধ্যে বিদ্যমান। যে আত্মা সেই সত্য

সুন্দর মঙ্গল পুরুষকে দর্শন করে নাই, সুতরাং যে বিবিধ বন্ধনের মধ্যে বাস করিতেছে সে কখনই অবিমুক্ত প্রীতির সুখ আস্বাদন করিতে পারে না। তাহার ঈশ্বর-প্রীতি বিষয়-সুখলিপ্সার দ্বারা সীমাবদ্ধ, তাহার সদনুষ্ঠান-প্রীতি সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা সীমাবদ্ধ, এবং তাহার মানব-প্রীতি জাতিভেদ দ্বারা সীমাবদ্ধ। মানবের ধর্ম্মভাব উদার ভূমিতে আরোহণ না করিলে তাহার প্রীতি উদার ভাবে সমগ্র জগতকে আলিঙ্গন করিতে পারে না। চীনদেশীয় সাধু কংফুচ স্বীয় শিষ্যদিগকে বলিতেন—"মহামনা ব্যক্তি উদার, তিনি সাম্প্রদায়িক নহেন; ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক, সে উদার নহে।"—সাধুদিগের জীবন-চরিতে আমরা অনেকবার দেখিয়াছি যে প্রকৃত ভক্তি যে হৃদয়ে প্রবেশ করে, জাতিভেদ সেখানে তিষ্ঠিতে পারে না। জাতিভেদরূপ মধূখ প্রেমের বাতির স্পর্শেই গলিয়া পড়ে। মানব-প্রীতির পক্ষদ্বয়কে জাতিভেদের রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখিলে সে প্রেম ঈশ্বরের চরণাকাশে উঠিতে পারে না; আবার ঈশ্বরের চরণাকাশে যে আত্মা একবার উঠে সে আর জাতিভেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাচীর সকল দেখিতে পায় না। প্রেমের এই এক মহিমা ইহা পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া ও পূর্ণ অধীনতা আনিয়া দেয়। যেখানে অকপট প্রীতি বিদ্যমান সেখানে একজন সর্ব্বাংশে অপরের অনুগত হইয়াও আপনাকে পরাধীন মনে করে না, সর্ব্বস্ব দিয়া ও কিছু দিলাম ভাবে না। প্রেম এই প্রকারে পরা-ধীনতাকে স্বাধীনতাতে এবং স্বাধীনতাকে পরাধীনতাতে পরিণত

করিয়া থাকে। ঈশ্বর আমাদিগকে স্বাধীন করিয়াছেন, অথচ আমাদিগের উপরে তাঁহার ধর্ম্ম-নিয়মকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন, তাঁহার অভিপ্রায় এই যে আমরা ক্রীতদাসের ন্যায় ভয়-ভীত হইয়া তাঁহার ধর্ম্মনিয়মের অধীন হইব না, কিন্তু প্রেমে আত্ম-সমর্পণ করিয়াই তাঁহার অধীন হইব। এই জন্যই তিনি আমাদিগকে স্বাধীন-সাধ্য ধর্ম্মের অধিকারী করিয়াছেন।

স্বাধীনতা ও প্রেমের ন্যায় ধর্ম্মের দেশে আর একটী পদার্থ আছে, তাহা আনন্দ। উহা আত্মার নির্বৃতি বা তৃপ্তি জনিত। সত্য না পাইলে মানবাত্মা তৃপ্ত হয় না। অন্নের সঙ্গে উদরের যে সম্বন্ধ, সত্যের সঙ্গে আত্মার সেই সম্বন্ধ। উদরকে যথাসময়ে অন্নলাভ করিতে দেও, আর তোমাকে কিছু করিতে হইবে না; অবশিষ্ট সকল কাজ উদর করিবে; সে আর তোমার নিকট কিছু চাহিবে না; সে সেই অন্নমুষ্টিকে লইয়া আপনার গূঢ়তম স্থানে রাখিবে, পাকোপযোগী রসের দ্বারা সংযুক্ত করিবে, তদ্দ্বারা দেহ গঠন করিবে। সেইরূপ আত্মা যদি সত্য বস্তুকে পায় তাহা হইলে বলে—“ধন্যোস্মি কৃত-কৃত্যোস্মি” আমি ধন্য হইলাম আমি কৃতকার্য্য হইলাম। অর্ণব মধ্যে প্রবল ঝটিকাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া অর্ণবপোত যদি উপযুক্ত বন্দর পায়, তাহা হইলে তদারোহিগণ যেরূপ নিরাপদ ভাব অনুভব করে, প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে ছিন্ন-পক্ষ বিহঙ্গম যদি তরুকোটরস্থিত নিজ কুলায় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে যেরূপ তাহাতে বুক রাখিয়া বিশ্রাম ও আরাম লাভ করে, সেইরূপ এই মানব-জীবনের রোগ, শোক, পাপ প্রলোভনের আঘাত

ও আন্দোলনের মধ্যে মানবাত্মা যদি একবার সেই সত্য-জ্যোতি দর্শন করে, তাহা হইলে অভয়পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই যে সত্যাশ্রয়-লাভ-জনিত মানব-চিত্তের আশাপূর্ণ সন্তোষের অবস্থা তাহাকেই নির্বৃতি বলা যায়। এ কথাতে এরূপ কেহ মনে করিবেন না যে, ধর্ম্মের ভূমিতে আরোহণ করিলে আর মানব-জীবনে সংগ্রাম থাকে না। এতদ্দেশের ধর্ম্মসাধকগণ একপ্রকার শান্তির প্রয়াসী যাহার অপর নাম সংগ্রাম-রাহিত্য। আত্মার সংগ্রাম রহিত নিষ্ক্রিয় অবস্থাকেই তাঁহারা প্রার্থনীয় মনে করেন; এবং তাঁহারা যে কিছু সাধন-প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়াছেন, সে সকলের একই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত, নিস্পৃহ ও নিষ্ক্রিয় হওয়া। কিন্তু ভক্তিমার্গাবলম্বিগণ আর একপ্রকার শান্তির প্রয়াসী। তাঁহারা বলেন—জীবনের সকল প্রকার পরীক্ষা ও আন্দোলনের মধ্যে আশা ও প্রেম যদি হৃদয়কে পরিত্যাগ না করে, যদি সত্যস্বরূপের সত্যজ্যোতি আমাদের চক্ষু হইতে অন্তর্হিত না হয়. তাহা হইলেই আমরা সুখী। যেদেশে ধর্ম্মের বাস সে দেশে এই প্রকার সুখ সাধকচিত্তে সর্ব্বদাই বিদ্যমান।

ধর্ম্ম কি এ বিষয়ে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। কোন কোনও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মতে ধর্ম্ম এমন কতকগুলি কার্য্য যদ্দ্বারা স্বর্গবাসের উপযুক্ত হওয়া যায়, বা কর্ম্মভোগ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়; কাহার কাহারও মতে ধর্ম্ম এমন কতকগুলি আচরণ যদ্দ্বারা কুপিত ঈশ্বরের কোপ শান্তির উপায় বিধান হয়; কিন্তু আমাদের মতে ধর্ম্ম সেই আধ্যাত্মিক

অবস্থা যাহাতে আরোহণ করিলে আত্মা স্বাধীনতা, পবিত্রতা, প্রেম ও আনন্দে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ঈশ্বরচরণে বিহার করিতে থাকে। ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে হয় না, পরকালের খাতাতে জমার ঘরে লিখিতে হয় না, কিন্তু ধর্ম্ম হইতে হয়। প্রকৃত প্রেমিক ও ভক্ত ধার্ম্মিকের পক্ষে ধর্ম্ম শিশুর স্কন্ধে আরোপিত প্রৌঢ়ের পোষাকের মত নহে, কিন্তু নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় স্বাভাবিক। ইহা তাঁহাদের উত্থান ও শয়নে, অশনে বসনে প্রকাশ পায়। জগতের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাত্মাগণ ধর্ম্মের এই স্বাভাবিকতার নিদর্শন স্বরূপ। বুদ্ধ, যীশু মহম্মদ সকলেরই জীবনে দেখিতে পাই যে ধর্ম্ম তাঁহাদের জীবনে স্বাভাবিক ভাবেই বাস করিয়াছে! মহাত্মা বুদ্ধের জীবনে ইহার অত্যাশ্চর্য্য প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি ছয় বৎসর কাল অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু যখনি মনে করিলেন যে সত্যালোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখনি পূর্ব্বকার কঠোর তপস্যার অনাবশ্যকতা ও অকিঞ্চিৎকরতা অনুভব করিলেন, এবং ধর্ম্ম সাধনের জন্য মধ্য পথই অবলম্বনীয় বলিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন। মহাত্মা যীশুও পরিষ্কার রূপেই বলিতেন যে তাঁহার ধর্ম্ম কৃচ্ছ সাধনের ধর্ম্ম নহে। তিনি বলিতেন,—"জন উপবাস ও কৃচ্ছ্র সাধনের উপদেশ দিতেন, আমি নিয়মিত আহার বিহারের উপদেশ দিয়া থাকি।" মহম্মদেরও ধর্ম্মভাব অতিশয় স্বাভাবিক ছিল। তিনি সাধনাবস্থাতে হরা পর্ব্বতের গুহাতে অনেক দিন নির্জ্জন চিন্তাতে ও কঠোর তপস্যাতে যাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যখনি সিদ্ধিলাভ করিলেন, তখনি তাঁহার ধর্ম্ম নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের

ন্যায় স্বাভাবিক হইয়া গেল। তখন তিনি বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ এই সকল মহাজনের জীবন আলোচনা করিলেই গীতার একটী বচনের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। গীতার সেই বচনে আছে ঃ—

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥ ১৬॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥১৭॥

গীতা, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

অর্থ—হে অর্জ্জুন, যে অত্যন্ত আহার করে বা একেবারে অনাহারে থাকে, যে অতিমাত্র নিদ্রা যায় বা অত্যন্ত জাগরণ করে তাহার যোগ হয় না ; কিন্তু যে ব্যক্তি পরিমিত আহার বিহার, পরিমিত শ্রম, পরিমিত নিদ্রা ও পরিমিত জাগরণ করিয়া থাকে, যোগ তাহারই দুঃখ হানির কারণস্বরূপ হইয়া থাকে।” সত্যের সাক্ষাৎ দর্শনের নামই সিদ্ধিলাভ। এই সিদ্ধিলাভ হইলে মানবাত্মা এরূপ তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করে যে চিত্ত তখন নিরুপদ্রবে, নিরুদ্বেগে, ধর্ম্মের ভূমিতে সর্ব্বদা বাস করিতে থাকে।

মানব-জীবনে সুখ দুঃখ।

"বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব।"

— শ্রুতি।

অর্থ—"হে দেব! হে পিতঃ! আমাদের পাপ সকল হরণ কর।"

অতি প্রাচীনতম কাল হইতেই মানুষ বুঝিয়াছে যে, সে পাপী, এবং সেই প্রাচীনতম কাল হইতেই, "পাপ তাপ হইতে উদ্ধার কর" এই প্রার্থনা মানব-মুখে ফুটিয়াছে। নানা দেশের নানা জাতির ধর্ম্মসাধকগণ ধর্ম্মসাধনের যে সকল প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন, দার্শনিকগণ যে সকল দর্শন রচনা করিয়াছেন, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য মানুষকে দুঃখ ও পাপ হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া। মানব-জীবনে এই দুঃখ ও পাপ কিরূপে প্রবিষ্ট হইল?

একবার ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে কোনও স্থানে গিয়াছিলাম। সেখানে কতিপয় ইউরোপীয় খ্রীষ্টান প্রচারকের সহিত আমার বিচার উপস্থিত হয়। তাঁহারা আমাকে প্রশ্ন করিলেন, "মঙ্গলময় ও সর্ব্বশক্তিমান্ বিধাতার রাজ্যে পাপ ও দুঃখের উৎপত্তি ও স্থিতি বিষয়ে তোমাদের কি মত?" আমি বলিলাম, "তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে কেন যে তিনি পাপ ও দুঃখকে থাকিতে দিলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে বলিতে পারি না, তবে এইমাত্র জানি যে, তিনি মঙ্গলময়, নিশ্চয় ইহার মূলে তাঁহার কোনও মঙ্গলকর উদ্দেশ্য বিদ্যমান আছে।"

ইহাতে ঐ খৃষ্টীয় প্রচারকগণ সন্তুষ্ট না হইয়া আমাকে

বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন "তোমাদের মানবের মনঃকল্পিত ধর্ম্মের দুর্ব্বলতা কোথায় তাহা দেখ, এমন একটা গুরুতর বিষয়ে তোমাদের ধর্ম্ম কোনও একটা সদুত্তর দিতে পারে না।" আমি প্রশ্ন করিলাম, "আচ্ছা, আপনারা এই প্রশ্নের কি উত্তর দিয়া থাকেন?" তাঁহারা বলিলেন,—"কেন আমাদের উত্তর অতি সহজ; পাপ মানবের আদি পিতামাতার অবাধ্যতা বশতঃ সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছে; এবং ঈশ্বরের শত্রু শয়তান ঈশ্বরের জগতে দুঃখরূপ বিষ ঢালিয়া দিয়াছে।" আমি পুনরায় প্রশ্ন করিলাম, "আচ্ছা, ঈশ্বর মানবের আদি পিতামাতাকে এমন করিয়া কেন সৃষ্টি করিলেন, যে তাঁহাদের পক্ষে পতন সম্ভব হইল? দ্বিতীয়তঃ শয়তান যে জগতে দুঃখ আনিয়াছে, সে ঈশ্বর অপেক্ষা বলবান অথবা তাঁহার সমকক্ষ কি না?" তাঁহারা বলিলেন, "না শয়তান ঈশ্বর অপেক্ষা কখনই বলবান নহে, কারণ ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান।" আমি বলিলাম, "আচ্ছা, তাহা যদি হয়, তবে সর্ব্বশক্তিমান মঙ্গলময় বিধাতা কেন শয়তানকে বিনাশ করিলেন না, বা কারাগারে আবদ্ধ রাখিলেন না, তাহা হইলে ত সৃষ্টিতে দুঃখ প্রবেশ করিতে পাইত না। যদি বলেন, ঈশ্বর নিজের সর্ব্বশক্তিমত্তা সত্ত্বেও কোনও অপরিজ্ঞাত মঙ্গলকর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শয়তানকে দুঃখ দিবার স্বাধীনতা দিয়া রাখিয়াছেন, তবে একথা বলিলে দোষ কি যে তিনি কোনও অপরিজ্ঞাত মঙ্গলকর উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত আমাদিগকে পাপে ও দুঃখে পড়িবার শক্তি ও স্বাধীনতা দিয়া রাখিয়াছেন।"

সেই একদিনের বিচারে যে কঠিন প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছিল, সেই প্রশ্নে যুগে যুগে চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের চিত্তকে আন্দোলিত করিয়াছে। সে প্রশ্নটী এই—মঙ্গলময় বিধাতার রাজ্যে পাপ ও দুঃখ কেন? এই প্রশ্ন অতি প্রাচীনকালে ধর্ম্মসাধকদিগের মনে উঠিয়াছিল। তাঁহাদের অনেকে ইহার একটা সহজ মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন এবং সে মীমাংসা তৎকালের জ্ঞানের অবস্থাতে তাঁহাদের মনের পক্ষে সন্তোষজনক বোধ হইয়াছিল। তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিলেন যে, জগতে দুই পরস্পরবিরোধী শক্তি কার্য্য করিতেছে, এক মানবের অনুকূল অপর মানবের প্রতিকূল। প্রাচীন পারস্যবাসী অগ্ন্যুপাসকদিগের মধ্যে এই মত অতিশয় প্রবল হইয়াছিল। তাঁহারা আহুরা মাজদা ও অঙ্গ্রমন্যু বা আহিরমান এই দুইটী শক্তিতে বিশ্বাস করিতেন। তাঁহাদের নিকট হইতেই এই মত য়িহুদীদিগের মধ্যে ও তৎপরে খ্রীষ্টধর্ম্মে ও ইস্‌লাম ধর্ম্মে সংক্রান্ত হইয়াছে। এতদ্দেশেও প্রাচীন পৌরাণিক ধর্ম্মে দেবাসুরের বিবাদে এই মতেরই আভাস পাওয়া যাইতেছে। এখনও অনেক অসভ্যজাতি দুইটী ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, এক ভাল ঈশ্বর ও আর এক দুষ্ট ঈশ্বর। তাহারা দুষ্ট ঈশ্বরের স্তুতি বন্দনা করিয়া থাকে, কারণ ভাল ঈশ্বর অনিষ্টকারী নহেন। জগতে সুখ ও দুঃখের উৎপত্তিকে দুই বিভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী শক্তির কার্য্য বলিয়া প্রাচীনকালের সাধকগণ আপনাদিগকে এক প্রকার পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞান যে সকল মহাতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে,

তন্মধ্যে একটী এই যে, এক অনাদি ও অবিনশ্বর শক্তি বিবিধ আকারে এই ব্রহ্মাণ্ডে ক্রীড়া করিতেছে, এবং এ জগতে যে সকল ভৌতিক নিয়ম প্রতিষ্ঠিত তাহাদের কার্য্য সর্ব্বত্রই এক-প্রকার। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয়, এ ব্রহ্মাণ্ড সমগ্র-ভাবে এক। সুতরাং যদি এক ব্রহ্মাণ্ডের কোনও জ্ঞানসম্পন্ন আদিকারণ মানিতে হয়, তবে সে আদিকারণ যে এক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এ জগতের পদার্থ সকল ও ক্রিয়া সকল এত ঘনিষ্টভাবে পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ ও এত প্রকারে পরস্পরের প্রতি নির্ভর করে যে, হয় বল যে এই জগচ্চক্রের উপরে একজনেরই হাত, না হয় যদি ইহার একাধিক প্রভু মানিতে হয়, তবে বল, তাঁহাদের একটী সভা আছে, এবং সে সভার পরামর্শে কখনও মতদ্বৈধ উপস্থিত হয় না। ফলতঃ জগৎকারণের একত্ব বিষয়ে অধুনাতন বিজ্ঞান আমাদিগকে নিঃসংশয় করিয়াছে।

জগৎকারণ যদি এক হইলেন তবে তাঁহার রাজ্যে সুখ ও দুঃখ কিরূপে একত্রে বাস করিতেছে? ইহার উত্তরে আমরা বলিয়া থাকি, পরস্পরবিরোধী ও পরস্পর-বিসম্বাদী পদার্থ দ্বয়ের একত্র সমাবেশ দেখিয়া বিশেষ চিন্তিত বা বিস্মিত হইবার প্রয়োজন নাই। এরূপ পরস্পর-বিরোধী পদার্থ তাঁহার সৃষ্টিরাজ্যের আরও অনেক স্থানে রহিয়াছে। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, এই পৃথিবীর প্রত্যেক পরমাণুর উপরে একই সময়ে দুই পরস্পরবিরোধী শক্তি কার্য্য করিতেছে, একের নাম কেন্দ্রাভিসারিণী শক্তি, অপরের নাম

কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি। কেন্দ্রাভিসারিণী শক্তি প্রত্যেক পরমণুকে কেন্দ্রের দিকে লইয়া যাইতে চাহিতেছে. কিন্তু কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি প্রত্যেক পরমাণুকে প্রতি মুহূর্ত্তে কেন্দ্র হইতে দূরে লইয়া যাইতেছে। কেহ বলিতে পারেন, বিধাতার একি কৌতুক করা যে তিনি একই বস্তুর উপরে একই সময়ে দুই প্রকার শক্তি প্রয়োগ করিলেন? তদুত্তরে বিজ্ঞানবিৎ বলিবেন, তদ্ভিন্ন এই পৃথিবী এমন সুন্দর গোলাকৃতি ধারণ করিত না। এইরূপ মানব-সমাজের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া ও মানব-হৃদয়ে নিমগ্ন হইয়া দেখ, একই মানবহৃদয়ে একই সময়ে ক্রোধ ঈর্ষ্যা প্রভৃতি স্বার্থরক্ষিণী ও প্রেম দয়া প্রভৃতি পরার্থ-রক্ষিণী বৃত্তি সকল কার্য্য করিতেছে। যদি বল এমন কেন হইল, তদুত্তরে বক্তব্য, এরূপ না হইলে, জনসমাজের উন্নতি সম্ভব হইত না। পরার্থ-রক্ষিণী বৃত্তির অভাবে মানবগণ পরস্পর হইতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া বন্য শ্বাপদকুলের অবস্থাতে থাকিত, আবার স্বার্থরক্ষিণী বৃত্তিনিচয়ের সম্পূর্ণ অভাব হইলে প্রত্যেক মানব আত্মরক্ষাতে অসমর্থ হইয়া ঘোর সামাজিক দাসত্বে পরিণত হইত। সেইরূপ আমরা বলিতে পারি, মানবকে বিকশিত, বর্দ্ধিত, সবল ও কার্য্যক্ষম করিবার জন্য সুখ দুঃখ উভয়েরই প্রয়োজন। দুঃখের তাড়না না থাকিলে জীব-জগতে বর্ত্তমান উন্নতি ও বিকাশের কিছুই লক্ষিত হইত না। বাঘে না তাড়িলে হরিণের পদদ্বয় দীর্ঘ ও ধাবনক্ষম হইত না।

কেহ হয়ত বলিবেন যে সকল বিষয়ে মানুষের কোনও হাত নাই, সে সম্বন্ধে মোটামুটি ঈশ্বরাভিপ্রায় যেন একপ্রকার বুঝা

গেল, কিন্তু মানব যে নিজ পাপ-নিবন্ধন দুঃখ উৎপন্ন করে, মঙ্গলময় বিধাতা ইহা মানবের পক্ষে সম্ভব করিলেন কেন ? এই প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হইলেই মানবাত্মার স্বাধীনতারূপ মহা-জটিল প্রশ্নের মধ্যে পতিত হইতে হয়। যদি বল এ জগতে মানবাত্মা যাহা কিছু করে তাহা করিতে সে বাধ্য, সে বিষয়ে তাহার স্বাধীনতা নাই, তাহা হইলে সে সকল কার্য্যের জন্য মানবের দায়িত্বও নাই, এবং তন্নিবন্ধন দণ্ড ও পুরস্কারও নাই। সুতরাং আইন,আদালত, কারাগার এ সমুদায় প্রতিষ্ঠিত হইবার অবসর নাই। যদি কোনও ক্ষুধার্ত্ত পক্ষী তোমার উদ্যানের ফল খাইয়া যায়, তবে সে চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডনীয় বলিয়া গণ্য হয় না ; অথবা তোমার কুকুর যদি তোমার জলমগ্ন বালকের বস্ত্র ধরিয়া টানিয়া তীরে তোলে তাহা হইলে মহাধার্ম্মিক কুকুর বলিয়া কোনও সভার প্রদত্ত স্বর্ণ পদক পাইবার উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হয় না। মানবের সম্বন্ধেই যে আমরা ধর্ম্মাধর্ম্ম, পুণ্যপাপ অথবা দণ্ড পুরস্কার প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করি, তাহার কারণ এই, যে আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ হৃদয়ের অন্তস্তলে এই বিশ্বাস করি যে মানব সত্য অসত্য, ন্যায় অন্যায়, পাপ ও পুণ্য উভয় জানিয়া একেকে গ্রহণ ও অপরকে বর্জ্জন করিয়া থাকে এবং সেরূপে গ্রহণ ও বর্জ্জন করিবার স্বাধীনতা তাহার আছে। সে যখন অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তখন আমরা মনে করি সে শক্তি থাকিতেও সৎকে ছাড়িয়াছে, সেই জন্য সে নিন্দনীয়। আবার যখন সে সৎকে অবলম্বন করে তখন মনে করি শক্তি থাকিতেও অসৎকে বর্জ্জন করিয়াছে, সেই জন্য সে প্রশংসনীয়।

এই সৎ ও অসতের ঘাত প্রতিঘাতের সন্ধিস্থলই ধর্ম্মের উৎপত্তি; ইহা না থাকিলে ধর্ম্ম থাকে না।

কিন্তু ইহার অন্তরালে আর একটী প্রশ্ন নিহিত আছে, যাহা যুগে যুগে ধর্ম্মসাধকদিগকে মহাসমস্যার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে। আমরা চিন্তা করিলেই দেখিতে পাই মানবের বিবেক বা ধর্ম্মবুদ্ধি, যাহা মানবের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করে, এবং মানবের বিচারশক্তি, যাহা সত্যাসত্য বিচার করে, উভয়ই ভ্রান্তিশীল। মানবজাতির ইতিবৃত্তে এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই, যে কোনও জাতি এক সময়ে কোন কার্য্যেকে অতি প্রশংসিত কার্য্য মনে করিত, আবার জাতীয় চিন্তার পরিবর্ত্তন সহকারে তাহাকেই নীতিবিগর্হিত কার্য্য বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছে। এইরূপ ব্যক্তিগত জীবনেও দেখি মানুষ আজ যে কার্য্যকে ধর্ম্মকর্ম্ম বোধে আচরণ করিতেছে, কিয়দ্দিন পরে, তাহাকেই ঘোর অধর্ম্মবোধে পরিত্যাগ করিতেছে। তবে ধর্ম্মবুদ্ধির আদেশের উপরে অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকিবার উপায় কোথায়? বিচারশক্তির ত কথাই নাই—তাহা আজ যাহাকে সত্যবোধে গ্রহণ করে কল্য তাহাকে অসত্যবোধে পরিত্যাগ করে। এখন প্রশ্ন এই মানবের ধর্ম্মজীবন ও পরিত্রাণের ন্যায় গুরুতর ব্যাপার কি এমন সন্দেহাকুল ও চঞ্চল ভিত্তির উপরে স্থাপন করা যায়? অথবা করা কি যুক্তিসঙ্গত? অনেক সাধক মনে করিয়াছেন, যে এরূপ ভিত্তির উপরে মানবের ধর্ম্মজীবন স্থাপিত হইতে পারে না। এই কারণে তাঁহারা মানবের পরিত্রাণকে ভ্রান্তিশীল বিচারশক্তি ও ভ্রান্তিশীল ধর্ম্মবুদ্ধির উপরে স্থাপন না করিয়া ঈশ্বরের

অভ্রান্ত বাণীর উপরে স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বরের অভ্রান্তবাণী জানা যায় কিরূপে? কোন কোনও সম্প্রদায় বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর মানবাকার ধারণ করিয়া ধরাধামে মানবকুলের মধ্যে বাস করিয়া মানবীয় ভাষাতে তাঁহারা উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থবিশেষে সেই সকল উপদেশ সংকলিত হইয়া রহিয়াছে, তদনুসারে আপনার জীবনকে গঠন কর, পরিত্রাণ পাইবে। এই মতের বিরুদ্ধে অনেক কঠিন কঠিন আপত্তি উঠিয়াছে। তাহার কোন কোনটী মারাত্মক, তাহার আর উত্তর দিবার উপায় নাই। কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন ঈশ্বর যে ঐ আকারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? অপর কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন. যেগুলি তাঁহার উক্তি বলিয়া সংগৃহীত হইয়াছে,তাহা যে বস্তুতঃ তাঁহারই উক্তি. তন্মধ্যে মানবীয় কিছু যে প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, তাহার প্রমাণ কি? তৃতীয়তঃ কেহ বলিতে পারেন সেই উক্তিগুলির নানাবিধ অর্থ হইতে পারে. তোমার অবলম্বিত অর্থই যে ঈশ্বরের অর্থ তাহার প্রমাণ কি? এই আপত্তিটী মারাত্মক, কারণ যদি আমার ভ্রান্তিশীল বিচারশক্তি ও ভ্রান্তিশীল ধর্ম্মবুদ্ধিকেই বিচারকরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া শাস্ত্রের অর্থ নির্ণয় করিতে হইল, তবে আর অভ্রান্ত ঈশ্বরীয় শাস্ত্র পাইয়া কি লাভ হইল? যদি বল মহাজনদিগের প্রণালী দর্শনে শাস্ত্রের মর্ম্ম অনুভব করিতে হইবে, তাহা হইলে বলি. মহাজনদিগের মধ্যে যখন মতদ্বৈধ বিদ্যমান, তখন আমি কাহাকে অবলম্বন করি? এবং সেই অবলম্বন বিষয়েও ত আমার ভ্রান্তিশীল বিচারশক্তি

ও ধর্ম্মবুদ্ধিই ত বিচারক। কেহ কেহ বলিয়াছেন ঈশ্বর যে কোনও কালে ধরাধামে আসিয়াছিলেন, আর আজ ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহা নহে, তিনি এখনও বিশেষ বিশেষ আত্মাতে অবতীর্ণ হইয়া অভ্রান্ত মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করিতেছেন, অতএব মুক্তির জন্য গুরু বিশেষকে আশ্রয় করিতে হইবে। যদি ইঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যায় এই বিশেষ ব্যক্তিদিগের মধ্যে কে আমার পরিত্রাণের পক্ষে সমর্থ কিরূপে জানিব? তাহাতেও ত আমাকে ভ্রান্তিশীল বিচারশক্তি ও ভ্রান্তিশীল ধর্ম্মবুদ্ধির দ্বারা বিচার করিতে হইবে। তাহার উত্তরে ইঁহারা হয় ত বলিবেন যে, গুরু নির্ণয় করা পর্য্যন্ত তোমার বিচারশক্তির কাজ আছে; তুমি ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়া তোমার জ্ঞানের সাহায্যে তাহা করিবে; কিন্তু একবার গুরু নির্ণীত হইলে আর তোমার বিচার-শক্তির প্রয়োজন নাই; তখন তুমি অবিচারিত চিত্তে গুরুর আদেশ পালন করিবে। ইহা বলিলে এই কথা বলা হয়, যখন তুমি কোনও একটী বিশেষ ভবনে যাইতেছ, তখন পথে তোমার দুইটী চক্ষের প্রয়োজন, তুমি চক্ষু খুলিয়া পথ দেখিয়া সেই ভবনের পথ নির্ণয় কর। কিন্তু সে ভবনের দ্বারে যখন পৌঁছিবে, তখন দুইটী লৌহশলাকার দ্বারা দুইটী চক্ষু বিদ্ধ ও অন্ধ করিয়া দ্বারবানের হস্তে আপনার হস্ত অর্পণ কর, তৎপরে সে তোমাকে যেখানে বসাইবে সেইখানে বস, যেখানে লইয়া যায়, সেখানে যাও। এরূপ উপদেশের যুক্তিযুক্ততা আমরা অনুভব করি না। ঐশ্বরিক প্রেরণা যদি আমার ভ্রান্তশীল বিচারশক্তি ও ধর্ম্ম-বুদ্ধিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গুরু সন্নিধানে লইতে পারে, তবে সেই

ঐশ্বরিক প্রেরণা কেন আমাকে স্বাধীন রাখিয়াও ধর্ম্মজীবনের উন্নতির পথে লইতে পারিবে না ?

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের বিভিন্ন প্রকার মতের উল্লেখ ও সমালোচনা দ্বারা ইহাই প্রকাশ করিতে চাহিয়াছি যে,আমাদের বিচারশক্তিও ধর্ম্মবুদ্ধি ভ্রান্তিশীল হইলেও তাহারা প্রতি মুহূর্ত্তে যাহাকে সত্য ও কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তাহাই আমাদের পক্ষে অবলম্বনীয়, এবং তদুপরেই আমাদের ধর্ম্মজীবনকে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইবে। এ ভিত্তি সময়ে সময়ে সংশয়াকুল হইলেও গত্যন্তর নাই। বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখা গিয়াছে, মানবের ধর্ম্মজীবনকে এ ভিত্তি হইতে তুলিয়া যাঁহারা অপর কোনও ভিত্তির উপর স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারাই মানব-জীবনকে দুর্গতি প্রাপ্ত করিয়াছেন ; মানবাত্মার এবং মানব-সমাজের উন্নতি ও বিকাশের পথে মহা অর্গল স্থাপন করিয়াছেন ; এবং চিন্তা ও সাধনার একতা স্থাপনে মহাপ্রয়াসী হইয়াও একতা স্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই। রাত্রিকালে তোমার দ্বারে যে কুকুর শয়ন করিয়া থাকে, তাহাকে আফিং খাওয়াইয়া যদি ঘুম পাড়াও, তবে যেমন তোমার ঘরে চুরি হইবার সম্ভাবনা, তেমনি মানবাত্মার স্বাধীনতা ও বিচারশক্তিকে হরণ করিয়া যদি ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন কর, তবে ধর্ম্মধন অপহৃত হইবার সম্ভাবনা। তবে কি ভ্রান্তিশীল মানব সম্পূর্ণরূপে আপনার উপরেই নির্ভর করিতেছে ? গুটি-পোকার গুটি যেমন তাহারই দেহ বিনিঃসৃত তেমনি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় তাবত ব্যাপার কি কেবল মানবেরই বুদ্ধি-প্রসূত ? ঐশ্বরিক

প্রেরণা কি তন্মধ্যে কিছু নাই? ইহা কে বলিবে? যেমন জগতের সমুদায় তাপ সূর্য্যেরই অভিব্যক্তি, তেমনি সমুদায় সত্য ও সমুদায় মঙ্গলভাব ঈশ্বরেরই অভিব্যক্তি। ভ্রান্তিশীল মানবকে স্বাধীন রাখিয়াও তিনি তাহাকে আপনার অভিমুখে লইয়া যান এই তাঁহার মহত্ত্ব। তিনি আমাদিগকে পূর্ণ স্বাধীন রাখিয়াও আপন ইচ্ছার পূর্ণ অধীন করিয়া লইতে পারেন, এই তাঁহার অদ্ভুত কৌশল।

একাধারে দেব ও মানব

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।"

—উপনিষদ্।

অর্থ—"দুই সুন্দর পক্ষযুক্ত পক্ষী এক বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া আছে; ইহারা উভয়ে উভয়ের সখা।"

দুই সুন্দর পক্ষযুক্ত পক্ষী অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এক বৃক্ষকে অর্থাৎ এক দেহকে আশ্রয় করিয়া আছেন। যে ঋষি এই বচন রচনা করিয়াছিলেন, তিনি আপনার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া এমন কি দেখিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার বোধ হইল যে এই দেহ-মন্দিরে দুইজন বাস করিতেছে, একজন ফল-ভোক্তা অপর জন দ্রষ্টা। আমরাও কি আত্মদৃষ্টি দ্বারা আত্মপরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইলে, ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকি?

মানবাত্মার দুই একটী বিভাগ আছে, যাহার প্রতি দৃষ্টি-

পাত করিলে এই দ্বিত্ব-বুদ্ধি মনে প্রবল হয়। ইতর প্রাণিগণের সহিত তুলনা করিলে একটী গুরুতর বিষয়ে মানবের প্রভেদ দেখিতে পাই। ইতর প্রাণিগণ সর্ব্বদাই বর্ত্তমানে সন্তুষ্ট। তাহারা যদি ক্ষুধার অন্ন পায় ও প্রতি মুহূর্ত্তের প্রবৃত্তি সকলকে চরিতার্থ করিবার উপযোগী পদার্থ পায়, তাহা হইলেই তাহারা তৃপ্ত থাকে; তাহাদের আকাঙ্ক্ষা আর অধিক দূরে যায় না; ক্রোড়স্থিত পদার্থকে অবজ্ঞা করিয়া তাহারা ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। কিন্তু মানব তাহা করিয়া থাকে। মানব সর্ব্বদাই বর্ত্তমানে অসন্তুষ্ট ও ভবিষ্যতের মুখাপেক্ষী। মানব প্রকৃতিই এইরূপ দেখি যে, কোনও একটী বিষয় যতদিন অজ্ঞাত ছিল, ততদিন মন তাহা জানিবার জন্য উৎসুক ছিল, জানিতে না পারিয়া অসুখী ছিল, যখন তাহা জানিল তখন সুখী হইল বটে, কিন্তু তৎপরক্ষণেই তাহাতে ঔদাসীন্য বুদ্ধি আসিল; এবং চিত্ত সম্মুখে যাহা আছে তাহা জানিবার জন্য আবার ব্যগ্র হইল। এইরূপে মানব-মন নিরন্তর ক্রোড়স্থিত পদার্থকে উপেক্ষা করিয়া ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে; জ্ঞাত বিষয়কে পশ্চাতে রাখিয়া অজ্ঞাত রাজ্যের যবনিকা উত্তোলন করিবার প্রয়াস পাইতেছে! মানবের এই যে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া যদি ইহার সীমা নির্দ্ধারণ করিতে যাই, তাহা হইলে ইহার সীমা পাই না। মানবের জ্ঞানস্পৃহা যাহা চাহিতেছে তাহা দেও, এবং তার পর, তার পর, করিয়া প্রশ্ন কর ও দিতে থাক, দেখিবে এমন একটী রেখা কোথাও পাইবে না, যাহার পর মানব-জ্ঞান আর

কিছু চাহিবে না। অতএব দেখিতেছি যে, মানবের জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা অসীম ও অনন্ত-মুখীন। কেবল জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা নহে মানব-প্রকৃতিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, প্রেম, পুণ্য প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষাও এইরূপ অসীম ও অনন্ত-মুখীন। মানবাত্মাতে এই এক আশ্চর্য্য দ্বিত্বভাব। একজন প্রতিমুহূর্ত্তে বিষয় সকল ভোগ করিতেছে আর একজন কে যেন হৃদয়ে থাকিয়া বলিতেছে, "অনন্ত উন্নতি তোমার জন্য আছে, অগ্রসর হও, অগ্রসর হও!" মানবাত্মার এই অতৃপ্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অনেক চিন্তাশীল সাধক বলিয়াছেন যে, ইহা পরমাত্ম-সত্তার একটী প্রমাণ-স্বরূপ। মানব এ সংসারে একাকী বাস করিতেছে না, ; তাহার হৃদয়-মধ্যে আর একজন সন্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। কোনও কোনও সাধক এই অতৃপ্তির আরও অন্তরালে প্রবেশ করিয়া আরও একটী তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, এই অতৃপ্তি যে কেবল অজ্ঞাত ভবিষ্যতের দিকে আমাদের দৃষ্টিকে প্রেরণ করিতেছে, তাহা নহে, কিন্তু সেই ভবিষ্যতকে আশার সুন্দর বর্ণে চিত্রিত করিয়া দেখাইতেছে। এই আশাই মানব-প্রকৃতির গভীর রহস্য। সর্ব্বত্রই এই নিয়ম দেখিতে পাই, অতীত ও বর্ত্তমান দেখিয়া আমরা ভবিষ্যতের বিচার করিয়া থাকি। তোমার প্রতি কোনও কার্য্যের ভার দিয়া যদি দশবার দেখি যে, তুমি নিজের দায়িত্ব বুঝিয়া কার্য্য কর না, তবে আর তোমার প্রতি নির্ভর করিতে পারি না। এক ব্যক্তি যদি কথা দিয়া দশবার সে কথা ভঙ্গ করে, তবে তাহার

কথার প্রতি নির্ভর রাখিতে পারি না। প্রতিদিন প্রাতে পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যোদয় হয়, কখনই ইহার ব্যতিক্রম ঘটে না; এজন্য সূর্য্যোদয়ের প্রতি অবিচলিত আস্থা স্থাপন করিয়াছি; কিন্তু দশ দিন যদি এমন হয় যে প্রাতে পূর্ব্বাকাশে আর সূর্য্য আসিল না, তাহা হইলে আর প্রাকৃতিক নিয়মের অবশ্য-ম্ভাবিতার প্রতি বিশ্বাস থাকিবে না। এই ত মানব-মনের স্বভাব। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, একস্থানে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতেছি। নিজের জ্ঞান, প্রেম, ও পুণ্যভাব সম্বন্ধে অক্ষয় আশা আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। নিজ আত্মাকে পরীক্ষা করিলেই দেখিতে পাই যে, একটী শুভ সংকল্পকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, দশবার শতবার দুর্ব্বলতা বশতঃ সে আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি, প্রবৃত্তিকুলের নিকট পরাস্ত হইয়াছি, অথচ প্রাণের মধ্যে থাকিয়া কে যেন বলিয়া দিতেছে যে, চরমে প্রেম ও পুণ্যের জয় হইবেই হইবে, আমার সম্মুখে যে আদর্শ রহিয়াছে, তাহা উৎকৃষ্ট, এবং আমার বর্ত্তমান জীবন নিকৃষ্ট, অথচ আমার সহস্র দুর্ব্বলতা সত্ত্বে আমি একদিন ঐ উচ্চ ভূমিতে উঠিবই উঠিব। এইরূপে জীবন-সংগ্রামে আমরা বার বার প্রবৃত্তিকুলের দ্বারা পরাজিত হইতেছি, আবার যেন উঠিয়া অঙ্গের ধূলি ঝাড়িয়া সম্মুখে অগ্রসর হইবার আশা করিতেছি। এমন কেন হয়? সর্ব্বত্রই যে নিয়মানুসারে বিচার করি, নিজের বেলা কেন তাহার ব্যতিক্রম ঘটে? নিজের বেলা শতবার পরাস্ত হইয়াও কেন জয়ের আশা করি? শতবার

পতিত হইয়াও কেন উঠিয়া দাঁড়াইবার সম্ভাবনা দেখি? বর্ত্তমান সময়ের একজন ঋষি বলিয়াছেন, ইহাতেই প্রমাণ, পরমাত্মা আমাদের আত্মাতে সন্নিবিষ্ট হইয়া আছেন। এই আশার বাণী তাঁহারই। তিনি হৃদয়কে প্রেরণা করিয়া বলিতেছেন—"নিরাশ হইও না; ভগ্নোদ্যম হইও না; সত্য, প্রেম ও পুণ্যে সর্ব্বদা আশান্বিত থাক; চরমে এ সকলের জয় হইবেই হইবে।" ঈশ্বর মানব-হৃদয়ে বাস করিতেছেন বলিয়া মানুষ সত্যেতে ও সাধুতাতে বিশ্বাস রাখিতেছে। এই বিশ্বাস এমনি স্বাভাবিক যে মানুষ হাজার দুঃখের চক্ষে জগতকে ও মানব-সমাজকে দেখিলেও এ বিশ্বাস তাহাদের হৃদয়কে পরিত্যাগ করে না। ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়, যে সকল সাধক জনসমাজকে কুৎসিত ও ধর্ম্মের বিরোধী এবং মানব-প্রকৃতিকে পাপ-প্রবণ জানিয়া এ সকলকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গিয়াছেন, তাঁহারাও বনে বসিয়া শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। তাহার মূলে প্রবেশ করিলে কি দেখিতে পাই? মানবকে সত্য দিলে সে গ্রহণ করিবে এ বিশ্বাস যদি না থাকিত, তাহা হইলে কি ঐ সকল শাস্ত্রকর্ত্তা শাস্ত্র-রচনার ক্লেশ স্বীকার করিতেন? তবে মানব-হৃদয় স্বভাবতঃ এরূপ বিকৃত নয় যে সত্যালোক তাহার দ্বারে উপস্থিত হইলে প্রবেশ করিবার অবসর পাইবে না। অথবা সত্যের ও ধর্ম্মের শক্তিতে মানবের *এমনি স্বাভাবিক বিশ্বাস যে,* মানব-বিদ্বেষের কঠিন চাপেও তাহাকে চাপিয়া রাখিতে পারে না। বিশ্বাসের চক্ষে দেখ এই *অবিনশ্বর ও দুর্দ্দমনীয় বিশ্বাস ও আশার মধ্যে বিধাতা*

বর্ত্তমান ; দেব ও মানব একাধারে বাস করিতেছেন ; এই দিকে আমাদের প্রকৃতি তাঁহার সহিত সংসৃষ্ট রহিয়াছে।

আর একদিক দিয়া দেখিলে আমরা দেব ও মানবকে একাধারে দেখিতে পাই। মানব-হৃদয়ের যে ধর্ম্মবুদ্ধি তাহার প্রকৃতিও রহস্যময়। এই ধর্ম্মবুদ্ধির প্রকৃতি কি ও ইহা কিরূপে উৎপন্ন হয়, এই বিচারে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ বহুদিন ব্যাপৃত রহিয়াছেন। সে তর্কারণ্যে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে এই ধর্ম্মবুদ্ধি মানুষকে ইতর প্রাণী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়াছে। ইহার অনুরূপ বৃত্তি আর কোনও প্রাণীতে দৃষ্ট হয় না। অনুতাপ ও আত্মপ্রসাদ এই দুইটী অবস্থা কেবল মানবেই অনুভব করিয়া থাকে। অনেক দার্শনিক পণ্ডিত এই অনুতাপ ও আত্মপ্রসাদকে নানারূপে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন ইহার মূলে কেবল মানবের নিন্দা ও স্তুতি। অর্থাৎ জনসমাজে বাস করিয়া কতকগুলি কার্য্যকে নিন্দিত ও অপর কতকগুলিকে প্রশংসিত দেখিয়া আসিতেছি, দেখিয়া দেখিয়া তত্তৎ কার্য্যের সঙ্গে নিন্দা বা স্তুতির ভাব জড়িত হইয়া গিয়াছে, এখন সেই সকল কার্য্য দেখিলে বা চিন্তা করিলে সেই সঙ্গে নিন্দাজনিত ভয় বা প্রশংসাজনিত আনন্দের উদয় হয় ; তাহাই অনুতাপ ও আত্মপ্রসাদের আকার ধারণ করে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, জনসমাজের নিন্দা ও স্তুতি পূর্ব্ব-পুরুষ-পরম্পরা হইতে আমাদের দেহমনের সঙ্গে গঠিত হইয়া আসিয়াছে, এখন আমাদের যে অনুতাপ বা আত্ম-প্রসাদ হইতেছে, তাহা কতকটা স্বাভাবিক

ক্রিয়া। তদুপরি আমাদের বা জনসমাজের হাত নাই। এইরূপে ধর্ম্মবুদ্ধিকে উড়াইয়া দিবার জন্য যিনি যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তাহা কিছুই সন্তোষ-জনক হয় নাই। ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন যে, ধর্ম্মবুদ্ধি যে তুলাদণ্ড হস্তে ধরিয়া কেবল সৎ অসৎ, ন্যায় অন্যায়, বিচার করে তাহা নহে, কিন্তু অসৎকে বর্জ্জন করিয়া সৎকে গ্রহণ করিবার জন্য চিত্তকে প্রেরণা করে ; এবং অসৎকে গ্রহণ করিলে চিত্তকে তিরস্কার করে। এই প্রেরণা ও এই তিরস্কার যে কিরূপ তাহা আমরা সকলেই কিছু কিছু জানি। এই প্রেরণা ও তিরস্কার সময়ে সময়ে আমাদিগকে অস্থির করিয়া তুলে। আমরা আহার বিহারে শান্তি পাই না ; সজন হইতে নির্জ্জনে যাই, নির্জ্জনতা আমাদিগকে এই হৃদয়স্থ সাক্ষীর নিকট হইতে লুকাইতে পারে না ! আমরা জনকোলাহলের মধ্যে প্রবেশ করি, আমোদ-তরঙ্গে ভাসিবার প্রয়াস পাই, কিন্তু সেই কোলাহল ও আমোদ প্রমোদের মধ্যে এই প্রেরণা ও এই তিরস্কার আমাদিগকে শান্তিহীন করিয়া ফেলে ! সকল কোলাহলের মধ্যে এক বাণী পরিষ্কাররূপে শুনিতে পাই, যাহা বলে—"রে পামর, তুমি বৃথা কেন আপনা হইতে আপনাকে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছ ?" অমনি আমাদের সকল সুখ বিষাক্ত হইয়া যায়। প্রশ্ন এই, এই প্রেরণা ও এই তিরস্কার কার ? যদি বল ইহা আমাদেরই,—আমাদেরই এক চিন্তা অপর চিন্তাকে প্রেরণা করে বা লজ্জা দেয়, তাহা বলিতে পারা যায় না। আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাই যে, এই প্রেরণা ও এই তিরস্কারের

হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য, এই যাতনা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য, আমরা আত্ম-পক্ষসমর্থনের প্রয়াস পাই; আপনাদের অপরাধ ভার লঘু করিবার নিমিত্ত যুক্তির পর যুক্তি পরম্পরা উদ্ভাবন করি। যে অবস্থাকে ক্লেশকর মনে করিয়া আমরা যাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের প্রয়াস পাই, তাহা আমাদের সৃষ্টি কিরূপে বলিতে পারি? যাহা আমি গড়ি তাহা আমি ভাঙ্গিতে পারি। এই অনুতাপ ও আত্মপ্রসাদ যদি আমার গড়া পদার্থ হয় তবে ইহা আমি ভাঙ্গিতেও পারি। যখন দেখিতেছি যে, আমার সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও আমি ইহা-দিগকে গড়িতে বা ভাঙ্গিতে পারিতেছি না, তখন ইহা আমার মনের সৃষ্টি নহে, ইহা অপর কাহারও। এই সত্য হৃদয়ে ধারণ করিলেই আমরা অনুভব করি যে, আমাদের প্রকৃতি এই আর এক দিকে সেই ধর্ম্মাবহ পুরুষের সহিত সংস্পৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে, —যেন দেব ও মানব একস্থানে ও একাধারে বাস করিতেছে।

এই দেহে ও এই জগতে মানব একাকী বাস করিতেছে না, আর একজন তাহার আত্মাতে সন্নিহিত হইয়া আছেন ইহা যদি সত্য হইল, তাহা হইলে এই প্রশ্ন স্বভাবতঃ উঠিতেছে, মানবের প্রতি দিনের কার্য্যের মধ্যে মানব কতটা করে ও তিনি কতটা করেন; মানব ও দেবের কার্য্যের পরিচ্ছেদ-সীমা কোথায়? এ জগতে মানবের কতদূর করিবার সাধ্য আছে, এবং কতদূর নাই তাহা চিন্তা করিলেই এই প্রশ্নের বিচার বিষয়ে অনেক সহায়তা হইতে পারে।

প্রথম মানবের বাহ্য সম্পদ ও ঐশ্বর্য্যের বিষয়ে চিন্তা করা

যাউক। তাহার কতটার উপরে মানবের হাত আছে? আমরা সকলেই বর্ত্তমান সভ্য জগতের সুখ সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকি। বাস্তবিক তাহা যে বিস্ময়কর ব্যাপার তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আদিম বর্ব্বর অবস্থাতে মানুষ যখন নগ্নদেহে বনে বনে ভ্রমণ করিত, আম মাংস ভোজন করিত, তরুকোটরে বা গিরিগুহাতে বাসস্থান নিরূপণ করিয়া শীতাতপে আপনাদিগকে রক্ষা করিত, প্রস্তরের দ্বারা অস্ত্র নির্ম্মাণ করিত, ভূমিকর্ষণ বা বীজপবন করিতে জানিত না, সেই অবস্থার সহিত সভ্যজাতিদিগের বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে কি বিস্ময়কর ব্যাপারই আমাদিগের সমক্ষে উপস্থিত হয়! মানব জাতির এই অদ্ভুত শ্রীবৃদ্ধির বিষয় একবার চিন্তা কর, সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে সকল রাজধানীর ও মহানগরের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহা একবার চিন্তা কর, সেই সকল মহানগরে যে সকল ধনরাশি সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা একবার কল্পনা কর, নানাদেশে যে লক্ষ লক্ষ কল কারখানা নিরন্তর চলিতেছে, ও রাশি রাশি পণ্য দ্রব্য উৎপন্ন করিতেছে তাহা একবার স্মরণ কর, সমুদ্র বক্ষে যে সকল অর্ণবতরি ঐ সকল পণ্য দ্রব্য লইয়া যাতায়াত করিতেছে তাহা চিন্তা কর, যে সকল বাষ্পীয় যান নিরন্তর পণ্য দ্রব্য বহন করিতেছে তাহা একবার মনে কর, ভাবিতে ভাবিতে কি অদ্ভুত ও বিস্ময়জনক ছবি চক্ষের সমক্ষে উপস্থিত হয়! কিন্তু এই সম্পদ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে এমন কি আছে, যাহা মানব সৃষ্টি করিয়াছে? এ কথা কি সত্য নহে, মানব এক পরমাণুও সৃষ্টি

করে নাই। বিজ্ঞান প্রমাণ করিতেছে, যে শক্তি হইতে জগৎ প্রসূত ও যাহার দ্বারা জগৎ বিধৃত, তাহা অক্ষয়. অর্থাৎ তাহার এক কণিকাও বৃদ্ধি হয় না, বা এক কণিকাও ধ্বংস হয় না। সুতরাং মানব এই সম্পদ ঐশ্বর্য্যের এক কণিকাও সৃষ্টি করে নাই। মানব কেবল বনের কাষ্ঠ সহরে আনিয়াছে, খনির ধাতু উপরে তুলিয়াছে, ভূমির মৃত্তিকা ইষ্টকাকারে পরিণত করিয়াছে, এক স্থানের দ্রব্য আর একস্থানে লইয়াছে, এক আকারের পদার্থকে আর এক আকারে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে, এই মাত্র। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, জগতের ধন ধান্য মানুষকে দেওয়া হইয়াছে, মানুষ কেবল ভোগ করিয়াছে. এই মাত্র মানুষের অধিকার।

সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে যে কথা সত্য জ্ঞান ও বিদ্যা সম্বন্ধেও কি সে কথা সত্য নয়? সম্পদ ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধির ন্যায় সভ্য জগতের জ্ঞান ও বিদ্যার বৃদ্ধি দেখিয়াও অবাক্ হইতে হয়। আদিম বর্ব্বর মানুষের জ্ঞানের অবস্থার সহিত বর্ত্তমান সভ্য মানুষের জ্ঞানের অবস্থার তুলনা করিলে কি বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয় না? আদিম মানব সামান্য শীতাতপ হইতেও আপনাকে রক্ষা করিতে পারিত না; সভ্য মানব জ্ঞানবলে যে কেবল আত্মরক্ষাতে সমর্থ হইয়াছে তাহা নহে, পরন্তু প্রকৃতি-রাজ্যের অতীব গূঢ়তত্ত্ব সকল জানিয়া প্রকৃতির শক্তি সকলের উপরে আপনার কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু এই অত্যদ্ভুত জ্ঞানের বিকাশের কতটুকু মানবের স্বরচিত? মানব জ্ঞানের এক কণিকাও সৃষ্টি করে নাই। জগৎ ও আত্মা এই

উভয় মহাগ্রন্থ চিরদিন মানবের চক্ষের সমক্ষে উদ্ঘাটিত রহিয়াছে ; এই উভয়ের পর্য্যালোচনা দ্বারাই মানুষ সমুদায় জ্ঞান লাভ করিয়াছে। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ দ্বারা ও আত্মদর্শনের দ্বারা মানুষ যে কিছু জ্ঞান লাভ করিয়াছে, সেই মাল মসলা দিয়াই মানবের জ্ঞানের অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ-জনিত অথবা আত্মদর্শন-জনিত জ্ঞানের অধি-কাংশের উপরে মানুষের হাত নাই। আমরা সে সকল জ্ঞান ইচ্ছা করিয়া লাভ করি না, তাহা আমাদিগকে দেওয়া হয়। প্রাতঃকালে নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিলেই, সুনীল আকাশ ও তরু-লতার স্নিগ্ধ হরিৎকান্তি দর্শন করি। কিন্তু আমরা কি সে জ্ঞান ইচ্ছা করিয়া আনয়ন করি ? আকাশ কেন নীলবর্ণ দেখায় ? তরুলতা কেন হরিদ্বর্ণ দেখায় ? তাহার উপরে কি আমাদের কোনও হাত আছে ? এইরূপ চিন্তা করিলেই দৃষ্ট হইবে, আমাদের অধিকাংশ জ্ঞানই আমাদের ইচ্ছাধীন নহে। আবার যাহা ইচ্ছাধীন তাহার উৎপত্তি ইচ্ছাধীন হইলেও তাহার স্বরূপ ইচ্ছাধীন নহে। আমাদিগকে যাহা দেওয়া হইয়াছে, আমরা তাহা পাইয়াছি, এবং তাহারই সংযোগ বিয়োগ দ্বারা আপনাদের উন্নতিসাধন করিতেছি ও সংসারের কার্য্যনির্ব্বাহ করিতেছি, এইমাত্র।

লৌকিক জ্ঞান সম্বন্ধে যেরূপ পরমার্থ জ্ঞান সম্বন্ধেও সেইরূপ। পরমার্থ জ্ঞান আমাদের ইচ্ছাধীন নহে, তাহা তাঁহার দান। তিনি আমাদিগকে যাহা দেন, আমরা তাহাই পাই, তিনি দাতা, আমরা ভোক্তা। তিনি আমাদিগের

আত্মাতে আত্ম-স্বরূপ অভিব্যক্ত করেন, আমরা তাহা হৃদয়ে ধারণ করি, সম্ভোগ করি ও তাহাকে জীবনের অন্নপানে পরিণত করি। ব্রহ্মার কাজ তিনি করেন, অর্থাৎ তিনি সত্যের সৃষ্টি-কর্ত্তা—মানব বিষ্ণুর কাজ করে, অর্থাৎ মানব সত্যের রক্ষক ও সাধক। অতএব একাধারে দেব ও মানব, এইরূপ ভাবে বাস করিতেছেন, একজন দিতেছেন অপরে ভোগ করিতেছেন। সমগ্রভাবে ইতিবৃত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও একথা বলা যায়, যে কিছু সত্য লাভ করিয়া মানুষ উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহা তিনি দিয়াছেন ও মানব ভোগ করিয়াছে ; মানব সংযোগ বিয়োগদ্বারা তাহাকে নিজ কার্য্য সাধনের উপযোগী করিয়াছে।

সর্ব্বশেষে প্রশ্ন হইতে পারে, একাধারে দেব ও মানব কিভাবে বাস করিতেছেন ? এক দেহে কি দুই আত্মা থাকিতে পারে ? এই সম্বন্ধ যে কিরূপ তাহা ব্যক্ত করিতে অসমর্থ হইয়া ঋষিগণ বলিয়াছেন দুই জনে সখ্যভাবে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন যেমন দেহকোষে আত্মা অধিষ্ঠিত, তেমনি আত্মকোষে পরমাত্মা অধিষ্ঠিত। বাস্তবিক এই তত্ত্ব প্রকৃতরূপে নির্ণয় করা আমাদের সাধ্যাতীত। এইমাত্র জানি যে তিনি আত্মাতে সন্নিহিত হইয়া রহিয়াছেন ও ওতপ্রোত ভাবে বাস করিতেছেন।

যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্।

সাহোবাচ মৈত্রেয়ী যন্নু ম ইয়ং ভগো সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাং কিমহং তেনামৃতা স্যামিতি। নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো, যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীরিতং স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেতি। সাহোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্।

—উপনিষদ্।

অর্থ—মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্ যদি বিত্তেতে পরিপূর্ণা এই সমুদায় পৃথিবী আমার হয়, তদ্দ্বারা কি আমি অমর হইতে পারি? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—না, সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদিগের জীবন যেরূপ তোমারও জীবন সেইরূপ হইবে, ধনের দ্বারা অমৃতত্ব লাভের আশা নাই। মৈত্রেয়ী বলিলেন, —"যদ্দ্বারা আমি অমর হইতে না পারি, তাহা লইয়া আমি কি করিব?

But seek ye first the Kingdom of God and his righteousness; and all these things shall be added unto you—Bible, Matthew. Chap VI. Vers 33.

অর্থ—কিন্তু তোমরা সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য ও তাঁহার সত্যবিধিকে অন্বেষণ কর, জগতের এ সকল সম্পত্তি আপনা হইতেই পাইবে।—(অর্থাৎ এ সকলের জন্য চিন্তা করিও না।)

নিবিষ্ট-চিত্তে চিন্তা করিলেই উক্ত উভয় উপদেশের তাৎপর্য্য যে একই তাহা অনুভব করিতে পারা যাইবে। উপ-নিষদে ঋষিগণ যাহাকে অমৃতত্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, বাইবেলে যীশু তাহাকেই ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। প্রথম বিবেচ্য এই অমৃতত্ব কাহাকে বলে? দেখা যাউক উপনিষদে অমৃতত্বের কিরূপ লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। উপনিষদের স্থানান্তরে ঋগিগণ বলিয়াছেন ঃ—

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽহ মৃতোভবত্যেতাবদনুশাসনম্ ॥

অর্থ—"যখন হৃদয়ের বন্ধন সকল ছিন্ন হয়, তখন মানব অমৃতত্ব লাভ করে, সংক্ষেপে অমৃতত্বের এই লক্ষণ বুঝিবে।"

তবে হৃদয়ের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভই অমৃতত্ব। কিন্তু বন্ধন শব্দ কাহার প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে? যে চলিতে চায়, অগ্রসর হইতে চায়, কোথাও উঠিতে চায়, সেই ব্যক্তিই বন্ধনকে বন্ধন বলিয়া মনে করে। যে চলিতে চায় না, কোথাও যাইতে চায় না, আপনার অবস্থাতে তৃপ্ত, বন্ধন তাহার পক্ষে বন্ধন নয়। আমরা সংসারে প্রতিনিয়ত ইহা লক্ষ্য করিতেছি। এ সম্বন্ধে একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। চীনদেশের সম্রাটগণ যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন কারাবাসীদিগকে কারামুক্ত করিবার প্রথা আছে। একবার একজন চীনসম্রাট সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া কারাবাসীদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু কয়েক দিবস পরে একজন জরাজীর্ণ অন্ধ-প্রায় দরিদ্র লোক আসিয়া পুনরায় কারাগারে প্রেরিত হইবার জন্য আবেদন

করিল। সে ব্যক্তি চল্লিশ বৎসর ঐ করোগারে বাস করিয়াছে, চল্লিশ বৎসর একটী অন্ধকার ঘরে থাকিয়াছে, এখন তাহার চক্ষের জ্যোতি হ্রাস হইয়াছে, সে আর উৎকট সূর্য্যালোক সহ্য করিতে পারে না; সংসারে তাহার আত্মীয় স্বজন যে দুই একজন ছিল তাহারা এ জগৎ পরিত্যাগ করিয়াছে; পূর্ব্বে তাহার যে ভবন ছিল এখন তাহার চিহ্ন নাই; তাহাকে আশ্রয় দিয়া গৃহে লয় এমন কেহ নাই; সে কারামুক্ত হইয়া কয়েক দিন পথে পথে ভ্রমণ করিয়াছে, এবং আশ্রয়হীন, গৃহ-হীন ও বন্ধুহীন অবস্থাতে অনেক ক্লেশভোগ করিয়াছে; এখন তাহার প্রার্থনা যে অনুকম্পা করিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল তাহাকে ঐ কারাগারে, সেই অন্ধকার গৃহটীতে, থাকিতে দেওয়া হউক। এ ব্যক্তির পক্ষে কারাবন্ধন ত বন্ধন নয়। যে ব্যক্তি জীবনের নিম্নভূমিতে থাকিয়াই সন্তুষ্ট, উন্নতভূমির কথা যে জানে না, সেখানে উঠিবার আকাঙ্ক্ষা যাহার নাই, সে আপনার বন্ধনকে বন্ধন বলিয়াই অনুভব করে না। মুমুক্ষু আত্মাই বন্ধন অনুভব করিয়া থাকে। যে পক্ষী উড়িতে জানে ও উড়িতে চায় সেই আপনার পক্ষপুটের রজ্জুকে বন্ধন বলিয়া বোধ করে। কিন্তু এখন প্রশ্ন এই, জীবনের সে উন্নত ভূমি কি? ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঋষিগণ অমৃতত্ব শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন? সে উন্নতভূমি ও যীশুর নির্দ্দিষ্ট স্বর্গরাজ্য একই। যীশুও যখন স্বর্গরাজ্যের কথা কহিয়াছেন, তখন মানবকে জীবনের নিম্নভূমি হইতে উঠিয়া উন্নত ভূমিতে আরোহণ করিতে বলিয়াছেন। তাঁহার উপদেশের তাৎপর্য্য এই, যে ধর্ম্মজগত

ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা সর্ব্বদা শাসিত, তাহাতে প্রবেশ করাই স্বর্গরাজ্যে আরোহণ করা; অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া বা বন্ধন-মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের ধর্ম্মনিয়মের অধীন হওয়া। তবে দেখ, উভয় উপদেশের তাৎপর্য্য একই।

ইহা আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে ধর্ম্ম-সাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য এই অমৃতত্ব লাভ বা স্বর্গরাজ্যে আরোহণ। অন্য কোনও প্রকার নিকৃষ্ট ভাবে ধর্ম্মের সেবা করিতে নাই। একথা বলিবার কারণ এই, আমরা প্রতিদিন মানব-সমাজে দেখিতেছি যে, মানব নানা প্রকার নিকৃষ্ট ভাবে ধর্ম্মের সেবা করিতেছে। যত লোক বাহিরে ধর্ম্মের আশ্রয়ে বাস করিতেছে, ও কোন না কোনও প্রকার ধর্ম্ম সাধনে নিযুক্ত রহিয়াছে, তাহারা সকলে যদি বিমল-হৃদয়ে ধর্ম্মের সেবা করিত, তাহা হইলে ভাবনা কি ছিল! কিন্তু তাহারা সকলে বিমল ভাবে ধর্ম্মের সেবা করে না। চিন্তা করিলেই আমরা দেখিতে পাইব, জগতের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই এমন এক শ্রেণীর লোক রহিয়াছে, ধর্ম্মের সহিত যাহাদের স্বার্থের যোগ হইয়া গিয়াছে; ধর্ম্মের বিধি ব্যবস্থা সকলকে তাহারা স্বার্থ-সাধনের একটা উপায় স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছে; তাহারা প্রধা-নতঃ স্বার্থের জন্য ধর্ম্মের সেবা করিতেছে। ধর্ম্মের বহিরাবরণের প্রতি এই সকল লোকের অতিশয় দৃষ্টি, পুরাতন বিধি ব্যবস্থাকে রক্ষা করিবার জন্য ইহারা অতিশয় ব্যগ্র, এবং সর্ব্ববিধ সংস্কার কার্য্যের অত্যন্ত বিরোধী। ধর্ম্মের নাম ইহাদের মুখে থাকে, কিন্তু প্রেম ইহাদের অন্তরে থাকে না। সমুদায় তীর্থস্থানের

পাণ্ডাদিগের অধিকাংশ এই শ্রেণীভুক্ত লোক। কোনও তীর্থ স্থানে পদার্পণ করিয়া দেখ, যে সকল যাত্রী বহুদূর হইতে তীর্থে আসিতেছে ও যে সকল পাণ্ডা সেখানে রহিয়াছে, উভয়ে কত প্রভেদ পরিলক্ষিত হইবে! একজন দরিদ্র লোক হয় ত দশ বৎসরের সঞ্চিত ধন ব্যয় করিয়া পাঁচ শত ক্রোশ হইতে দেবদর্শনের মানসে আসিয়াছে; দেবমূর্ত্তির সমক্ষে দাঁড়াইয়া তাহার চক্ষে জলধারা বহিতেছে; আর ও দিকে পাণ্ডাগণ তাহাকে লইয়া ঠেলাঠেলি, মারামারি, কৌতুক করিতেছে নিজেরা তাহাকে কি প্রকারে বিধিমতে দোহন করিবে তাহার পন্থা দেখিতেছে। তাহাদের মনে যে নিষ্ঠা ভক্তির কিছুমাত্র আছে এরূপ বোধ হয় না। যীশু যে ফ্যারিসী ও স্যাডুসীদিগের প্রতি ক্রোধাগ্নি বর্ষণ করিতেন, তাহারাও এই শ্রেণীর লোক ছিল; এবং ইহারাই দলবদ্ধ হইয়া যীশুকে হত্যা করিয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ কোনও সমাজে যখন জ্ঞান ও সভ্যতাবিষয়ে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে তারতম্য ঘটে, তখন এক শ্রেণীর লোক দেখা যায় যাহারা প্রচলিত ধর্ম্মের বিধি ব্যবস্থাতে বিশ্বাস না করিয়াও কেবল লোক রক্ষার্থ তাহাতে যোগ দিয়া থাকে। তাঁহাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিলে এই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, যেন শিক্ষিত ও জ্ঞানীদিগের জন্য ধর্ম্মের প্রয়োজন নাই, অজ্ঞ সাধারণ প্রজাপুঞ্জের জন্যই প্রয়োজন। জ্ঞানিগণ ধর্ম্মের সেবা না করিলে পাছে অজ্ঞেরও ধর্ম্মের সেবা না করে, এই জন্য জ্ঞানিগণের পক্ষে বাহিরে ধর্ম্মের সেবা করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা ভগবদ্গীতা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা

সকলেই জানেন যে গীতাতে এই যুক্তি কেমন পরিষ্কাররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন ;—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহং।
শঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥
সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহং ॥
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥

অর্থ—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন, ইতর লোকে তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। তিনি যে বিধির অনুগত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন, লোকে তাহারই অনুবর্ত্তন করে। হে পার্থ, এ তিন ভুবনে আমার কোনও কর্ত্তব্য নাই, এমন কিছু অপ্রাপ্ত বিষয় নাই, যাহা আমাকে পাইতে হইবে, তথাপি আমি কর্ম্ম করিয়া থাকি। আমি সতর্কতার সহিত যদি কর্ম্মের আচরণ না করি, তাহা হইলে সাধারণ প্রজাপুঞ্জ সর্ব্বথা আমারই পথের অনুসরণ করিবে। আমি কর্ম্ম না করিলে

সমুদায় লোক উৎসন্ন যাইবে ; বর্ণসঙ্কর ঘটিবে ও সমুদায় প্রজা বিনষ্ট হইবে। অতএব অজ্ঞেরা কর্ম্মে আসক্ত থাকিয়া যে ভাবে কর্ম্মের আচরণ করে, জ্ঞানিগণ অনাসক্ত থাকিয়া লোক রক্ষার জন্য সেই ভাবেই কর্ম্মের আচরণ করিবেন ; কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মতিভেদ ঘটাইবেন না ; কিন্তু নিজে অনাসক্ত-ভাবে কর্ম্মের আচরণ করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিবেন।"

ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন যে বর্ত্তমান শিক্ষিত হিন্দু সমাজে বহু সংখ্যক ব্যক্তি এই ভাবে কর্ম্ম করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিজে ধর্ম্মের বিধি ব্যবস্থাতে বিশ্বাস না করিয়াও কেবলমাত্র লোক রক্ষার আশয়ে ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকেন। প্রাচীন রোম ও গ্রীসের ইতিবৃত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও দেখিতে পাই যে, ঐ সকল দেশের উন্নতি ও সভ্যতার সময়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যখন শিক্ষিত দলের মধ্যে থাকিতেন, তখন পরস্পরে অজ্ঞ প্রজাকুলের ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মাচরণকে উপহাস ও বিদ্রূপ করিতেন, কিন্তু কার্য্যকালে তাঁহারাই দেব মন্দিরে গিয়া দেবমূর্ত্তির সমক্ষে প্রণত হইতেন, এবং ধর্ম্মের বিধি ব্যবস্থা সকল পালন করিতেন। তাঁহাদের মনে এই ভাব ছিল যে ধর্ম্মের ঐ সকল বিধি ব্যবস্থা অজ্ঞ প্রজাপুঞ্জের পক্ষে ভাল। এইরূপে অপরকে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য ধর্ম্মাচরণ করার মধ্যে যে কোনও যুক্তি নাই, তাহা বলিতেছি না, তবে এইমাত্র বক্তব্য যে এভাব নিকৃষ্ট, ধর্ম্মকে এপ্রকার ভাবে সেবা করিলে ধর্ম্মের অপমান করা হয়। অনেক কাজ মানুষ

পরোপকার বুদ্ধিতে করিয়া থাকে। কিন্তু ধর্ম্মটা পরোপকার বুদ্ধিতে করা ভাল নয়। যাহা আত্মার অন্ন পান, যাহা জীবনের ভিত্তিস্বরূপ, তাহা পরোপকার বুদ্ধিতে করিলে তাহার মূল্য লঘু করা হয়।

বর্ত্তমান সভ্য সমাজে মানুষ আর এক ভাবে ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকে। সভ্য সমাজে যেমন সকল বিষয়েই সুন্দর অসুন্দর বলিয়া একটা মতামত আছে, তেমনি যেন মানব-জীবন সম্বন্ধেও সুন্দর অসুন্দর বলিয়া একটা মতামত আছে। সুনিয়মিত সুশৃঙ্খল জীবন দেখিতে সুন্দর, বিশৃঙ্খল জীবন দেখিতে কদর্য্য। ভদ্র সমাজের রীতির মধ্যে থাকিয়া তুমি স্বচ্ছন্দে আহার বিহার কর, এমন কি সচরাচর লোকে যাহাকে নীতি-বিগর্হিত কার্য্য বলে তাহাও যদি কর, তাহাতে সৌন্দর্য্যের কিছু ব্যঘাত হয় না। আবার ভদ্র সমাজের রীতির বাহিরে গিয়া যদি একটা ভাল কাজও কর, তবে তাহা অসুন্দর; এইরূপ সভ্য সমাজের মধ্যে একটা সৌন্দর্য্যের ভাব দাঁড়াইয়াছে, যাহা অনেকের জীবনকে নিয়মিত করিতেছে। তাঁহারা এই জন্য ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকেন যে, ইহা জীবনের শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্যকে বৃদ্ধি করিয়া থাকে। একটা ধর্ম্মের বিধি ব্যবস্থা না থাকিলে জীবনটা বিশৃঙ্খল ও কদর্য্য দেখায়। বিশেষতঃ সভ্য সমাজের বড় বড় লোকেরা ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকেন, সুতরাং ওটা সভ্য সমাজের রীতি। এই ভাবেও অনেক লোক ধর্ম্মের সেবা করেন। তাঁহাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিলে এই ভাব দেখা যায়, সপ্তাহে একবার

উপাসনা স্থানে গিয়া বসাটা ভাল, বেশ দেখায়। এ রীতিটা বেশ! তাঁহাদের ভাব এতদপেক্ষা অধিক গভীর নহে। ইহাও নিকৃষ্ট ভাব।

এইরূপ চিন্তা করিলে এবং মানবমন পরীক্ষা করিলে ধর্ম্ম-সাধনের আরও অনেক প্রকার নিকৃষ্ট ভাব লক্ষ্য করা যাইতে পারে। আমাদিগকে হৃদয় পরীক্ষা করিতে হইবে, আমরা এ প্রকার কোনও লঘু ও ক্ষুদ্র ভাবে ধর্ম্মের সেবা করিতেছি কি না? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অমৃতত্ব লাভের জন্যই ধর্ম্মের সেবা করিতে হইবে। প্রধানতঃ মুক্তি লাভের জন্যই ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে হইবে। আমরা যে পরামার্থ তত্ত্বের চিন্তা করি বা ঈশ্বরারাধনা করি, তাহার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে তদ্দ্বারা আমরা কোনও প্রকার স্বার্থসাধনে সমর্থ হইব বা জগতের কল্যাণ করিব, কিন্তু তাহার লক্ষ্য এই যে সেই সকল তত্ত্বের ধ্যান করিতে করিতে আমাদের চিত্ত তদ্‌ভাবাপন্ন হইয়া জীবনের নিম্ন ভূমি হইতে উঠিয়া উন্নত ভূমিতে আরোহণ করিবে, এবং ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইবে। ইহারই নাম বন্ধন মুক্তি বা অমৃতত্ব। অপরকে শিক্ষা দিবার জন্যই পরমার্থ তত্ত্বের প্রয়োজন এরূপ নহে; কিন্তু তাহার ধ্যানের দ্বারা নিজে তদ্‌ভাবাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন। একটী প্রাচীন দৃস্টান্তের দ্বারা এই ভাবটী ব্যক্ত করা যাইতে পারে। আমাদের দেশের বৈদান্তিকগণ সচরাচর জীবের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির একটী উপমা দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন তেলাপোকাই কালে কাঁচপোকা হইয়া থাকে। সে ব্যাপারটী এই, কাঁচপোকা প্রথমে তেলা-

পোকাকে বন্দী করে ; বন্দী করিয়া নিজের বিবর মধ্যে লইয়া যায় ; লইয়া গিয়া একেবারে প্রাণে মারে না, কিন্তু বন্দী অবস্থাতে রাখিয়া সর্ব্বদা তাহার মুখের নিকট আসিয়া তাহাকে ভয় দেখাইতে থাকে। সেই ভয়ে তেলাপোকা বিবর্ণ হইয়া যায়। এইরূপে বার বার কাঁচপোকার ধ্যান করিতে করিতে অবশেষে তেলাপোকা কাঁচপোকা হইয়া যায়। সেইরূপ জীবও নিরন্তর ব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া যায়। তেলাপোকার কাঁচপোকাত্ব প্রাপ্তির কথা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু তাহা না হইলেও এই দৃষ্টান্তটী আমরা কাজে লাগাইতে পারি। পরমার্থ তত্ত্ব সকল আমাদিগকে এরূপ ভাবে অনুশীলন করিতে হইবে, যাহাতে হৃদয় মন সেই ভাবাপন্ন হয় এবং সমগ্র জীবন তদভিমুখে উন্নত হইতে থাকে। সত্যকে এইরূপে সমগ্র হৃদয়ের সহিত গ্রহণ না করিলে তাহার প্রভাব মানব-জীবনের উপরে ব্যাপ্ত হয় না। জীবনের এই উন্নতি ও বিকাশের চরম ফল অমৃতত্ব লাভ।

ব্রহ্মানন্দ ও ধর্ম্মবল।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

উপনিষদ!

অর্থ—"সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কোনও স্থান হইতে ভয় প্রাপ্ত হন না।"

জগতের মহাজনদিগের মহত্ত্ব কোন বিষয়ে? এই প্রশ্নের উত্তর অনেকে অনেক প্রকার দিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন তাঁহাদের অলৌকিক ধারণাশক্তিই তাঁহাদের মহত্ত্বের প্রমাণ। তাঁহারা যে সময়ে ও যে জাতিমধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অদ্ভুতভাবে সেই সময়ের ও সেই জাতির সর্ব্বোচ্চ চিন্তা, সর্ব্বোচ্চ ভাব ও সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে আপনাদের অন্তরে ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও তাঁহারা সমগ্র জাতির প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়াছিলেন, এই তাঁহাদের মহত্ত্ব। কেহ কেহ বলিয়াছেন তাঁহাদের চিত্তের এক-প্রবণতাতেই তাঁহাদের মহত্ত্ব। এক এক জন মহাজনের জীবনে এক একটী বিশেষ সত্যের বা বিশেষ ভাবের আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সত্য বা সেই ভাব তাঁহাদিগকে প্রবলরূপে অধিকার করিয়া থাকিয়াছে; যেন একেবারে গ্রাস করিয়াছে। দেখিলে বোধ হয় সেই সত্যের চিন্তা ভিন্ন তাঁহাদের হৃদয়ে যেন অপর কোনও চিন্তা ছিল না। সেই সত্যেরই ধ্যানে তাঁহারা জীবন কাটাইয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন তাঁহাদের অদ্ভুত

প্রেমের শক্তিই তাঁহাদিগকে মহৎ করিয়াছে। মানবের প্রতি অসাধারণ প্রেম ছিল বলিয়াই মানবের দুঃখ তাঁহাদের প্রাণে এত আঘাত করিয়াছিল; এবং এই প্রেমের গুণেই তাঁহারা শিষ্যগণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন তাঁহাদের অলৌকিক ইচ্ছা-শক্তিই তাঁহাদের মহত্ত্বের কারণ। কোনও প্রকার বিঘ্ন ও বাধাতে তাঁহাদের উদ্যমকে ভগ্ন করিতে পারে নাই।

চিন্তা করিলেই অনুভব করা যাইবে যে, এই সকলপ্রকার মতের মধ্যেই সত্য আছে। প্রথমতঃ, মহাজনগণের যে আশ্চর্য্য ধারণা শক্তি ছিল তাহাতে সন্দেহ কি? ইতিবৃত্ত পাঠ করিলেই ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাত্মা শাক্যসিংহ যে সময়ে এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার উপদেশে সে সময়কার সর্ব্বোচ্চ চিন্তা ও সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হইয়াছিল। য়িহুদী জাতির ইতিহাস পাঠ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, যীশু যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেটী একটী বিশেষ সময়। সে সময়ে এক নূতন আকাঙ্ক্ষা শত শত হৃদয়ে প্রধুমিত হইতেছিল। যীশু সেই প্রবল আকাঙ্ক্ষাকেই হৃদয়ে ধারণ করিয়া অভ্যুদিত হইয়াছিলেন। এইরূপ সকল মহাজনেরই জীবনে অল্পাধিক পরিমাণে এই কথার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। বৈষ্ণব গ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জানেন যে, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সময়ে শত শত হৃদয়ে তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রতি অতৃপ্তি জন্মিয়া ভক্তির ধর্ম্মের জন্য প্রবল

আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়াছিল। চৈতন্যদেব সেই আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ধারণ করিয়া অভ্যুদিত হইলেন। দ্বিতীয়তঃ, মহাজনগণের জীবন আলোচনা করিলে তাঁহাদের চিত্তের অদ্ভুত এক-প্রবণতারও যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বুদ্ধ যে কি নির্ব্বাণ মুক্তির মন্ত্র ধরিলেন, তাহা চিরজীবন তাঁহার জপমালা হইয়া রহিল! যৌবনে যে কথা বলিয়া প্রচার আরম্ভ করিলেন, বার্দ্ধক্যে মৃত্যুর দিনেও সেই কথা মুখে রহিল। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে শিষ্যদিগকে যে দুই চারিটী কথা বলিলেন, তাহাও সেই কথা!—"সর্ব্বপ্রযত্নে আপনাদের মুক্তি আপনারা সাধন কর।" যীশুর জীবনেও তাহাই। তিনি যে কি স্বর্গরাজ্যের ভাব হৃদয়ে পাইলেন, যে তাহা আর তাঁহাকে ছাড়িল না! সেই নেশাতেই জীবন কাটিয়া গেল! যে দিন লোকে তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতেছে, তখনও তিনি সেই নেশাতে আছেন!—ভাবিতেছেন স্বর্গরাজ্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতেছে। এ কি প্রকার বাতুলতা! বাতুলকে পুলিশ প্রহরী দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া লোকে বাতুলালয়ে লইয়া যাইতেছে, সে হয়ত ভাবিতেছে আমি লক্ষ্ণৌএর নবাব আর এই সকল লোক আমার শরীররক্ষক ভৃত্য। ইহাও কি কতকটা সেই প্রকার নহে? "এক ঈশ্বর ভিন্ন ঈশ্বর নাই" এই নেশাতে মহম্মদকে এমনি ধরিয়াছিল যে মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত সেই একই কথা। বহুদিনের সংগ্রামের পর যে দিন মক্কা নগর জয় করিয়া মক্কাতে প্রবেশ করিলেন, সে দিন সেই জয়ের মুহূর্ত্তে অপর চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে

উদয় হইল না। যাহারা এতদিন তাঁহার প্রতি শত্রুতাচরণ করিয়া আসিতেছে ও যাহারা এক সময়ে তাঁহাকে হত্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল, তখন তাহাদের প্রতি বৈর নির্য্যাতন করিবার বুদ্ধি আসিল না; অথবা মক্কার সম্পদ ঐশ্বর্য্য অধিকার করিবার ইচ্ছা হইল না; কিন্তু তিনি একেবারে কাবামন্দিরের সন্নিকটে গিয়া এক ব্যক্তিকে উন্নত প্রসাদোপরি তুলিয়া দিলেন; এবং বলিলেন, "তোমার কণ্ঠে যত শক্তি আছে সেই সমগ্র শক্তির সহিত বল,—মক্কাবাসিগণ শ্রবণ কর, এক সত্য ঈশ্বর ভিন্ন ঈশ্বর নাই।" জীবনের দুঃখ দারিদ্র্যের দিনে যে কথা, সম্পদের দিনেও সেই কথা। যে পীড়াতে মহম্মদের জীবন শেষ হইল, সেই শেষ পীড়ার সময়েও তিনি শিষ্যগণের স্কন্ধে ভর করিয়া এই কথা বলিতে উপাসনা মন্দিরে গিয়াছিলেন, যে "এক সত্য ঈশ্বর ভিন্ন ঈশ্বর নাই।" এইরূপে সকল মহাজনেরই জীবনে অত্যাশ্চর্য্য চিত্তের এক-প্রবণতার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৃতীয়তঃ,—তাঁহাদের প্রেমের শক্তি অদ্ভুত ছিল। ইহাঁরা সকলে সিদ্ধিলাভ করিয়া এদেশীয় যোগীদিগের ন্যায় আত্ম-তৃপ্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না কেন? নানাপ্রকার নিগ্রহ সহ্য করিয়াও মানবের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিলেন কেন? বুদ্ধ যে নিরঞ্জন নদীর তীরে সিদ্ধিলাভ করিলেন, সেইখানেই কি জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিতে পারিতেন না? কে তাঁহাকে সেই নির্জ্জন হইতে সজনে যাইতে বাধ্য করিল? ইহার উত্তরে সকলেই বলিবেন—নর-প্রেম। মানবের প্রতি

তাঁহাদের এতই প্রেম ছিল যে তাঁহারা সে জন্য জীবন দেওয়াকেও ক্ষতি বলিয়া মনে করিলেন না। যেমন সমগ্র মানবজাতির প্রতি তাঁহাদের প্রেম ছিল, তেমনি যাহারা তাঁহাদের নিকটে আসিত, তাঁহাদের সঙ্গে বাস করিত, তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিত, তাহারাও তাঁহাদের অপূর্ব্ব প্রীতি সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইত। এই প্রেমেরই গুণে তাঁহারা শিষ্যগণের প্রেম আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; এবং প্রেম আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদিগের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত এরূপ কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। চতুর্থতঃ,—ইচ্ছাশক্তিতেও যে তাঁহারা অগ্রগণ্য ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বুদ্ধেরত কথাই নাই, তাঁহাকে ইচ্ছাশক্তির অবতার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এরূপ মানসিক বল মানুষে আর কখনও দেখা যায় নাই। তাঁহার মানসিক বলের বিষয় চিন্তা করিয়া মনে আয়ত্ত করা যায় না! চিন্তা করিতে গেলে একেবারে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। অপরাপর মহাজনের জীবনেও আশ্চর্য্য মানসিক বলের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মহাজনদিগের মহত্ত্বের যে সকল কারণ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইল, তদ্ভিন্ন আরও একটী কারণ আছে, যাহার বিষয়ে চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়, এবং সেইখানেই তাঁহাদের বিশেষত্ব বলিয়া মনে হয়। সেটী তাঁহাদের অদ্ভুত আশার শক্তি। তাঁহারা সকলেই আশার বলে বলী ছিলেন; জগতের ধর্ম্ম নিয়মের প্রতি আশা, নিজেদের প্রতি আশা ও মানবের

প্রতি আশা, এই ত্রিবিধ আশাগুণেই তাঁহারা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্ম নিয়মের প্রতি এমনি অবিচলিত আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন যে, সত্য ও সাধুতার জয় অনিবার্য্য বলিয়া অনুভব করিতেন। নিজেদের চেষ্টার দ্বারা যে সেই সত্য-রাজ্য স্থাপিত হইতে পারে, সে বিষয়েও নিঃসংশয় ছিলেন, এবং মানব-প্রকৃতি যে ধর্ম্মের অনুকূল তাহাও বিশ্বাস করিতেন; তদ্ভিন্ন কোনও প্রকারেই এরূপ একনিষ্ঠতার সহিত কার্য্য করিতে পারিতেন না। তাঁহাদের এই আশার বিষয়ে নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। যে সকল অবস্থাতে মানুষের আশা করিবার কোনও কারণই থাকে না, চারিদিক অন্ধকার বলিয়া বোধ হয়, একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ যাহা ছিল তাহাও চলিয়া যায়, এবং একাকী সংগ্রামক্ষেত্রে দণ্ডায়মান থাকিতে হয়, সে সকল অবস্থাতেও ইঁহাদের আশা হৃদয়কে পরিত্যাগ করে নাই। সকল মহা-জনের জীবনেই এই আশাশীলতার ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। সকল ছাড়িয়াও যে পঞ্চ জন শিষ্য নির্জ্জনের সঙ্গী ছিল, তাহারাও যখন ত্যাগ করিয়া গেল, বুদ্ধের জীবনের সেই মুহূর্ত্তের কথা একবার স্মরণ কর। সেরূপ অবস্থাতে মানব-হৃদয় কি আর আশান্বিত থাকিতে পারে? বজ্র-নির্ম্মিত হৃদয়ও এরূপ সময়ে ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু এইখানেই বুদ্ধের মহত্ত্ব যে সেরূপ অবস্থাতেও তাঁহার আশা আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি নূতন প্রতিজ্ঞার সহিত ধর্ম্ম-সাধনে বসিলেন। একজন ইংরাজ কবি আশার বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"আশা

যথার্থই আলোকের ন্যায় ; যতই অন্ধকার গাঢ় হয়, আলোক যেমন ততই অধিক উজ্জ্বলতা ধারণ করে, আশাও সেইরূপ বিপদান্ধকার মধ্যে অধিক উজ্জ্বল হইয়া থাকে।" একথা যদি কাহারো জীবনে সত্য হইয়া থাকে, তবে এই মহাজনদিগের জীবনেই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। যীশুর জীবনের বিষয়েও চিন্তা কর। যেদিন তিনি শত্রুগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন, সেই দিনের কথা স্মরণ করিয়া দেখ। যে অল্প সংখ্যক ব্যক্তি তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাও সে সময়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। সেই ঘোর বিপদের সময় তাহাদের কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না। এমন কি তাঁহার সর্ব্বপ্রধান শিষ্য পিটারও প্রাণভয়ে তাঁহাকে অস্বীকার করিলেন। যদি যীশুর জীবনে কোনও দিন, কোনও মুহূর্ত্তে, নিরাশ হইবার কারণ ঘটিয়া থাকে, এই দিন, এই মুহূর্ত্তে তাহা ঘটিয়াছিল. তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? তথাপি দেখ, তাঁহার কেমন আশা-শীলতা, তিনি শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আশা করিতেছেন যে স্বর্গরাজ্য পৃথিবীতে আসিবেই আসিবে।

দ্বিতীয়তঃ,এক দিকে যেমন ঈশ্বরের সত্য-রাজ্যের প্রতি আশা, তেমনি নিজেদের প্রতি আশা। এক মুহূর্ত্তের জন্য নিজেদের প্রতি আশা স্খলিত হইলে, কখনই এত বিপদের মধ্যে তাঁহারা স্থির থাকিতে পারিতেন না। আপনার প্রতি আশা না থাকিলে এতটা স্বাবলম্বন শক্তি মানব চরিত্রে আসে না।

তৃতীয়তঃ, মানবের প্রতি আশাও অসাধারণ ছিল। এই গুণেই তাঁহারা জগতের পাপী তাপী সকলের হৃদয়কে আকর্ষণ

করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সাধারণ মানুষেরা যে সকল লোকের চরিত্রে আশা করিবার মত কিছুই দেখিত না, যাহা-দিগকে দেখিয়া তাহারা অবজ্ঞা করিত ও মনে ভাবিত ইহা-দিগের দ্বারা ঈশ্বরের রাজ্যে কোন কার্য্যই হইতে পারে না, এই সকল মহাজনগণ তাহাদের চরিত্রে এমন কিছু দেখিতে পাইতেন যাহাতে তাঁহারা তাহাদের উপরে আশা স্থাপন করিতেন। তাহারা অপর সকল লোকের নিকটে গেলে হয়ত ঘৃণাসূচক দৃষ্টি দেখিত ও অবজ্ঞাসূচক ভাষা শুনিত, এই সকল মহাজনের নিকটে আসিলে আশাপূর্ণ প্রেম-হস্তের সুকোমল স্পর্শ লাভ করিত, অমনি তাহাদের হৃদয়ের সদ্ভাব সকল ফুটিয়া উঠিত। এমন কি, এই সকল ব্যক্তি নিজেরা আপনাদিগকে যতটা শ্রদ্ধা করিত না, ও নিজেদের প্রতি যতটা আশা রাখিত না, মহাজন-গণ তাহা করিতেন ও ততটা আশা রাখিতেন, ইহাতেই তাঁহা-দের সংস্পর্শে আসিয়া মানব-হৃদয়ের সমুদায় উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও সমুদায় গূঢ় সাধুতার শক্তি জাগিয়া উঠিত। ইহাই তাঁহাদের চরিত্রের আকর্ষণের প্রধান কারণ। যেখানে আশা সেই খানেই সাহস; যেখানে সাহস সেই খানেই দুর্ব্বল আত্মার আকর্ষণ। ঝটিকা মধ্যে পতিত হইলে মানব যেমন স্বভাবতঃ সুদৃঢ়-নির্ম্মিত সৌধতলে আশ্রয় গ্রহণ করে, সেইরূপ জীবনের পাপ তাপের মধ্যে দুর্ব্বল মানব স্বভাবতঃ বলবান ও সাহসী পুরুষের আশ্রয়ে থাকিতে চায়? যুদ্ধক্ষেত্রে যে সেনাপতি আপনার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-ময় দৃষ্টি দ্বারা ও উৎসাহজনক বাক্যের দ্বারা সৈনিকগণের সংশয়াকুল চিত্তে সাহসের সঞ্চার করিতে পারেন, সৈনিকগণ

যেমন তাহারই নিশানের নিম্নে দণ্ডায়মান হইতে ভাল বাসে, তেমনি জীবন সংগ্রামে যে ধর্ম্মবীর "মা ভৈ" রব শুনাইতে পারেন, তাঁহারই দিকে সাধারণ মানবের চিত্ত স্বতঃই আকৃস্ট হয়। এই অলৌকিক সাহসের গুণেই মানবের মনের উপর মহাজনগণের এই শক্তি।

কিন্তু এই আশাশীলতা ও এই সাহসের মূল কোথায়? সাধুগণ কি কেবলমাত্র আত্মশক্তির উপরে নির্ভর করিয়া এইরূপ আশাশীল ও সাহসী হইয়াছিলেন? তাহা নহে, আপনাদের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর থাকিলে তাঁহারা কখনই এরূপ অদম্য সাহস লাভ করিতে পারিতেন না। বরং এই কথা বলিলেই ঠিক বলা হয় যে, নিজেদের প্রতি পূর্ণ-নির্ভর ছিলনা বলিয়াই তাঁহারা এতদূর সাহসী হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিজের প্রতি যে আশা ছিল, তাহাও জগতের ধর্ম্মনিয়মের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাসের ফলমাত্র। তাঁহারা দেখিতেন তাঁহাদের ক্ষুদ্র শক্তির পশ্চাতে ব্রহ্ম বিদ্যমান রহিয়াছেন; এই কারণেই তাঁহারা সত্যের বিজয়-নিশান হস্তে লইয়া দাঁড়াইতে পারিতেন। তাঁহারা সত্যকে ও ধর্ম্মকে সেই অনন্ত অবিনাশী ব্রহ্মসত্তার সহিত একীভূত দেখিতেন, এই জন্যই তাঁহাদের এত সাহস। সত্য ও ধর্ম্মের চিন্তন ও অনুসরণে ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পাইয়াই ভয় ভাবনা বিরহিত হইতেন। হৃদ্গত সত্য-বিশ্বাস মানবের আত্মাতে ও চরিত্রে অনুপ্রবিস্ট হইয়া থাকে; মানুষ না জানিয়া তাহার অধীন হয়; অজ্ঞাতসারে তাহা হইতে বল প্রাপ্ত হয়। কল্পনা কর, দুই ব্যক্তি রাত্রিকালে রাজপথ দিয়া

যাইতেছে। দুইজনেই একাকী চলিয়াছে; কিন্তু একজন সত্য সত্যই একাকী, সঙ্গে কেহ নাই; অপর ব্যক্তির পশ্চাতে কিছু দূরে দশজন বন্ধু কথোপকথন করিতে করিতে আসিতেছে। মনে কর একদল দস্যু উভয় ব্যক্তিকেই আক্রমণ করিতে আসিল। দস্যুদিগকে দেখিয়াই প্রথমোক্ত ব্যক্তি ডাকিতে লাগিলেন;—"ও রাম, ও হরি, ও গোবিন্দ, তোমরা পিছাইয়া পড়িলে কেন?" অথচ রাম, হরি বা গোবিন্দ কোথাও নাই। দ্বিতীয় ব্যক্তিকেও যখন দস্যুগণ আক্রমণ করিবার উপক্রম করিল, তখন তিনিও ডাকিতে লাগিলেন, "নরেন! নরেন! তোমরা শীঘ্র এস।" দুইজনেরই ডাক একপ্রকার, কিন্তু এই উভয় আহ্বানের মধ্যে কত প্রভেদ তাহা একবার চিন্তা কর। যখন দস্যুদল ভয় প্রদর্শন করিয়া বিরত না হইয়া সত্য সত্যই উভয়কে আক্রমণ করিল, তখন উভয়ের প্রভেদ লক্ষ্য করিতে পারা গেল। তখন প্রথমোক্ত ব্যক্তি প্রাণভয়ে কাঁপিতে লাগিল; কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল— "খবর্দ্দার! আমার শরীরে হাত দিও না, তাহা হইলে নিস্তার থাকিবে না।" উভয়ের এই বলের তারতম্যের কারণ কি? দ্বিতীয় ব্যক্তি জানে, যদিও সে একাকী দণ্ডায়মান তাহার পশ্চাতে আর একটা শক্তি রহিয়াছে, যাহা তাহার রক্ষা-বিধানে সমর্থ। এইরূপ মানুষ যখন ধর্ম্মনিয়মে ও সত্যের শক্তিতে প্রকৃত আস্থা স্থাপন করে, তখন তাহারও চিত্তে ঐ প্রকার বলের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যতক্ষণ আমাদের ঈশ্বর-বিশ্বাস এইরূপ সত্য বিশ্বাসে পরিণত না হয়, যতক্ষণ না তাহা

আমাদের হৃদয় মনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আমাদের দৈনিক কার্য্য ও চরিত্রের উপরে স্বীয় গূঢ় প্রভাব বিস্তার করে, ততক্ষণ সে বিশ্বাসকে বিশ্বাস বলিয়া গণ্য করা কর্ত্তব্য নহে। অনেকের ঈশ্বর-বিশ্বাস সেই প্রথমোক্ত পথিকের রাম, হরি, গোবিন্দকে আহ্বান করার ন্যায় মুখে আহ্বান মাত্র কিন্তু মনে জানে কেহ কোথাও নাই।

ধর্ম্মকে ব্রহ্মাণ্ড-শক্তির সহিত একীভূত না দেখিলে, তাহা ক্ষুদ্র হইয়া যায়। ঘটনা ও অবস্থার ক্ষণিক ভাবের উপরে যাহার ভিত্তি, তাহা বায়ুনিক্ষিপ্ত তুষের ন্যায়, অদ্য আছে কল্য থাকিবে না। ধর্ম্ম সেরূপ বস্তু নহে। যে ব্রহ্মসত্তাতে জড় ও চেতন প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম্ম সেই ব্রহ্মসত্তার সহিত একীভূত। প্রকৃত ভাবে ধর্ম্মের চিন্তনে প্রবৃত্ত হইলে আমরা সেই ব্রহ্মসত্তাতেই প্রবেশ করি, ও সেই ব্রহ্মসত্তারই দ্বারা পরিব্যাপ্ত হই। এই ব্রহ্মসত্তার সহিত আত্মার যোগ অনুভব করিতে পারা একটা পরমানন্দকর ব্যাপার। জগতের সাধুগণ সেই পরমানন্দেরই উপরে আপনাদের আশাশীলতা ও সাহসের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

আধ্যাত্মিক ক্ষুধা-মান্দ্য।

Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness for they shall be filled— Mathew, Chap. V. Vers 6-

অর্থ—ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত ব্যক্তিরাই সৌভাগ্যবান্ কারণ তাঁহাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা চরিতার্থ হইবেই।

মানুষের অভাবই বস্তুর মূল্য। যাহার জন্য কাহারও কোনও অভাব নাই, সে পদার্থের কোন মূল্যই নাই। স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, মণি, মুক্তা প্রভৃতি যে সকল পদার্থ জনসমাজে মূল্যবান্ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, মানুষে না চাহিলে তাহাদের কি কোনও মূল্য থাকিত? মানুষের সে সকলের অভাব আছে বলিয়া সে সকল এত মূল্যবান্। পল্লীগ্রামের পথে চলিবার সময়ে পথের উভয় পার্শ্বে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতা গুল্ম, তৃণ জঙ্গল দেখিয়া থাকি; কে সে সকল লতা গুল্মের দিকে চাহিয়া দেখে বা তাহাদের নাম ও প্রকৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান করে? প্রতিদিন আমরা সেই সকল লতা গুল্ম দেখি এবং প্রতিদিনই উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাই। কিন্তু এক দিন আমার গৃহে একটী শিশুর গুরুতর পীড়া উপস্থিত, চিকিৎসক মহাশয় একটী ঔষধ দিয়াছেন, তাহার অনুপানের জন্য একটী বিশেষ গুল্মের পাতার রস চাই। সেইদিন আমি আর এক চক্ষু লইয়া গৃহের বাহির হইয়াছি! সে দিন আর একভাবে সেই সকল লতা ও গুল্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি!

সে দিন আর তাহাদের প্রতি উপেক্ষা বুদ্ধি নাই। সে দিন একটী বিশেষ গুল্মের মূল্য একশত মুদ্রা হইয়াছে। তবে জানিও যে দিন অভাব-বোধ সেই দিনই মূল্য-বোধ।

অভাব-বোধ হইতেই যেমন সকল পদার্থের মূল্য, ক্ষুধাই তেমনি খাদ্যবস্তুর মূল্য। যাহার ক্ষুধা নাই তাহার নিকট খাদ্যবস্তুর আদরও নাই। একটী সত্য ঘটনার কথা বলিতেছি। আমাদের এই সহরের আলিপুরস্থ প্রাণি-বাটিকাতে যে সকল ব্যাঘ্র আছে, তাহাদিগকে কাঁচামাংস আহার করিতে দেওয়া হয়। প্রতিদিন একই সময়ে একই প্রকার মাংস আহার করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে ব্যাঘ্রদিগের এক প্রকার অরুচি জন্মে। তখন আর তাহারা সেই আমমাংস আহার করিতে চায় না। ব্যাঘ্রদিগের অরুচি জন্মিলে সময়ে সময়ে তাহাদের খাঁচার মধ্যে একটী জীবন্ত ছাগ ফেলিয়া দেওয়া হয়। ঐ জীবন্ত প্রাণীকে হত্যা করিবার জন্য মনের যে আগ্রহ এবং তাহাকে হত করিয়া তাহার কবোষ্ণ রুধির পান করিবার যে আনন্দ, তাহাতে অনেক সময় ব্যাঘ্রদিগের অরুচি সারিয়া যায়। একদিন জানা গেল, একটী ব্যাঘ্রের অরুচি হইয়াছে সে আর আপনার নিয়মিত খাদ্যদ্রব্য আহার করিতেছে না। তখন তাহার খাঁচার মধ্যে একটী জীবন্ত ছাগ ফেলিয়া দেওয়া হইল সকলেই প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন যে ব্যাঘ্র এক মুহূর্ত্তের মধ্যে লম্ফ দিয়া সেই ছাগের উপর পড়িবে এবং নিমেষের মধ্যে তাহাকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া তাহার রুধির পানে নিযুক্ত হইবে। ছাগটীও বিপদ সন্নিকট জানিয়া প্রাণভয়ে আর্ত্তনাদ করিতে

লাগিল। কিন্তু সকলেই দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, ব্যাঘ্রটী ছাগের নিকটে আসিয়া একবার মাত্র তাহার শরীর আঘ্রাণ করিল ও সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। তখন সকলে ভাবিলেন, এখন ক্ষুধা নাই, রাত্রিকালে ক্ষুধা হইলে তাহাকে নিহত করিবে। কিন্তু পরদিন প্রাতে দেখা গেল, ছাগটী নিরাপদে ব্যাঘ্রের শয়নাগারে বাস করিতেছে; ব্যাঘ্র তাহাকে স্পর্শও করে নাই। তখন স্থির হইল, ব্যাঘ্রের কোনও প্রকার গুরুতর পীড়া জন্মিয়া থাকিবে। একবার চিন্তা করিয়া দেখ, এ জগতে কোনও পদার্থের জন্য কোনও প্রাণীর আগ্রহের যদি সম্ভাবনা থাকে, তবে জীবন্ত ছাগের জন্য ব্যাঘ্রের আগ্রহ সুনিশ্চিত। কিন্তু সেই জীবন্ত ছাগকেই ব্যাঘ্র স্পর্শ করিল না। যাহার উপরে মহানন্দে লম্ফ দিয়া পড়িবার কথা, তাহাকে স্পর্শও করিল না।

আর একটী গল্প বলি। প্রাচীন গ্রীসের স্পার্টা নগরের কথা সকলেই শুনিয়াছেন। এই স্পার্টাবাসিগণ, সাহস, শ্রম-দক্ষতা ও সমরকুশলতার জন্য ইতিবৃত্তে প্রসিদ্ধ। স্পার্টাবাসি-গণ আহার করিবার সময় একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ জুষ (black broth) পান করিত, যাহার সুখ্যাতি দেশ বিদেশে প্রচার হইয়াছিল। লোকে বলিত স্পার্টার কৃষ্ণবর্ণ জুষের ন্যায় সুস্বাদু জুষ আর নাই। এইরূপে সেই কৃষ্ণবর্ণ জুষের প্রশংসা শুনিয়া শুনিয়া মিশরদেশীয় একজন রাজার মনে তাহা পান করিয়া দেখিবার ইচ্ছা জন্মিল। তিনি স্পার্টানগর হইতে একজন সুপরিপক্ক পাচক আনাইলেন। পাচক সমুচিত সতর্কতার

সহিত কৃষ্ণবর্ণ জূষ প্রস্তুত করিল। কিন্তু মিশররাজ তাহা মুখে দিয়া উদরস্থ করিতে পারিলেন না; তাহা এতই বিস্বাদ মনে হইল। তখন তিনি পাচককে ডাকাইয়া বলিলেন, "এই তোমাদের স্পার্টার কৃষ্ণবর্ণ জূষ!" পাচক করযোড়ে কহিল—"মহারাজ! ইহাতে একখানি মসলা পড়ে নাই।" রাজা বলিলেন—"সে কি কথা, আগে কেন বল নাই? যে মসলার প্রয়োজন, তাহা আমি আনাইয়া দিতাম।" পাচক বলিল—"মহারাজ! সে মসলাখানির নাম ক্ষুধা।" ঠিক কথা, যেখানে ক্ষুধা নাই, সেখানে খাদ্যবস্তুর স্বাদও নাই।

ক্ষুধা বৃদ্ধি হইলে খাদ্য বস্তুর জন্য আগ্রহ বৃদ্ধি হয়, ইহা সকলেই জানে। এইজন্য যাহারা কুক্কুটের লড়াই খেলিয়া থাকে, তাহারা তৎপূর্ব্বে কুক্কুটগুলিকে দুই এক দিন অনাহারে রাখে। ক্ষুধার্ত্ত অবস্থাতে খাদ্যবস্তু যখন তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন ঐ সকল পক্ষী জীবন মরণ পণ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। এই জন্যই বোধ হয় ঈশ্বরও আমাদের আধ্যাত্মিক ক্ষুধার অন্ন বিলম্বে দিয়া থাকেন। আমাদের পাপের প্রতি যখন ঘৃণা জন্মে এবং আমরা নবজীবন লাভের জন্য ব্যগ্র হই, তখন এমনি মনে হয় যেন এক মুহূর্ত্তের বিলম্বও সহ্য হয় না! যদি এক লম্ফে নরকের গভীর গর্ত্ত হইতে সপ্তম স্বর্গে উঠা সম্ভব হয়, তবে তাহা আমার পক্ষে ঘটুক। কিন্তু জীবনের পরীক্ষাতে দেখা গিয়াছে যে, পাপী এক লম্ফে সপ্তম স্বর্গে উঠিতে চাহিলেও ঈশ্বর তাহা তোলেন না। এক মুহূর্ত্তে মন ফিরিতে পারে, এক মুহূর্ত্তের মধ্যে

পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মিতে পারে, কিন্তু এক মুহূর্ত্তে কেহ স্বর্গের দেবতা হইতে পারে না। পুণ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সাধনা-সাপেক্ষ, তাহা অনেক দিনের, অনেক পরীক্ষার ও অনেক সংগ্রামের ফল। মুমুক্ষু আত্মার ধর্ম্ম-ক্ষুধা জন্মিলে ঈশ্বর প্রার্থিত বস্তুকে ধীরে ধীরে দিয়া আগ্রহকে বৃদ্ধি করিয়া থাকেন।

ইহা আমরা সকলেই অনুভব করিয়া থাকি, যে শারীরিক ক্ষুধামান্দ্যের ন্যায় আধ্যাত্মিক ক্ষুধামান্দ্য ও আছে। জগতে সদুপদেশের অপ্রতুল নাই ; সাধুদৃষ্টান্তেরও অভাব নাই ; কিন্তু যে ব্যক্তির ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধা নাই, সে ব্যক্তির পক্ষে সে সমুদায় থাকিয়াও নাই। আমাদের কি সময়ে সময়ে ঐরূপ অবস্থা ঘটিতেছে না? কত ঋষি মুনির, কত সাধু সজ্জনের মহান উপদেশ সকল কি অনেক সময় আমাদের নিকট ব্যর্থ যাইতেছে না? উপনিষদকার ঋষিগণ, অথবা ঈশা, মুষা, মহম্মদ প্রভৃতি মহাজনগণ, যদি আজ স্বর্গধাম হইতে অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে কি আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন না—"আমরাত তোমাদের জন্য উত্তম সন্দেশ ভিয়ান করিয়াছিলাম, তোমাদের ক্ষুধা নাই, সে জন্য তাহার মূল্য বঝিতে পারিলে না?" হায়! হায়! আমাদের অনেকের প্রতি তাঁহাদের এই কথা খাটে।

এখন প্রশ্ন এই, এ প্রকার আধ্যাত্মিক ক্ষুধামান্দ্য উপস্থিত হইবার কারণ কি? ইহার অনেক প্রকার কারণ আছে। প্রথম কারণ জীবনের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার ক্ষুদ্রতা। মানুষের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা অনুসারেই তাহার জীবনের উন্নতি হইয়া

থাকে। চাঁদে আঘাত করিবার জন্য যদি কেহ ঢিল ছোড়ে তবে তাহার ঢিল অন্ততঃ দুই শত হাতও উঠে, কিন্তু আমাদের এই মন্দিরের, ঐ স্তম্ভের মস্তকে প্রহার করা যাহার লক্ষ্য তাহার চেষ্টাও সেই পরিমাণে অল্প হয়। যে ব্যক্তি মনে করিতেছে, জনসমাজে থাকিয়া অধিক ধর্ম্ম আর কি করিব, অমনি চলনসই একটু ধর্ম্ম থাকিলেই হয়, তাহার আধ্যাত্মিক ক্ষুধামান্দ্য উপস্থিত হওয়া অনিবার্য্য।

দ্বিতীয় কারণ, দৈনিক উপাসনার অভ্যাসের অভাব। অনেকে দৈনিক উপাসনার অভ্যাস রক্ষা করিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। তাঁহারা মনে করেন, দৈনিক উপাসনার জন্য একটা স্থান বা সময় রাখিবার প্রয়োজন কি? অনেক সময় দেখা যায়, এরূপ দৈনিক উপাসনা একটা শুষ্ক ও নীরস নিয়ম-রক্ষার মত হইয়া পড়ে। আমাদের দৈনিক উপাসনা যে প্রতিদিন সরস হয় না, তাহা আমি জানি; এবং এক এক সময়ে এই নিয়ম রক্ষা করা যে ভার-স্বরূপ হয়, তাহাও আমার বিলক্ষণ জানা আছে। কিন্তু তাহা হইলেও এ নিয়মটা রক্ষা করা কর্ত্তব্য। কারণ দশদিন নীরস হইতেছে দশদিন ত সরস হইতে পারে; দশদিন ত এই দ্বার দিয়া ব্রহ্মকৃপা প্রচুর পরিমাণে তোমার হৃদয়ে আসিতে পারে। তুমি দ্বারটা বন্ধ কর কেন? যাঁহারা কখনও বসন্তকালে বা গ্রীষ্মের প্রারম্ভে পঞ্জাব দেশে গিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন, যে এক একটী প্রকাণ্ড নদী শুষ্ক বিশুষ্ক ও শীর্ণদেহ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। দুই মাইল ব্যাপিয়া বালুকারাশি ধূধূ করিতেছে। নদীর মধ্যস্থলে

দুই চারি হাত পরিসর একটী জলধারা প্রবাহিত! তাহাও আবার এমনি অগভীর যে একটী শৃগালও অনায়াসে পার হইয়া যাইতেছে। এই শীর্ণকায় নদী দেখিয়া কেহ মনে করিতে পারেন, এখনকার লোক কি নির্ব্বোধ, এত বড় বৃহৎ পরিসর স্থান ফেলিয়া রাখিয়াছে; কেন ঐ বালুকারাশি ঘিরিয়া পটলের চাষ করে না? কিন্তু পঞ্জাবের কোনও কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে ঐ নদীকে এখন শীর্ণকায় দেখিতেছেন, কিন্তু বর্ষা-কালে ঐ নদীতে যখন বন্যা আসে, তখন কাণায় কাণায় জল হয়, এবং নদীতে জল ধরে না। এখন যদি ঐ খাত বন্ধ করি, বন্যার জল কোথা দিয়া প্রবাহিত হইবে? তাহা হইলে সে জল অন্য পথ দিয়া চলিয়া যাইবে এখানে আর আসিবে না, তাই খাতটা বাহাল রাখিতে হয়। তেমনি আমিও বলি হে ব্রহ্মোপাসক তুমিও খাতটা বাহাল রাখ; দুদিনের শুষ্কতা দেখিয়া খাতটা বন্ধ করিয়া দিও না; তাহা হইলে ব্রহ্মকৃপা তোমার হৃদয়-ক্ষেত্র পরিহার করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবে জীবনে নিত্য উপাসনার ব্যবস্থা না থাকিলে বিষয়-কার্য্যের বহু-লতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক ক্ষুধা তৃষ্ণা একেবারে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।

তৃতীয় কারণ, দৈনিক জীবনে ধর্ম্মবিরোধী কার্য্য। অনেকে এমন সকল বিষয়-কার্য্যে লিপ্ত আছেন, যাহাতে তাঁহাদিগকে প্রতিদিন অসত্য আচরণ করিতে হয়। তাঁহাদের ধর্ম্মবুদ্ধি প্রথম প্রথম অনেক বাধা দিয়াছে; কিন্তু তাঁহারা সংসারের ক্ষতি লাভ গণনা করিয়া, ধর্ম্মবুদ্ধির সে নিষেধ-বাণীর প্রতি কর্ণপাত করেন

নাই। মনে করিয়াছিলেন, ঈশ্বর দুর্ব্বলের ঐ অপরাধটুকু গণনা করিবেন না। ঐ একটু একটু অসত্যাচরণও চলিবে এবং ঈশ্বরারাধনাও চলিবে। কিন্তু ফলে তাহা হইল না। ঈশ্বর শাস্তিস্বরূপ ধর্ম্মের ক্ষুধা নিবারণ করিয়া দিলেন।

চতুর্থ কারণ, ধর্ম্মবিরোধী সঙ্গ। এমন অনেক উপাসক আছেন যাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া এমন স্থানে ও এমন লোকের সঙ্গে দিবসের অধিকাংশ সময় যাপন করিতে হয়, যেখানে সততই কুৎসিত আলাপ. কুৎসিত আমোদ, বা কুৎসিত ক্রিয়া চলিয়া থাকে। তাঁহারা চক্ষুলজ্জাবশতঃই হউক. বা অন্য কোনও কারণে হউক আপনাদিগকে ঐ সকল সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন না। তাহার ফল এই হয়, তাঁহাদের চিত্ত অল্পে অল্পে মলিন হইতে থাকে; এবং তাঁহাদের হৃদয়ের ধর্ম্মাগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যায়। শেষে তাঁহারাও লঘুভাবে কথা কহিতে ও লঘুভাবে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত হন। তৎপর সাধুসঙ্গ অপেক্ষা এই সঙ্গ ভাল লাগিতে থাকে; এবং শাস্ত্রালোচনা অপেক্ষা পরচর্চ্চাতে অধিক আনন্দ জন্মে। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের ধর্ম্মের ক্ষুধা একেবারে নির্ব্বাণ হইয়া যায়।

চিন্তা করিলে আধ্যাত্মিক ক্ষুধামান্দ্যের আরও অনেক প্রকার কারণ নির্ণীত হইতে পারে। এ সকল কারণ প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায় এই যে. আমরা এই সকলের দ্বারা নিজ নিজ হৃদয়কে পরীক্ষা করিয়া দেখিব এবং ঐ সকল কারণকে পরিহার করিবার চেষ্টা করিব। সকলের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত তাঁহাদের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা বাড়িতেছে কি কমিতেছে। যে

কেহ আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্পাদন করিতে ইচ্ছুক, তিনি এই সকল দিয়া আপনার জীবন পরীক্ষা করুন, দেখুন তাঁহার আকাঙ্ক্ষা হীন হইতেছে কি না, তিনি নিত্য উপাসনা করেন কি না, তাঁহার দৈনিক কার্য্য সকলের মধ্যে এমন কিছু আছে কি না যাহাতে আধ্যাত্মিক মলিনতা উৎপাদন করে, তাঁহাকে দিন দিন স্বার্থের জালে জড়িত হইয়া পড়িতে হইতেছে কি না, এবং তিনি এমন সকল সঙ্গীর মধ্যে বাস করিতেছেন কি না যাহারা তাঁহাকে ঈশ্বরের সান্নিধ্য হইতে দূরে লইয়া যাইতেছে। এইরূপে আমাদিগকে সর্ব্বদা আত্মপরীক্ষা করিতে হইবে, এবং যদি দেখি আমাদের ক্ষুধা নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তবে যেন তজ্জন্য অনুতাপ করি এবং যে সকল কারণে ঐরূপ হইতেছে, সে সকল কারণ পরিহার করিতে চেষ্টা করি। ইহাতে আমাদের হৃদয়ে কিছু বিনয় আসিতে পারে। আমরা সকলেই রোগী, রোগের যাতনায় সর্ব্বদা কষ্ট পাইতেছি। আমাদিগের হৃদয়ে কত সময় কত সত্য আসে, আমরা সে সকলকে গ্রহণ করি না। চিন্তা করিলে দুঃখে ম্রিয়মাণ হইতে হয়। জীবনের প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত কত কত সত্য লাভ করিলাম, কত জ্ঞান প্রাপ্ত হইলাম, কত উপদেশ শুনিলাম, কিন্তু জীবনে সে উন্নতি দেখা গেল না। এই সকল যখন চিন্তা করি তখন মনে হয়, অন্ততঃ কিছুকালের জন্য এই সকল উপদেশ বন্ধ করা যাউক, এবং যাহা শুনিয়াছি সেই সকল লইয়া কিছুদিন রোমন্থন করা যাউক, পশুরা যেমন রোমন্থন করে, ইচ্ছা হয় আমরাও সেইরূপ করি। বালকেরা যে পুস্তক পাঠ করে,

তাহা যখন খুলি দেখি তাহার মধ্যে কত সত্য কত নীতি রহিয়াছে; তাহার একটীও যদি কেহ সাধন করিতে পারেন তবে তিনি ধার্ম্মিক হইয়া যান। একবার সকলে অনুতাপ করুন, অনুতাপ না করিয়া, ভগবানের চরণে মাথা না রাখিয়া, আজ কেহ এখান হইতে চলিয়া যাইবেন না। আমাদের সকলকে মহা ব্যাধিতে ধরিয়াছে। আমাদের হৃদয়ের নিকটে কত সত্য রহিয়াছে, কত সাধু সর্ব্বদা বাস করিতেছেন, আমরা তাহা দেখিয়াও দেখি না। কত ঈষা, কত মুষা, কত বুদ্ধ, কত মহম্মদ আমাদের হৃদয়দ্বারে সর্ব্বদা আসিতেছেন, কিন্তু হায় হায়! ঐ পশুশালার বাঘ যেমন ছাগশিশুকে স্পর্শ করিল না, শুঁকিয়া চলিয়া গেল, আমরাও তেমনি ঐ সকল মহাজনকে একবার স্পর্শও করি না; শুঁকিয়া চলিয়া যাই। যতদিন আমাদের এই ব্যাধি দূর না হইবে ততদিন আমাদের অপ-রাধ বাড়িবে, কমিবে না; এবং আমরা ধর্ম্মের খোসা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিব। আসল জিনিস লাভ করিতে সমর্থ হইব না। ঈশ্বর করুন যেন আমাদের এই ভাব দূর হয় এবং আধ্যাত্মিক ক্ষুধা দিন দিন বৃদ্ধি হয়।

তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব।

তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব।

অর্থ—তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা কর।

তপস্যার দ্বারা জানিবার চেষ্টা কর। তপস্যা শব্দের অর্থ কি? তপস্যা বলিলে এদেশে সচরাচর এই অর্থ বুঝায় যে, ইষ্ট দেবতার প্রসন্নতা লাভের নিমিত্ত শরীর ও মনকে কঠিন নিগ্রহ করা। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত এদেশের প্রাচীন সাহিত্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পার্ব্বতী শিবকে পতিরূপে পাইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিলেন; অর্জ্জুন ইন্দ্রের ও শিবের আরাধনার্থ ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে তপস্যা করিলেন; ধ্রুব বিমাতার বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া অরণ্যে গিয়া তপস্যা করিলেন; ইত্যাদি যত পৌরাণিক আখ্যায়িকা আছে, সর্ব্বত্রই তপস্যার অর্থ একই;—ইষ্টদেবতার প্রসাদনের জন্য শরীর মনের নিগ্রহ করা। তপস্যার এই ভাব অদ্যাপি এদেশীয় সাধকগণের মনে বদ্ধমূল রহিয়াছে। এই কৃচ্ছ-সাধনের ভাব এক সময়ে এদেশে প্রবল ছিল, এখন আর নাই, এরূপ নহে। এখনও এদেশের নানা স্থানে হিন্দুসাধক-দিগকে এই প্রকার কঠোর তপস্যার পথ অবলম্বন করিতে দেখা যায়। এদেশের তীর্থস্থান সকলে পরিভ্রমণ করিলে এখনও দেখা যায়, হয়ত কেহ দশ বৎসর বা বিশ বৎসর ধরিয়া ঊর্দ্ধ বাহু হইয়া রহিয়াছেন; কেহ বা চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বালিয়া পঞ্চতপা হইতেছেন; কেহবা লৌহশলাকাময় শয্যাতে শয়ন

করিয়া দিবারাত্রি যাপন করিতেছেন; ইঁহাদের কঠোর সাধনা ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা দেখিলে স্তব্ধ হইয়া থাকিতে হয়। ধর্ম্মার্থে নরনারী যে সকল ক্লেশ সহ্য করিয়াছেনও অদ্যাপি করিতেছেন, তাহা স্মরণ করিলে চিত্ত বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া যায়। একবার একজন লোক ইষ্টদেবতার প্রসাদনার্থ এই ব্রত লইয়াছিলেন, যে হরিদ্বার হইয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতভূমির দৈর্ঘ্যটা নিজের শরীর দ্বারা মাপিয়া মাপিয়া যাইবেন। তিনি নয় বৎসরে শুইয়া শুইয়া এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলে তপস্যা বোধেই এই সকল কার্য্য করিয়াছেন এবং অদ্যাপি করিতেছেন। যাঁহারা এই প্রকার তপস্যা করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাঁহারা সচরাচর জনসমাজ হইতে অবসৃত হইয়া এই সকল তপস্যা করিয়াছেন। কিন্তু তপঃ শব্দের আর এক অর্থ আছে—চিত্তের একাগ্রতা। চিত্ত বিক্ষেপের নানা কারণের মধ্যে চিত্তকে একাগ্র করিয়া ঈশ্বরেরসত্তা ও সান্নিধ্যে অর্পণ করাও তপস্যা। ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ জনসমাজের মধ্যে থাকিয়াও যে এই প্রকার তপস্যা করিয়া থাকেন, আমরা অনেক সময় তাহা লক্ষ্য করি না। শীত গ্রীষ্ম সহ্য করিতে পারা, বা কোনও প্রকার শারীরিক ক্লেশে অভিভূত না হওয়া, মানসিক বলের কর্ম্ম তাহাতে সন্দেহ নাই; এবং এ সাধনে যাঁহারা কৃতকার্য্য হন তাঁহারাও যে প্রশংসার যোগ্য তাহাতেও সন্দেহ নাই, কিন্তু বিশৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারী প্রকৃতিকে শৃঙ্খলার অধীন করা, অলস ও সুখপ্রিয় চিত্তকে সদানুষ্ঠানে রত করা, অচঞ্চল ভাবে জীবনের ক্ষুদ্র ও মহৎ

তাবত কর্ত্তব্য কার্য্যকে সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা, এবং সর্ব্ব বিষয়ে ও সর্ব্ব কার্য্যে ধর্ম্মের উচ্চ আদের্শর অনুসরণ করা ও ঈশ্বরের সত্তা ও সান্নিধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা—ইহাও সামান্য মানসিক বলের কর্ম্ম নহে। জীবনের কর্ত্তব্য সম্পাদনে বা ঈশ্বরের শ্রবণ মননে প্রবৃত্ত হইতে গেলেই আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের প্রবৃত্তিকুল ও আমাদের উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি আমাদিগকে সুস্থির হইতে দেয় না। চিত্ত সর্ব্বদাই চঞ্চল হইয়া বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে পরিভ্রমণ করিতে চায়। উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতিকে শৃঙ্খলিত করা ও চঞ্চল চিত্তকে সংযত রাখা কি সামান্য তপস্যার কর্ম্ম? অতি প্রাচীন কাল হইতেই সকল শ্রেণীর সাধকগণ এই চিত্তচাঞ্চল্য নিবারণ করাকে দুষ্কর বলিয়া অনুভব করিয়া আসিতেছেন। ভগবদ্গীতাতে অর্জ্জুন কৃষ্ণকে বলিতেছেন ঃ—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ং।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং॥

অর্থ—"হে কৃষ্ণ! মন স্বভাবতঃ অতিশয় চঞ্চল ও অতিশয় অনবহিত, আমি তাহার নিগ্রহকে বায়ুর নিগ্রহের ন্যায় দুষ্কর বলিয়া মনে করি।" ইহাতে কৃষ্ণ উত্তর করিতেছেন—

অসংশয়ং মহাবাহো! মনো দুর্নিগ্রহং চলং।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥

অর্থ—"হে মহাবাহো! মন যে স্বভাবতঃ চঞ্চল, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু অভ্যাস দ্বারা ও বৈরাগ্যের দ্বারা তাহাকে সংযত করা যায়।"

ধর্ম্মপদ নামক বৌদ্ধগ্রন্থে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা আছে ;—পুরাকালে বুদ্ধ যখন শ্রবস্তি নগরের সন্নিহিত জেতবন নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন, তখন একদিন একজন ধনী গৃহপতি তাঁহার নিকটে আসিল ; এবং তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া বলিল,—"হে জগতের বন্দনীয় গুরো ! আমি যখন উপাসনা বা অন্য কোনও ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই, তখন কোনও না কোন স্বার্থ-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া আমার চিত্তকে চঞ্চল করে ও আমার মনের শান্তি হরণ করে। আপনি কৃপা করিয়া ইহার উপায় নির্দ্দেশ করুন।" শাক্যসিংহ তাহাকে বসিতে আদেশ করিয়া তাহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সে পুনরায় চরণে প্রণত হইয়া বলিল, "যে ভূতপূর্ব্ব রাজার অধিকার কালে সে রাজার হাতীর মাহুত ছিল।" শাক্যসিংহ বলিলেন,—"যেরূপে হাতী বশ করিয়াছ সেইরূপে আপনাকে বশ করিবে।" ইহাও সেই ভগবদ্গীতার কথা—অভ্যাস দ্বারা আপনাকে বশীভূত কর। হস্তীকে বশীভূত করার ন্যায় "অভ্যাসের" কার্য্যকারিতার উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত আর হইতে পারে না। হস্তীকে পোষ মানান কিরূপ দুষ্কর শ্রমসাধ্য ও সময়সাধ্য ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আমরা দেখি হস্তী প্রকাণ্ড বলবান জন্তু হইয়াও ক্ষুদ্র মানবের বশীভূত রহিয়াছে ! "বোস" বলিলে বসিতেছে, "ওঠ' বলিলে উঠিতেছে ! সমুদায় আদেশের অর্থ গ্রহণ করিতেছে, ও তাহা সম্পাদন করিতেছে ! কিন্তু সেই বাধ্যতার পশ্চাতে যে কতদিনের সাধনা রহিয়াছে তাহা ভুলিয়া যাই। বন্য অবস্থাতে তাহাকে

ধরিয়া কত দিন দৃঢ় শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছে, কত দিন অনাহারে যাতনা ভোগ করাইতে হইয়াছে, একটী শব্দ কত সহস্র বার শুনাইতে হইয়াছে, এবং তদনুসারে কার্য্য করাইবার জন্য তাহার শরীরকে কত ব্যথা দিতে হইয়াছে। হয়ত সে কতবার শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে, কত ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে, আবার ধরিয়া আনিতে হইয়াছে, কত মাহুতকে খঞ্জ করিয়াছে, তবে সে ক্রমে ক্রমে বশীভূত ও আজ্ঞানুগত হইয়াছে।

আমাদের অশাসিত প্রকৃতিও কি কিয়ৎ পরিমাণে অরণ্যচারী মত্ত বারণের ন্যায় নয়? হস্তীকে ধরিয়া রাখা ও পোষ মানান যেরূপ দুষ্কর, বলপূর্ব্বক ধরিয়া রাখিলে সে যেমন এক গ্রাসও আহার করিতে চায় না, কেবল পলাইতে চায়, সেইরূপ আমাদের মনও কি অসংযত অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতে ভাল বাসে না? সেই মনকে ধরিয়া বাঁধিয়া ধর্ম্মের অধীন এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানের অধীন করাও তেমনি শ্রমসাধ্য ও সময়সাধ্য। উপনিষদকার ঋষিগণ মানব প্রকৃতির এই ভাব লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছিলেন—

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বাইব সারথেঃ॥

অর্থ—"যে ব্যক্তি বিজ্ঞানবান ও সংযত-চিত্ত তাহার ইন্দ্রিয় সকল উপযুক্ত সারথির সদশ্বের ন্যায় বশীভূত।"

অশ্বকেও বশীভূত করিতে কত সাধনার প্রয়োজন!

যাঁহারা জনসমাজের সহস্র প্রকার চিত্ত বিক্ষেপকারী ঘটনা

ও কার্য্যের মধ্যে চিত্তকে ধর্ম্মের ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের অনুগত করিতে প্রয়াসী হন, তাঁহাদের যে সাধনা, তাহা কি তপস্যা-শব্দ-বাচ্য নহে? বরং প্রকৃতভাবে বিচার করিলে ইঁহাদের তপস্যা প্রথমোক্ত তপস্বিগণের তপস্যা অপেক্ষাও অধিক দুষ্কর বোধ হইবে! এক কোপে সংসারের বন্ধন-রজ্জু ছিন্ন করিয়া দিয়া, প্রলোভনের অতীত স্থানে গিয়া চিত্ত-সংযম সাধন করা তত কঠিন নহে। কিন্তু জনসমাজের সহস্র প্রকার কার্য্য ও প্রলোভনের মধ্যে আপনাকে ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার প্রয়াস পাওয়া, আশা ও নিরাশার আন্দোলনের মধ্যে আপনার আদর্শকে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া রাখা, দিন দিন তিল তিল করিয়া আপনার উচ্ছৃঙ্খল ও সুখপ্রিয় প্রকৃতিকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনয়ন করা, প্রাণপণে যত্ন ও ক্লেশ বহন করিয়া জীবনের কর্ত্তব্য সকল সাধন করা অতিশয় কঠিন। আমরা প্রতিদিন ইহা অনুভব করিতেছি। আমাদের কোন্ দিন এমন যায় যেদিন জীবনের সমুদায় কর্ত্তব্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছি না বলিয়া শোক করিতে হয় না? অনেক দিন কি এমন হয় না, যে আমাদের মন ধর্ম্মজীবনের সংগ্রামে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে। মনে হয়, আর পারি না, বুঝিবা এ পথ আমার জন্য নহে। আর এ রণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি না, দূর হোক পলায়ন করি?” আপনাকে শাসনে রাখিতে গিয়াই এই যাতনা; অপরের প্রতি, সমাজের প্রতি যে কর্ত্তব্য তাহার বিষয়ে চিন্তা করিলে আবার এই যাতনা শতগুণ বৃদ্ধি হয়। যে আপনাকে সামলাইতে পারিতেছে না,

সে আবার অপরকে কিরূপে সামলাইবে? যখন লোকে বলে ঐ দেখ পরিবার সকল উপাসনাবিহীন, ধর্ম্মভাববিহীন হইয়া যাইতেছে; ঐ দেখ বালক বালিকাগণ ধর্ম্মভাববিহীন হইয়া পড়িতেছে ও দুশ্চরিত্র হইয়া উঠিতেছে; ঐ দেখ নারীগণ স্বার্থপর ও বিলাসপ্রিয় হইয়া পড়িতেছে; তখন মন আরও গভীর নিরাশার মধ্যে পতিত হয়। মন বলিতে থাকে এই সকলের উপায় বিধান কি আমার ন্যায় ক্ষুদ্র শক্তি-বিশিষ্ট লোকের কাজ? এ সকল বিষয়ে চিন্তা করা কেবল যাতনা বৃদ্ধি করা মাত্র, আমি নিজের রোগেই নিজে মরি, অপর রোগীর সংবাদ আর কি লইব! অতএব এ সকল বিষয় আর দেখিব না, ভাবিব না, এ সম্বন্ধে আমার কিছু কর্ত্তব্য থাকিলেও তাহা সাধনের শক্তি নাই; সুতরাং সে বিষয়ে ভাবিবারও প্রয়োজন নাই। ওরা মরে মরুক, ডোবে ডুবুক, আমি যদি পারি আপনি বাঁচিবার প্রয়াস পাই।

চিন্তা করিলেই দৃষ্ট হইবে, এরূপ ভাব মূলে সেই চিরন্তন স্বার্থপর সাধনের ভাব, অর্থাৎ সহজ তপস্যাতে ঈশ্বর লাভ করিবার প্রয়াস মাত্র। প্রকৃত বিশ্বাস ও প্রেমের প্রকৃতি এই, ইহা পরীক্ষাকে ভয় করে না, বিপদে আনন্দিত হয় ও শ্রমকে মিষ্ট জ্ঞান করে। সৈন্যগণ সচরাচর যুদ্ধের সাধারণ নিয়মানুসারে যুদ্ধ করে, কিন্তু কখনও কখনও বিশেষ বিপদে এরূপ হয় যে জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শত্রুবৃন্দের গোলাগুলির বর্ষণের মধ্যে অগ্রসর হইতে হয়। অনবরত বৃষ্টিধারার ন্যায় গোলাগুলি বর্ষণ হইতেছে, আর তন্মধ্যে কতিপয় বীরহৃদয়

অকুতোভয়ে সিংহ-বিক্রমে শত্রুকুলের অভিমুখে দৌড়িতেছে। ইহাতে কিরূপ সাহস ও স্বদেশ-প্রীতির পরিচয়! তেমনি জীবনের নানা অসুবিধার মধ্যে যিনি ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাঁহাতেই প্রকৃত বিশ্বাস ও প্রেমের পরিচয়।

অতএব জীবনের প্রতিদিনের কার্য্যের মধ্যেও একপ্রকার তপস্যা আছে, যাহা চিত্তের একাগ্রতার দ্বারা লাভ করিতে হয়। এই তপস্যা ব্রহ্মকে জানিবার একটী প্রধান উপায়-স্বরূপ। ঋষিগণ বলিয়াছেন তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মকে জান এই উক্তির মধ্যে কি গভীর তাৎপর্য্য নিহিত রহিয়াছে। ঋষিগণ একথা বলিলেন না,-বিচার দ্বারা বা শাস্ত্রালোচনার দ্বারা ব্রহ্মকে জান, কিন্তু বলিলেন যে তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মকে জান। ইহার কারণ কি? চিন্তা করিলেই ইহার কারণ অনুভব করিতে পারা যাইবে। ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রহ্মজ্ঞান এ দুইটী স্বতন্ত্র বস্তু! ব্রহ্মের স্বরূপ বিষয়ে নানা যুক্তি ও নানা শাস্ত্রের মত বিষয়ে যিনি অভিজ্ঞ তিনি ব্রহ্ম-বিদ্যাতে নিপুণ, কিন্তু নিজ আত্মাতে ব্রহ্মস্বরূপের আস্বাদন যিনি করেন, তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ। যুগে যুগে সাধুগণ একবাক্যে এই কথাই বলিতেছেন যে, চিত্তের পবিত্রতা না হইলে, ব্রহ্মদর্শন অথবা ব্রহ্মের রূপাস্বাদন হয় না। তপস্যার এই মহাগুণ, ইহা চিত্তকে স্বার্থ ও সুখাসক্তির নিম্নভূমি হইতে তুলিয়া নিঃস্বার্থতার ও কর্ত্তব্যপ্রিয়তার উচ্চ ভূমিতে স্থাপন করে। সেই উচ্চ ভূমির পবিত্র বায়ুই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভের অনুকূল। চিত্তের একাগ্রতার দ্বারা প্রবৃত্তি-কুলের উত্তেজনা প্রশান্ত হয়, অধ্যাত্মিক দৃষ্টি উজ্জ্বল ও আত্ম-

শক্তি বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং ব্রহ্মকে যিনি জানিতে চাহেন তাঁহার পক্ষে চিত্তের একাগ্রতা একান্ত প্রয়োজনীয়।

আর এই একটা সুখের বিষয় যে, এরূপ তপস্যার সুবিধা ও সুযোগ আমাদের সকলের জীবনেই আছে। আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যাহার জীবনে প্রলোভন বা পরীক্ষা নাই, বা যাহার এমন কর্ত্তব্য কার্য্য কিছু নাই, যেজন্য প্রবৃত্তিকুলকে সংযত করিতে হয়? আমরা যেন সর্ব্বদাই স্মরণ রাখি যে ধর্ম্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বহু বৎসরের সাধনার কাজ। হাতীকে বশ করা যেমন মাহুতের কঠোর তপস্যার কর্ম্ম, তেমনি আমাদের প্রকৃতিকে ধর্ম্মের অধীন করা বহুবৎসরের শ্রমের কর্ম্ম। সেই শ্রম ও সাধনা কি তপস্যা নহে? কখনও কখনও কোনও কোনও গায়কের কথা শুনিতে পাই, যাঁহারা বিশ পঁচিশ বৎসর গুরু সন্নিধানে থাকিয়া দিন দিন অনেক ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া তবে সংগীত বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। ইহা কি তপস্যা নহে? আমরা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাইয়াছি, তাহা উপার্জ্জন করিতে কাহাকেও পনর বৎসর কাহাকেও বা বিশ বৎসর প্রতিদিন দশ বার ঘণ্টা বিদ্যা চর্চ্চাতে যাপন করিতে হইয়াছে, ইহা কি তপস্যা নয়? সামান্য লৌকিক বিদ্যালাভের জন্য তপস্যা করিতে আমরা পরাঙ্মুখ হই নাই; ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য তপস্যা করিতে কেন পরাঙ্মুখ হইব। ঈশ্বর করুন আমরা যেন ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া এই শ্রেষ্ঠ তপস্যাতে প্রবৃত্ত থাকিতে পারি।

ভয়ের ধর্ম্ম ও প্রেমের ধর্ম্ম।

For thou desirest not sacrifice; else would I give it; thou delightest not in burnt offering. The sacrifices of God are a broken spirit; a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise—Psl of David LI. Verses 16&17.

অর্থ—তুমি বলি পাইবার ইচ্ছা রাখ না, নতুবা আমি তাহা দিতাম, ধুপ, দীপ, হোমাদিতেও তুমি তুষ্ট নও; ভগ্ন আত্মা রূপ বলিই ঈশ্বরের গ্রাহ্য, ভগ্ন ও অনুতপ্ত হৃদয়কে হে ঈশ্বর তুমি অবহেলা করিবে না।”

এই বেদী হইতে এ কথার অনেকবার আলোচনা করা হইয়াছে যে, জগতের অধিকাংশ জাতির মধ্যে ভয় হইতেই প্রণতি, স্তুতি, পূজা প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠানের উৎপত্তি হইয়াছে। ইষ্ট দেবতার প্রসাদনার্থই পূজার সৃষ্টি। যে কুপিত এবং যাহার কোপ হইতে অনিষ্টাপতের আশঙ্কা, তাহারই প্রসাদনের প্রয়োজন। আদিম বর্ব্বর অবস্থাতে মানবের মনে পূজার এই ভাবই বিদ্যমান ছিল। আদিম মানুষ অনভিজ্ঞ চক্ষু লইয়া জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিয়াছে যে, কি এক দুর্জ্জয় শক্তি সেখানে ক্রীড়া করিতেছে, যাহার কার্য্য সকল ত্রাসজনক ও যাহার প্রকোপ অদম্য। মানব স্বভাবতঃই এই শক্তির সমক্ষে নতজানু হইয়া পড়িয়াছে এবং প্রার্থনা করিয়াছে,—“মা

মা হিংসীঃ"—"আমাকে বিনাশ করিও না"। তৎপরেই এই শক্তির প্রসাদন প্রয়োজনীয় বোধ হইয়াছে; এবং প্রসাদনার্থ বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। ইহাই আদিম পূজা। কিন্তু ভয় হইতে যে পূজার উৎপত্তি হয়, তাহাতে বলিদানের ভাব সন্নিবিষ্ট হওয়া অনিবার্য্য। কারণ মানুষ আপনার জীবনের ঘটনা দিয়াই বিচার করে। আদিম অবস্থার মনুষ্যগণ দেখিয়াছে, যে যখন কোনও দুর্জ্জয় রাজা বা দস্যু-দলপতি অপর দেশকে আক্রমণ করে, তখন কিছু না লইয়া যায় না। তাহারা যাহা চায়, তাহা না দিতে পার, আর একটা এমন কিছু দেও, যাহাতে তাহাদের সন্তোষসাধন হইতে পারে। বিগত শতাব্দীতে আমাদের এই বঙ্গদেশে বর্গীর হাঙ্গামা ছিল। বর্গিগণ যখন আসিত তখন কিছু না লইয়া যাইত না। টাকা দিতে না পার, ক্ষেত্রের শস্য দেও; ক্ষেত্রের শস্য না থাকে, গরু বাছুর দেও; কিছু দিতেই হইবে, নতুবা নিষ্কৃতি নাই। ভয়ের ধর্ম্মেও এই ভাব। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এদেশের অপামর সাধারণ সকল লোকেই প্রেতাবেশে বিশ্বাস করিত। বালক বালিকা বা অজ্ঞ স্ত্রীলোকদিগের উপরেই এই সকল উপদেবতার বিশেষ দৌরাত্ম্য ছিল। যখন কোনও ব্যক্তি এইরূপে প্রেতাবিষ্ট বা উপদেবতাগ্রস্ত হইত, তখন লোকে বিশ্বাস করিত যে কিছু না লইয়া যাইবে না। সুতরাং ওঝাগণ আসিয়া উপদেবতাদিগের অনেক সাধ্য সাধনা করিত। বলিত—"ঠাকুর একে ছাড়িয়া দেও, তুমি কি চাও বল?" অনেক সাধ্য সাধনার পরে একটা কিছু বলির বন্দোবস্তে রক্ষা করিয়া

তাহারা ঐ সকল ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিত। এইরূপে যেখানেই ধর্ম্মভাবের মধ্যে ভয়ের ভাব প্রধান এবং ইষ্টদেবতার প্রসাদনার্থই পূজা, সেখানেই বলিদানের ব্যবস্থা। ভয়ের ধর্ম্মের ভাবই এই "কিছু দিতে হইবে।" প্রেমের ধর্ম্মের ভাব অন্য প্রকার। প্রেমের ধর্ম্মে বলে—"কিছু হইতে হইবে।"—ভয় বলে "কি দিলে এই দুরন্ত শক্তির হাত হইতে বাঁচি?" প্রেম বলে—"আমি কিরূপ হইলে প্রেমাস্পদের সহিত যোগ হইতে পারে?" জগতের প্রধান প্রধান জাতিদিগের ইতিবৃত্তে দেখিতে পাই, ভয়ের ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রেমের ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু এই বিপ্লব সংঘটিত হইতে বহুকাল লাগিয়াছে। জগতের যে দুর্জ্জয় শক্তিকে দেখিয়া আদিম অবস্থাতে মানুষ ভয়ভীত হইয়াছে, তাঁহাকে "পিতা নোহসি!" "তুমি আমাদের পিতা", এই কথা বলিয়া আলিঙ্গন করিতে অনেক যুগ লাগিয়াছে। তৎপূর্ব্বে জগৎ-কার্য্যের অনেক পর্য্যবেক্ষণের, সেই সকল কার্য্যের ফলাফলের অনেক বিচারের ও বিজ্ঞানের অনেক উন্নতির প্রয়োজন হইয়াছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ যখন বুঝিয়াছে, যে প্রকৃতির আপাত-ভয়ঙ্কর মূর্ত্তির অন্তরালে কল্যাণ-বিধান লুক্কায়িত আছে, তখন আশ্বস্ত হইয়া বলিয়াছে,—"পিতা নোহসি!"—"তুমি আমাদের পিতা।"

ভয়ের ধর্ম্ম এইরূপে প্রেমের ধর্ম্মে পরিণত হইবার পুর্ব্বে, সর্ব্ব জাতি মধ্যেই যুগে যুগে এরূপ সকল প্রেমিক পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা ভয়ের ও বলিদানের ধর্ম্মের

অসারতা প্রতীতি করিয়া প্রেমের ধর্ম্মের জন্য উন্মুখ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাই এই সকল মহাজনের বিশেষত্ব। যখন দেশের সাধারণ লোক অসার আড়ম্বরপূর্ণ, বলিদানপূর্ণ ভয়ের ধর্ম্ম লইয়া সন্তুষ্ট ছিল, তখন তাঁহারা তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিয়াছেন—"এ সকল অসার অনুষ্ঠানে কি ফল ?" বৃদ্ধ য়িহুদী রাজা দায়ুদের সংগীতাবলী হইতে যে অংশটুকু উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা এইরূপ দীর্ঘনিঃশ্বাস মাত্র। এই দীর্ঘনিঃশ্বাস যুগে যুগে অনেক মহাজনের হৃদয় হইতে উঠিয়াছে। বৃহদারুণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য-গার্গী-সংবাদ নামে একটী পরিচ্ছেদ আছে, তন্মধ্যে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বলিতেছেন ঃ

"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহুনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি।"

অর্থ—হে গার্গি ! যদি কোনও ব্যক্তি এই অবিনাশী পরম পুরুষকে না জানিয়া বহু সহস্র বৎসর হোম, যাগ, তপস্যাদি করে, সে সমুদায়ের কোনও ফল হয় না, সে সমুদায় বিনষ্ট হয়।"

ইহাও ঐ দীর্ঘনিঃশ্বাস ; হায় ! এ অসার যাগ-যজ্ঞ তপস্যাতে প্রয়োজন কি ! তাঁহাকে জানা এবং প্রীতি করাই ত সার কথা ! ভয়ের ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্মে পরিণত হইবার পূর্ব্বে এইরূপ দীর্ঘনিঃশ্বাস বার বার মানব-হৃদয় হইতে উঠিয়াছে। সাধুদিগের এই হায় হায় রবের প্রতিধ্বনি সর্ব্বদেশের শাস্ত্রে পড়িয়া রহিয়াছে। নানক ক্ষোভ করিয়া বলিয়াছিলেন—"হে

স্বামিন্! জপ, তপ, নিয়ম, শৌচ, সংযম সকলি ত করিলাম, প্রাণের মলিনতা গেলনা কেন?" এই ক্ষোভের বাণী কত সাধুর মুখে শুনা গিয়াছে! এই আন্তরিক যাতনা হইতেই প্রেমের ধর্ম্মের জন্ম হইয়াছে। প্রেমের ধর্ম্মে প্রবেশের দ্বারেই ভগ্ন-হৃদয়তা। য়িহুদীরাজ দায়ুদ ঠিক বলিয়াছেন। বস্তুটা কি তাহা একবার প্রণিধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মজগতের ইতিবৃত্তে দুই জাতীয় ভগ্ন-হৃদয়তা দৃষ্ট হইয়াছে; এক ভগ্ন হৃদয়তা নিজ পাপের স্মৃতিজনিত; দ্বিতীয় ভগ্নহৃদয়তা অপরের পাপের স্মৃতি ও প্রচলিত ধর্ম্মের অসারতা-জ্ঞান-জনিত। নিজ পাপের স্মৃতি-জনিত যে ভগ্ন-হৃদয়তা তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে, এবং সর্ব্বসাধারনেই তাহা বুঝিতে পারে। সমুদায় প্রেমের ধর্ম্মে ইহার দৃন্টান্ত অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। চৈতন্য-ধর্ম্মে জগাই মাধাই, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে সেণ্ট-পল ইসলাম ধর্ম্মে ওমর ইহার উজ্জ্বল দৃন্টান্ত। যে জগাই মাধাই নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে শ্মশানের ঘাটে বাস করিয়া দস্যুতা করিত, আর যে জগাই মাধাই গৌরচন্দ্রের প্রেমে বন্দী হইয়া হরিনাম লইয়া "দীনের দীন তৃণেরও হীন" হইয়াছিলেন, এই উভয়ে কত প্রভেদ! যে সল নামক যুবা ষ্টিফেনের হত্যাকালে ঘাতকদিগের পরিচ্ছদাদি লইয়া বসিয়াছিল, এবং যে যুবক জেরুসালেম নগরীর পুরোহিতগণের নিকট ভার প্রাপ্ত হইয়া খ্রীষ্টীয়মণ্ডলীর উৎসাদনার্থ ডামস্কস্ নগরাভিমুখে যাইতেছিল, সেই যুবকও যে ভগ্ন-হৃদয় পুরুষ যীশুর প্রেমের অনুরোধে বিনীত অন্তরে সর্ব্ববিধ অত্যাচার, নির্য্যাতন ও উপদ্রব সহ্য করিতেছেন, এ

উভয়ে কত প্রভেদ! যে সিংহ সমান বিক্রমশালী ওমার সুশাণিত তরবার করে ধারণ করিয়া স্বীয় ভগিনী ও ভগিনী পতির শিরঃশ্ছেদনের সংকল্প করিয়া গৃহ হইতে বিনির্গত হইলেন এবং যিনি অবশেষে বিনয়ে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া তাঁহাদেরই পদে লুণ্ঠিত হইলেন, এই উভয়ে কত প্রভেদ! হায়! হায়! প্রেমের ধর্ম্ম জন্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে অনুতাপে ভাঙ্গিয়া তাঁহাদিগকে কি করিয়া দিল!

প্রেমের ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই অনুতাপকে দেখিতে পাওয়া যায় কেন? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে প্রেমের ধর্ম্ম বলে—"কিছু হইতে হইবে।" প্রেমের স্বভাব এই, ইহাকে যদি হৃদয়কে অধিকার করিতে দেও, তবে ইহা সর্ব্বস্ব হরণ না করিয়া ছাড়ে না। সম্পূর্ণরূপে বাসনার অর্থাৎ স্বার্থপ্রবৃত্তির বিলয় না করাইয়া নিবৃত্ত হয় না। সুতরাং হৃদয়ে যতক্ষণ প্রেমবিরোধী কিছু থাকে, ততক্ষণ প্রেমিক-হৃদয় যাতনা পাইতে থাকে;— "এটুকু কেন এখনও গেল না, প্রেমাস্পদের সহিত যে পূর্ণ যোগ হইতেছে না। এ কাল-শত্রু পাপ প্রবৃত্তি কোথা হইতে আমার হৃদয়ে আসিল? এ স্বার্থপরতা কেন হৃদয়ে রহিল।" এই ভাব হইতেই অনুতাপ-যাতনার উদয় হয়। ভয়ের অনুতাপ হৃদয়ের ও ধর্ম্মজীবনের বাহিরে পড়িয়া থাকে, প্রেমের ধর্ম্মের এই অনুতাপ হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করে। সুতরাং যাঁহারা মনে করেন, প্রেমের ধর্ম্ম অপেক্ষা ভয়ের ধর্ম্ম মানব চরিত্রে অনুতাপের উদয় করিবার পক্ষে অধিক অনুকূল, তাঁহাদের মহা ভ্রান্তি। ভয়ের ধর্ম্মের পক্ষে অনুতাপের উদয়

করিবার নিমিত্ত স্বর্গ নরককে অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিতে হয়, প্রেমের ধর্ম্মে স্বর্গ নরকের চিন্তাও মনে আসে না; অথচ তীব্র অনুতাপের উদয় হয়। আমি কেন কাঁদিতেছি; এজন্য নহে যে পাছে নরকে যাই, কিন্তু এই জন্যই যে এই পাপের নিমিত্ত আমার প্রেমাস্পদের সহিত যোগ হইতেছে না।" এই প্রেমিকের ভাষা। এই জন্য এ কথা যথার্থ যে, অনেক সাধককে অনুতাপ-রূপ দ্বার দিয়া প্রেমের ধর্ম্মে প্রবেশ করিতে হয়। অনুতাপ দীনতাকে আনিয়া দেয়; দীনতা ভক্তিকে আনয়ন করে।

এই প্রেমের ধর্ম্মের দ্বারে আর এক প্রকার ভগ্ন-হৃদয়তা দেখিতে পাওয়া যায়। অনুতাপের জন্ম নিজকৃত পাপের স্মৃতি হইতে। সে ভগ্ন-হৃদয়তার জন্ম অপরের কৃত পাপের স্মৃতি হইতে। আপাততঃ এ কথা অনেকের পক্ষে অতি বিচিত্র বোধ হইতে পারে। অপরের পাপ স্মরণ করিয়া মানুষের কি এরূপ দুঃখ হইতে পারে যে তাহাতে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়? ইহা ত সম্ভব বোধ হয় না। কিন্তু প্রেমিক সাধুগণের জীবনে ইহা বার বার দেখা গিয়াছে। তাঁহারা মানব-সমাজকে এত প্রীতি করিতেন যে মানব-সমাজের এক একটী পাপ এক একটী বিষাক্ত বাণের ন্যায় তাঁহাদের হৃদয়ে বিদ্ধ হইত; এবং মানব-সমাজের দুঃখ দুর্গতির চিন্তা তাঁহাদিগকে দিনরাত্রি শান্তিহীন করিয়া রাখিত। আমাদের হৃদয়ের যেরূপ প্রেমহীন অবস্থা তাহাতে এই বর্ণনাকে আমরা কবিত্বপূর্ণ ও অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করিতে পারি। কিন্তু ইহাতে একবিন্দুও কবিত্ব বা অতিরঞ্জিত বর্ণনা নাই। প্রত্যেক মহাজনের জীবনেই আমরা দেখিতে

পাই যে সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বে তাঁহারা সুগভীর মনোগ্লানিতে কাল কাটাইতেন। মহাত্মা শাক্যসিংহের বিষয় এরূপ উক্ত হইয়াছে, যে তিনি এরূপ ঘন বিষাদের মধ্যে পতিত হইয়াছিলেন যে তাঁহার পিতা সে জন্য নিতান্ত চিন্তিত হইয়া তাঁহার চিত্ত বিনোদনার্থ নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাহার চিত্তের বিষণ্নতা বা প্রতিজ্ঞার একাগ্রতা বিদূরিত করিতে পারে নাই। প্রশ্ন করি, চিত্তের এই বিষণ্নতার কারণ কি? তিনি কি একজন পাপিশ্রেষ্ঠ ছিলেন যে নিরন্তর নিজ পাপ স্মরণ করিয়া খুব্ধ থাকিতেন? তাহা নহে; সাধারণ জনগণের দুর্দ্দশা দেখিয়াই তিনি এই গভীর বিষাদে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। যীশুর ও জীবনে এই দেখি। তিনি নিরন্তর এমনি বিষণ্ন থাকিতেন যে, কেহ কখনও তাঁহাকে হাসিতে দেখে নাই। এই কারণে তাঁহাকে (man of sorrows) চির বিষণ্ন মানুষ বলা হইয়াছে। যীশু কি এত বড় দুষ্ক্রিয়ান্বিত পাপী ছিলেন, যে তাঁহার চিত্তে দিন রাত্রি অশান্তি বাস করিত? কখনই নহে। তিনি মানবগণের বিশেষতঃ তাঁহার স্বদেশীয়-দিগের দুর্গতি দেখিয়া সর্ব্বদা শোক করিতেন। মহম্মদের বিষয়ে এরূপ উক্ত হইয়াছে যে, তিনি হরা পর্ব্বতের গুহাতে বসিয়া আরবের দুর্দ্দশার বিষয়ে যখন চিন্তা করিতেন, তখন যাতনাতে অভিভূত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে অচেতন হইয়া পড়িতেন। অনেক যত্ন করিয়া চৈতন্য সম্পাদন করিতে হইত। এই যাতনা এক এক সময়ে এত তীব্র হইত যে তিনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা করিতেন। মহাজনদিগের

এই যাতনার কথা স্মরণ করিলে স্তব্ধ হইয়া থাকিতে হয়। এতটা মানব-প্রেম আমাদের হৃদয়ে ধারণ হয় না। যাহাদের জন্য ইঁহারা কাঁদিয়া দিন কাটাইয়াছেন, তাহারা নিদ্রিত থাকিয়াছে, ক্ষুদ্র সুখে ডুবিয়া থাকিয়াছে, এবং এই পরম হিতৈষী বন্ধুদিগকেই শত্রুবোধে নির্য্যাতন করিয়াছে। আর তাহাদেরই পাপতাপের বিষয় ধ্যান করিয়া ইঁহাদের চক্ষে জলধারা বহিয়াছে। এমন প্রেমের দৃষ্টান্ত কেবল মাতৃস্নেহেই দেখিতে পাই! দুর্ব্বৃত্ত সন্তান পাপ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া যথেচ্ছাচারে নিমগ্ন হয়, আর ওদিকে নেত্রজলে জননীর রাত্রি-কালের উপাধান সিক্ত হইতে থাকে। আর এমন প্রেম ঈশ্বরেই সম্ভবে। মানুষ যে এই সকল মহাজনকে ঈশ্বরাংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। ঈশ্বরীয় ভাব বহুল পরিমাণে ইহাঁদের মধ্যে না থাকিলে কি মানবের প্রতি এতটা প্রেম হয়?

যাহা হউক এই অলৌকিক প্রেম হইতেই ইহাঁদের ভগ্ন-হৃদয়তার উৎপত্তি হইয়াছিল; এবং ভগ্ন-হৃদয়তা হইতেই দীনতা ও সাধন-নিষ্ঠা জাগিয়াছিল; এবং দীনতাপূর্ণ সাধন-নিষ্ঠা হইতেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। প্রেমের ধর্ম্মের পথিক যাঁহারা হইয়াছেন, তাঁহারাও এই ভগ্ন-হৃদয়তার পথ দিয়া আসিয়াছেন।

প্রেমের ধর্ম্ম ও ক্রিয়ার ধর্ম্ম।

সংকীর্ত্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ
শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাং।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং,
যথা তমোর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ॥

ভাগবত, ১২, স্কন্ধ, ১২, অধ্যায়।

অর্থ—সূর্য্য যেমন অন্ধকারকে হরণ করিয়া থাকে, অথবা প্রচণ্ড বাত্যা যেরূপ মেঘ রাশিকে অপসারিত করে, সেইরূপ ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন যিনি শ্রবণ করেন, ভগবান তাঁহার চিত্তে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সমুদায় আসক্তিকে অপসারিত করিয়া থাকেন।

মদ্গুণ শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে
মনোগতি রবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোম্বুধৌ,
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতং॥

ভাগবত, ৩য়, স্কন্ধ, ২৯ অধ্যায়।

অর্থ—গঙ্গার স্রোত যেমন স্বভাবতঃ সাগরাভিমুখে প্রবাহিত সেইরূপ আমার গুণাবলী শ্রবণ মাত্র যাহার সমগ্র চিত্তের গতি অবিচ্ছিন্ন ভাবে আমার অভিমুখেই প্রবাহিত হয়, সেই ব্যক্তিই নির্গুণ ভক্তিযোগের অধিকারী হইয়াছে।

ভাগবত হইতে উদ্ধৃত পূর্ব্বোক্ত উভয় বচনে ধর্ম্মসাধনের

মুখ্য উদ্দেশ্য কি তাহা সংক্ষেপে নির্ণীত হইয়াছে। প্রথম বচনে উক্ত হইয়াছে যে ভগবানের গুণানুবাদ শ্রবণের ফল এই যে তিনি হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সমুদায় আসক্তি নিবারণ করেন। দ্বিতীয় বচনে উক্ত হইয়াছে, যে ভগবানের গুণানুবাদ শ্রবণ মাত্র যদি মনোগতি অবিচ্ছিন্ন ভাবে তাঁহার অভিমুখে প্রবাহিত হয়, তবেই তাহা ভক্তি শব্দ বাচ্য। এই উপদেশের ভিতরকার কথা এই,—ধর্ম্ম বাহিরে নয়, ধর্ম্ম অন্তরে। আত্মপুরই ভগবানের প্রধান লীলাক্ষেত্র। আত্মাতে প্রেম ও ভক্তির অভ্যুদয় করিয়াই তিনি মানবের উদ্ধার সাধন করিয়া থাকেন। এই মনোগতির পরিবর্ত্তনই ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ, এবং ভক্তিলাভই ধর্ম্মের পূর্ণতা। আমরা একটী বিষয়ের জন্য এতদ্দেশীয় ভক্তি পথাবলম্বিগণের নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ। তাঁহারা আমাদিগকে একটী মহাতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন। সেটী এই—আমাদের প্রবৃত্তি সকলের বিনাশ বা উচ্ছেদ আবশ্যক নহে। হৃদয় বদলাইয়া দেও, প্রেমের গতি ফিরাইয়া দাও, প্রবৃত্তি সকলেরও গতি অপনাপনি ফিরিয়া যাইবে। হস্ত এখন দুষ্কার্য্যে রত হইতেছে, সে জন্য আঙ্গুলগুলি কাটিয়া ফেলিবার আবশ্যক নাই, হৃদয় বদলাইয়া দাও, সেই হস্ত আপনাপনি সদনুষ্ঠানে রত হইবে। পদদ্বয় এখন কুস্থানে লইয়া যায়, সেজন্য তাহাদিগকে ভাঙ্গিয়া খণ্ড করিবার প্রয়োজন নাই; হৃদয় বদলাইয়া দেও, সেই পদদ্বয় তখন সাধুসঙ্গে লইয়া যাইবে।

জীবন পথের দুই দিকে দুই প্রকার প্রলোভন রহিয়াছে, ভক্তি সে উভয়কে পরিহার করিয়া থাকে। এক পার্শ্বে আসক্তি,

অপর পার্শ্বে বিরক্তি। ভক্তি সহজ ভাবেই এই উভয়কে অতিক্রম করিয়া থাকে। প্রবৃত্তিকুলের চরিতার্থতা বা প্রবৃত্তিকুলের উচ্ছেদ, ইহার কিছুই ভক্তির লক্ষ্যস্থলে থাকে না; ভক্তির লক্ষ্য কেবল ভগবানের চরণ-সেবা। ইহা করিতে গিয়া সুখ আসে ভাল, দুঃখ আসে ভাল। প্রকৃত ভক্ত যিনি, তিনি দ্বন্দ্বাতীত, অর্থাৎ তিনি সুখ বা দুঃখ, সম্পদ বা বিপদ, মিত্রতা বা শত্রুতা, এই সকল দ্বন্দ্বের অতীত; তাঁহার মন এ সকলের বাহিরে। ঈশ্বরের শ্রবণ মননে, সত্যের অনুধ্যানে ও ধর্ম্মের অনুসরণেই তাঁহার আনন্দ। তাঁহার চিত্ত তাহাতেই বাস করে ও তাহাতেই বিহার করে। সুখ ও দুঃখ উভয়ের প্রতিই তাঁহার উপেক্ষা বুদ্ধি থাকে। এতদ্দেশে দ্বন্দ্বাতীত শব্দের অর্থ অতি বিকৃতভাবে লওয়া হইয়াছে। এদেশের সন্ন্যাসী ও পরমহংসগণ তাহার এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, যে যে ব্যক্তির নিকট শীত গ্রীষ্ম, মিষ্ট তিক্ত, সুগন্ধ দুর্গন্ধ দুই সমান সেই দ্বন্দ্বাতীত। এই ভাব বিকৃত অদ্বৈতবাদ-প্রসূত। মূলগত সে ভাব এই, যে ভেদবুদ্ধি করে, সে প্রকৃত অদ্বৈতবাদী নহে; যে শীত গ্রীষ্মের বা সুগন্ধ দুর্গন্ধের প্রভেদ করে, তাহার ভেদবুদ্ধি প্রকাশ পায়, সুতরাং সে প্রকৃত অদ্বৈতবাদী নহে। এই ভ্রান্তসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এই পথাবলম্বিগণের অনেকে একটা অস্বাভাবিক অবস্থাতে উপনীত হইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। ভক্তি পথাবলম্বিগণ এরূপ কোনও অস্বাভাবিক পথের পথিক নহেন। তাঁহারাও দ্বন্দ্বাতীত হইয়া থাকেন, কিন্তু তাহা অন্য প্রকারে। ঈশ্বরের আদেশ পালনই তাঁহাদের

জীবনের পরম লক্ষ্য হয়, আর সমুদায় উপলক্ষ্যের মধ্যে পড়িয়া যায়; ইহাতেই তাঁহারা দ্বন্দ্বাতীত। প্রেমই তাঁহাদের পরিচালক, প্রেমই তাঁহাদের গতি নির্ণয় করিয়া দেয়, প্রেমই তাঁহাদিগকে সুখ দুঃখের অতীত করিয়া রাখে।

কিন্তু এই প্রেম সম্পূর্ণ অন্তরের যথার্থ, আধ্যাত্মিক বস্তু। ইহা ব্যতীত আরও কতকগুলি বাহিরের বিষয় জগতে ধর্ম্ম শব্দের বাচ্য হইয়াছে। জগতের সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই কতকগুলি বাহ্য ক্রিয়াকে ধর্ম্ম সাধনের অঙ্গ বলিয়া গণনা করিয়া থাকে। ধর্ম্মচিন্তা বা ধর্ম্মভাব মানবঅন্তরে অভ্যুদিত হইলে তাহা কতকগুলি বাহ্যক্রিয়াতে আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহা স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য। আদিম কালের মানুষ যখন সর্ব্বপ্রথম আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করিতে লাগিল, তখন মৃত দলপতিদিগের কবরে তাহাদের পরিহিত অস্ত্র শস্ত্র, বসন ভূষণ দিতে আরম্ভ করিল; মনে করিল, পরকাল যাত্রার সময়ে সেগুলির প্রয়োজন হইতে পারে। এইরূপেই ভারতীয় হিন্দুগণের পিণ্ডদান ও তর্পণের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা এক্ষণে এ সকল কথা শুনিয়া হাস্য করিতে পারি, কিন্তু ঐ সকল ক্রিয়া যে এক সময়ের লোকের আন্তরিক বিশ্বাসের চিহ্ন-স্বরূপ ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এইরূপ সর্ব্বদেশেই এবং স[illegible]াইয়াতি মধ্যেই মানব-অন্তরের ধর্ম্মভাব বাহ্যক্রিয়ার [illegible] নাই। [illegible]রণ করিয়াছে যে ক্রিয়া এক সময়ে স্বাভাবিক ধর্ম্মের যে সক[illegible]াছে, তাহাই পরবর্ত্তী বংশপরম্পরাবে সকল বিধিব্যবস্থা [illegible]রিয়াছে।

চিন্তা করিলেই অনুভব করা যাইবে যে, অন্তরের ধর্ম্ম-ভাবের পক্ষে বাহিরের ক্রিয়ার আকার ধারণ করা অতি স্বাভাবিক। জগতেব ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখনই কোনও নূতন সত্য বা নূতন ভাব মানব-হৃদয়কে অধিকার করে, তখন তাহা স্বভাবতঃ আপনাকে দুই আকারে প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রথম, তাহা কতকগুলি বাহ্যক্রিয়াতে প্রকাশিত হয়; দ্বিতীয়তঃ, সেই সকল নূতন সত্য ও নূতন ক্রিয়া লইয়া সমভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের একটী মণ্ডলী গঠিত হয়। এই সকল বাহ্যক্রিয়া ও এই সকল সমবিশ্বাসী মণ্ডলী সেই সেই সত্যের বহিরাবরণ বা কোষ-স্বরূপ হইয়া থাকে। বিধাতা এ জগতে সমুদায় জীবন্ত বীজকে এক একটী কোষের মধ্যে আবৃত রাখিয়াছেন। বৃক্ষের বীজটী কেমন কঠিন আবরণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। যতদিন তাহার অঙ্কুরের আকারে বহির্গত হইবার সময় না হয়, ততদিন সে কঠিন আবরণের মধ্যে থাকে; সেখানে বাতাতপের উপদ্রব হইতে সংরক্ষিত হইয়া আপনার শক্তিকে বিকাশ করিতে থাকে। ধর্ম্মবিধান সম্বন্ধেও সেই নিয়ম,—ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সত্য সকলকেও বিধাতা ক্রিয়ারূপ ও মণ্ডলীরূপ আবরণের মধ্যে রাখিয়া নিরাপদে বিকশিত করিয়া থাকেন। এতদ্বারা আর একটী মহোপকার সাধিত হয়। এই সকল বাহ্যক্রিয়া লোকশিক্ষা বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করে। কোনও সমাজে যে সকল সামাজিক বিধি ব্যবস্থা প্রচলিত [illegible]ত হইয়া থাকে, সে বিধি ব্যবস্থা তৎ তৎ সমাজস্থ নরনারী আদেশ পালনই [illegible]কিরূপ

সহায়তা করিয়া থাকে, তাহা আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই। ইংলণ্ডদেশে পার্লামেণ্ট মহা সভা নামে যে সভা বিদ্যমান আছে, তাহা থাকাতেই সে দেশীয় লোকদিগকে বংশ পরম্পরাক্রমে স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে যে শিক্ষা দিতেছে, তাহা সহস্র উপদেশ দ্বারাও দেওয়া সম্ভব নহে। সর্ব্বদেশেই বিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে। এই বিবাহ-প্রথা প্রচলিত থাকাতে দাম্পত্য নীতি, গার্হস্থ্যধর্ম্ম, শিশুপালন প্রভৃতি সম্বন্ধে মানুষ যে উপদেশ পায়, তাহা অপর কোনও প্রকারে পাওয়া সম্ভব নহে। এই সকল সামাজিক বিধি ব্যবস্থা মানুষের দৈনিক জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে প্রবেশ করে; এবং মানুষের চিন্তা ও সামাজিক প্রবৃত্তিকে গঠন করে। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিধি ব্যবস্থা সকলেরও কার্য্য ঐ প্রকার। ধর্ম্মের এই সকল বিধিব্যবস্থা প্রচলিত থাকাতে লোকের ধর্ম্মভাব সকল অল্পে অল্পে গঠিত হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত দর্শন করিবার জন্য আমাদিগকে বহুদূরে গমন করিতে হইবে না। অপরাপর দেশে প্রজাসাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচারার্থ কত প্রকার উপায় বিদ্যমান আছে। আচার্য্যগণ সপ্তাহে সপ্তাহে উপাসনা মন্দিরের বেদী হইতে উপদেশ দিয়া থাকেন; তদ্ভিন্ন ধর্ম্মপ্রচারকগণ নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বিবিধ প্রকারে সাধারণ জনগণের মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। এদেশে সেরূপ কোনও উপায় বিদ্যমান নাই। প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থের গৃহে বালক-বালিকাগণ ধর্ম্মের যে সকল নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যে সকল বিধিব্যবস্থা দেখিতে পায়, তদ্ভিন্ন তাহাদের

সাক্ষাৎভাবে ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিবার কোনও উপায় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অথচ প্রচলিত ধর্ম্মের ভাব সকল এদেশীয় জনগণের মনে যে প্রকার বদ্ধমূল এরূপ অন্যত্র দেখা যায় না। ইহা ধর্ম্মের নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সকলের নীরব শিক্ষার ফল মাত্র।

অতএব ধর্ম্মের নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সকলকে কখনই হেয় মনে করা যাইতে পারে না। ধর্ম্মকে সামাজিক ভাবে সাধন করিতে গেলেই ঐ সকল ক্রিয়াকে অবলম্বন করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু এ বিষয়ে একটা বিপদ আছে; তাহা সর্ব্বদাই মনে রাখা কর্ত্তব্য। মানুষ বাহিরের এই ক্রিয়া সকলকে ধর্ম্ম-সাধনের উপায়স্বরূপ মনে না করিয়া অনেক সময়ে লক্ষ্য-স্বরূপ মনে করিয়া থাকে। তখন মানুষের দৃষ্টি ভক্তিরূপ অন্তঃস্থিত সার পদার্থের প্রতি না থাকিয়া অসার বাহিরের ক্রিয়ারি প্রতি নিবদ্ধ হয়; এবং মানুষ কতকগুলি প্রাণবিহীন ক্রিয়ার আচ-রণকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। জগতের সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়কেই এই ভ্রমে পতিত হইতে দেখা গিয়াছে। এদেশে এমন শত সহস্র ব্যক্তি রহিয়াছেন, যাঁহারা বিধিপূর্ব্বক নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সকল সম্পাদন বিষয়ে অতিশয় মনোযোগী, অথচ সুবিধা পাইলে বিধবার দুই বিঘা জমি কাড়িতে বা আবশ্যক হইলে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত!! তাঁহারা নিত্য মালা জপিতেছেন, মালার কণ্টিকে কণ্টিকে অঙ্গুলি সকল ঘুরিতেছে, অথচ মন তাহার ত্রিসীমার মধ্যে থাকিতেছে না। মন হয়ত তখন সংসারের কোনও প্রকার ক্ষুদ্র চিন্তায় লিপ্ত হইয়া

রহিয়াছে। যাঁহারা প্রথমে নামসাধন বা জপমালার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাঁহারা অতি মহৎ উদ্দেশ্যেই তাহা করিয়া থাকিবেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই ছিল যে, বার বার ঈশ্বরের স্বরূপের চিন্তাতে চিত্ত সমাধান করিয়া মানুষ চিত্তশুদ্ধি লাভ করিবে ও তাহাদের হৃদয়ের ভক্তি বর্দ্ধিত হইবে। কিন্তু অভ্যাসের এমনি গুণ, সেই ঈশ্বরের স্বরূপ চিন্তারূপ বিষয়টাও একটা বাহিরের ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বাহ্যভাব এতদূর গিয়াছে যে নাম জপের জন্য একপ্রকার কল প্রস্তুত হইয়াছে। তাহারা নাম সাধনার্থ একপ্রকার চাকা নির্ম্মাণ করিয়াছে, সেই চাকা ঘুরাইলেই একটা কাঁটা নামে নামে ঘুরিয়া যায় ও চাকা একবার ঘুরিয়া আসিলে অনেক বার নাম হইয়া যায়। যাহারা নাম জপের দ্বারা পুণ্য অর্জ্জন করিতে চায়, তাহারা অর্থ দিয়া এক এক জন দরিদ্র পুরুষ বা রমণীকে নিযুক্ত করে, তাহারা ময়দা পেষার ন্যায় সমস্ত দিন চাকা ঘুরাইতে থাকে, এবং সেই নাম জপের পুণ্য অর্থদাতার হয়। অর্থদাতা হয়ত সেই সময়ে তাস খেলিয়া বা আমোদ প্রমোদ করিয়া কাটাইতেছে। ওদিকে তাহার নামে লক্ষ লক্ষ নাম জপের পুণ্য সঞ্চয় হইতেছে! ইহা অনেকের কৌতুকাবহ মনে হইতে পারে। প্রাচীন হিন্দুসমাজ মধ্যেও ইহার অনুরূপ ঘটনা প্রতিদিন ঘটিতেছে। ধর্ম্মসাধনে প্রতিনিধি-নিয়োগ প্রতিদিন চলিতেছে। একজন গৃহস্থ একজন দূরস্থ আত্মীয়ের কোনও একটী অনিষ্ট নিবারণের জন্য একজন ব্রাহ্মণকে অর্থ দিয়া কালীঘাটের কালীর মন্দিরে

স্বস্ত্যয়ন কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। স্বস্ত্যয়ন করিলেন ব্রাহ্মণ, পুণ্য হইল গৃহস্থের, অনিষ্ট নিবারিত হইল তৃতীয় ব্যক্তির, যে হয় ত সেই মুহূর্ত্তে বহু বহু যোজন দূরে রহিয়াছে।

এই অসার ক্রিয়ার ধর্ম্ম সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্মে প্রভেদ নাই। ব্রাহ্মগণ যে মনে করিবেন "আমরা আধ্যাত্মিক পূজার পক্ষপাতী আমাদের ঐ বিপদ নাই," তাহাও মনে করা কর্ত্তব্য নয়। কারণ এ বিপদ আমাদের পথেও রহিয়াছে। একজন ব্রাহ্ম মনে করিতে পারেন, আমি সপ্তাহে সপ্তাহে রীতিমত উপাসনা মন্দিরে যাই, প্রতিদিন নিয়মপূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা করিয়া থাকি, ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে সমুদায় গার্হস্থ্য ও পরিবারিক অনুষ্ঠান নির্ব্বাহ করি, অতএব আমার ধর্ম্মসাধন হইতেছে। এরূপ চিন্তাতেও মহাভ্রম থাকিতে পারে। এমন ব্যক্তি থাকিতে পারেন, যিনি এ সমুদায় নিয়ম মনোযোগপূর্ব্বক পালন করিতেছেন, অথচ তাঁহার অন্তরে প্রকৃত ভক্তি থাকা দূরে থাক্ তাঁহার মুখও সংসারের দিক হইতে ফিরে নাই। এমন মানুষ ব্রাহ্মসমাজেই রহিয়াছে, যাহাদের মনের উপর দিয়া অনেক উপাসনা ও অনেক উৎসব গড়াইয়া যাইতেছে অথচ তাহাদের মনের বিকার ঘুচিতেছে না। ধর্ম্মের বাহিরের ক্রিয়া ও বাহিরের আলোচনা দেখিয়া ভ্রান্ত হওয়া উচিত নহে। যদি ঐ সকল ক্রিয়া ও ঐ সকল আলোচনা হৃদয়কে স্পর্শ না করে তবে সে সকলে ফল কি? ঐ যে দেখিতেছ যুবক বা যুবতী এই মন্দিরের এক পার্শ্বে বসিয়া

আছে, তোমরা কি উহাকে দেখিয়া মনে মনে এই সন্তোষ প্রকাশ করিতেছ যে, ঐ ব্যক্তি যখন এত ধর্ম্মচর্চ্চা ও ধর্ম্মা-লোচনার মধ্যে রহিয়াছে, তখন উত্তরকালে ঐ ব্যক্তি একজন ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ হইবে? অপেক্ষা কর, যদি উহার হৃদয়ে ভক্তি প্রবেশ না করে, যদি অন্তরে ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্জ্বলিত না হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি সংসারে একবার প্রবেশ করিলে আর ব্রাহ্ম-সমাজের দিকে ফিরিয়া চাহিবে না; স্বার্থে, সুখপ্রিয়তাতে ও আরামে এমনি ডুবিয়া যাইবে যে, আর তোমরা উহার উদ্দেশও পাইবে না। এই ভক্তি যদি আমরা না পাই, তাহা হইলে ধর্ম্মসাধনার্থ যাহা কিছু করিতেছি, সমুদায় ভস্মে ঘৃত ঢালা হইতেছে। সকল ধনের শ্রেষ্ঠ ধন যে ভক্তিধন, ঈশ্বর আমাদিগকে তাহার অধিকারী করুন।

অনুতাপ ও প্রেমের ধর্ম্ম।

A broken and a contrite heart
O God, thou wilt not despise.

—*Ps.—41, Vers 17.*

অর্থ—ভগ্ন ও অনুতপ্ত হৃদয়কে হে ঈশ্বর, তুমি অবহেলা করিবে না।

প্রেমের ধর্ম্মের ভিতরকার কথা হৃদয়-পরিবর্ত্তন। প্রেমের ধর্ম্মের সাধকগণের উক্তি সকল নিগূঢ়ভাবে সমালোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে এই হৃদয়-পরিবর্ত্তনের দিকেই তাঁহাদের প্রধান দৃষ্টি। জগতের চির-প্রচলিত ধর্ম্ম সকলে তাঁহাদের চিত্ত সন্তুষ্ট হয় নাই। সে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান তাঁহাদের অন্তরে সান্ত্বনা দিতে পারে নাই। অভ্যাসগত ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল কোনও কোনও দেশে বংশ পরম্পরানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছে এবং সেই সকল অনুষ্ঠানের মাত্রা যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, তখন এক একজন মহাপুরুষ তৎতৎ দেশে অভ্যুদিত হইয়া তৎসমুদয়ের প্রতিকূলে আপনাদের মত সকল প্রচার করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা মহাবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে। য়িহুদী দেশের যীশু, আরবের মহম্মদ, পঞ্জাবের নানক এবং বঙ্গদেশের চৈতন্য, এই সকল মহাজনের মধ্যেই এই ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁদের উক্তি সকল যখন তুলনা করি তখন দেখিতে পাই যে সকলেরই উদ্দেশ্য এক, ভাব এক। প্রচলিত ধর্ম্ম

সকলের দুর্গতি দেখিয়া তাঁহাদের মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল এবং প্রত্যেকেই বলিয়াছিলেন,—"বাহিরের ক্রিয়াকলাপে, যাগযজ্ঞে ধর্ম্ম পাওয়া যায় না।" দেশ মধ্যে প্রচলিত ধর্ম্মের অবস্থা দেখিয়া জন্ বলিলেন,—"হে নির্ব্বোধ ও পাপাচারী লোক সকল! তোমরা বাহিরের ক্রিয়াকলাপ সকল বর্জ্জন কর; ও সকলে সন্তুষ্ট হইও না; কিসে হৃদয়-পরিবর্ত্তন হয় তাহার চেষ্টা কর; তোমরা অনুতাপ কর, কারণ স্বর্গরাজ্য নিকটে।"

স্বদেশীয় লোক সকলকে দেখাইয়া যীশু আপনার শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়াছেন,—"তোমরা ঐ সকল কপটী লোকদিগের ন্যায় হইও না। তোমরা দ্বিজাত্মা হইয়া শিশুদিগের ন্যায় হও।"

তান্ত্রিক অনুষ্ঠান সকল দর্শন করিয়া চৈতন্য বলিলেন "ঐ সকল বাহিরের ব্যাপারে কিছুই হইবে না। ভক্তি বিনা মুক্তি নাই; হরিনাম কর, হরিনাম কর।" এই হরিনামকে তিনি হৃদয়-পরিবর্ত্তনের একটী উপায় স্বরূপ অবলম্বন করিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সকল প্রেমের ধর্ম্ম সাধকের চিন্তা ও ভাব একই অভিমুখে; সকলেরই উদ্দেশ্য হৃদয়-পরিবর্ত্তন।

অনুতাপই হৃদয়-পরিবর্ত্তনের প্রধান উপায় স্বরূপ। এই দ্বার দিয়া ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। যদি তুমি হৃদয়-পরিবর্ত্তন করিতে চাও, যদি তুমি ভক্তি চাও, তবে সরল অন্তরে অনুতাপ কর; স্বীয় অপরাধের জন্য ঈশ্বর-চরণে পড়িয়া ক্রন্দন কর। অনুতাপ রূপ দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিলে এ

রাজ্যে প্রবেশের উপায় নাই। অনুতাপই যে পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভের একমাত্র উপায়, তাহা এতদ্দেশীয় শাস্ত্রকারগণও অনুভব করিয়াছিলেন। মনু বলিয়াছেন ঃ—

কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ॥

মনু, ১১ অধ্যায়।

অর্থ—পাপ করিয়া তন্নিমিত্ত অনুতাপ করিলে সেই পাপ হইতে মানুষ মুক্ত হয়। এমন কার্য্য আর করিব না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া পাপ হইতে নিবৃত্ত হইলে তাহার মন পুনরায় পবিত্র হয়।”

যে অনুতাপের এত গুণ, যে অনুতাপ মুক্তির দ্বার স্বরূপ, সে অনুতাপ কি প্রকার? আমরা সচরাচর অনুতাপ শব্দে যে সকল মানসিক অবস্থাকে বুঝি সে সমুদায়ই কি প্রকৃত অনুতাপ? সে সকলের দ্বারা কি হৃদয় পরিবর্ত্তিত হয়? সে সমুদয় কি মানবাত্মাকে ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত করে? এই সকল প্রশ্ন হৃদয়ে লইয়া যখন অনুতাপের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন দেখিতে পাই যে, যে সকল অবস্থা সচরাচর অনুতাপ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহার সকল গুলি প্রকৃত অনুতাপ নহে। প্রকৃত অনুতাপ কি? ও তাহার লক্ষণ কি? তাহা নির্দ্দেশ করিবার পূর্ব্বে কৃত্রিম অনুতাপ কিরূপ তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

প্রথম, এক প্রকার অনুতাপ আছে যাহা প্রশংসাপ্রিয়তারই রূপান্তর মাত্র। সে অনুতাপ নিন্দা প্রশংসা গণনা করে। এমন

কত লোক আছে যাহারা হয় ত গোপনে গোপনে কোনও প্রাকর পাপে লিপ্ত আছে। যত দিন তাহাদের পাপ লোকের অপরিজ্ঞাত থাকে, ততদিন তাহাদের অনুতাপের চিহ্ন দৃষ্ট হয় না; তাহারা প্রসন্নচিত্তে আহার বিহার করিয়া বিচরণ করে। যেই গোপনের পাপটী দশজনের বিদিত হইয়া পড়িল অমনি অনুতাপের ধূম দেখে কে? অমনি আহার বিহার বন্ধ! অমনি অনুতাপাশ্রুতে দিনরাত্রি ভাসমান! তখন তাহাকে দেখিলে বোধ হয় এ ব্যক্তি বাস্তবিক দীনাত্মা ও ভগ্ন-হৃদয়; ইহার হৃদয় নিশ্চয় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু এরূপ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য নহে। ইহা তাহার হৃদয়কে পরিবর্ত্তিত করিবার একটা সুযোগ বটে। কারণ মানবের গর্ব্ব যখন ধূলিসাৎ হয়, তখনি তাহার অন্তরে আত্মগ্লানি জাগাইবার সময়। কিন্তু ইহা অনুতাপও নহে এবং হৃদয়-পরিবর্ত্তনও নহে। ইহা আহত প্রশংসাপ্রিয়তার আর্ত্তনাদ! লোকের নিকটে মান গেল এই চিন্তার যাতনা। লোকে একবার বলুক—"আহা! এমন কি গুরুতর অপরাধ হইয়াছে, এমন ত অনেকেরই হইয়া থাকে," অমনি দেখিবে যে তাহার অনুতাপের তীব্রতা আর থাকিবে না।

দ্বিতীয়, আর এক প্রকার অনুতাপ আছে যাহা আত্ম-স্তরিতার রূপান্তর মাত্র। তাহা অহঙ্কার-সম্ভূত। সে অনুতাপের মধ্যে এই ভাবটা লুকাইয়া থাকে—"আমা হেন লোকের দ্বারা এরূপ কাজটা হইল!" মনটা আত্মম্ভরিতাতে পূর্ণ ছিল, আপনাকে জ্ঞানী গুণী ও বলবান বলিয়া বিশ্বাস ছিল, হঠাৎ প্রলোভনের কঠোর আঘাতে সে দর্পটা ভূমিসাৎ

হইয়া গেল ; মন লজ্জায় ও আত্মনিন্দায় পূর্ণ হইল। অতএব এ অনুতাপ অহঙ্কারের রূপান্তর মাত্র। চিন্তা করিলেই দৃষ্ট হইবে যে এ অনুতাপও অনেক সময়ে বন্ধুর কার্য্য করে। দর্পহারী ভগবান অনেক সময়ে এইরূপে দর্পচূর্ণ করিয়া হৃদয়কে পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ অনুতাপও সকল সময়ে হৃদয়কে পরিবর্ত্তিত করে না। প্রথম আঘাতের তীব্রতা একটু হ্রাস হইলেই এই সকল ব্যক্তি আবার নিজ মূর্ত্তি ধারণ করে ; আত্মম্ভরিতা আবার পূর্ব্ববৎ হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া ফেলে ; রাজসিক প্রকৃতি আবার নিজশক্তি বিস্তার করিতে থাকে। সুতরাং সে হৃদয়ে ভক্তি পদার্পণ করিতে পারে না।

তৃতীয়,—আর এক প্রকার অনুতাপ আছে, তাহা স্বার্থ-বুদ্ধি-প্রসূত। পার্থিব ক্ষতিলাভের উপরে তাহা দণ্ডায়মান। তাহার মূলগত ভাব এই—"হায়! হায়! এমন কাজটা কেন করিলাম, আমার কত ক্ষতি হইয়া গেল। বেশ কাজটা ছিল তাহা গেল, বা বন্ধুবান্ধব সরিয়া দাঁড়াইল," এইরূপ ক্ষোভেও মানুষ অনেক সময়ে নিজের ওষ্ঠাধর দংশন করে।

এ সকলই কৃত্রিম অনুতাপ। ইহাতে অবশ্যম্ভাবীরূপে হৃদয়ে পরিবর্ত্তন আনয়ন করে না। প্রকৃত অনুতাপ ব্যতীত তাহা কখনই ঘটে না। প্রকৃত অনুতাপ আর এক প্রকার। তাহা বিশ্বাসিগণের হৃদয়ে ঈশ্বরের বিচ্ছেদ-যাতনা-সম্ভূত। তাহার মূলে এই ভাব,—"আমি একাজ কেন করিলাম যাহাতে সে সৌভাগ্য হারাইলাম! আমার কি যেন ছিল কি যেন চলিয়া গেল! আমি সেই হস্তপদবিশিষ্ট মানুষ আছি, কিন্তু প্রাণ

হইতে কে কি তুলিয়া লইল যে জন্য দরিদ্রের দরিদ্র হইয়া গেলাম। কি যেন ঘোর যবনিকা চক্ষের উপরে পড়িল যে জন্য পূর্ব্বের সে আলোক আর দেখিতে পাইতেছি না।" এই অবস্থাতে আত্মা বলিতে থাকে, "রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।" "হে রুদ্র! হে ভীতিপ্রদ, তোমার প্রসন্ন মুখের দ্বারা আমাকে রক্ষা কর।" এই অনুতাপে লোকের স্তুতি বা নিন্দার চিন্তা মনে আসে না; অথবা নিজের ক্ষতি বা লাভের গণনা হৃদয়ে উদিত হয় না। ইহাই হৃদয়কে পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যে বর্ষার জলরাশি ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া যখন তদন্তরস্থ চূর্ণ সদৃশ পদার্থপুঞ্জে প্রবিষ্ট হয়, তখন তন্মধ্যে এক প্রকার উত্তাপ জন্মে। সেই উত্তাপেরই প্রভাবে ধরাপৃষ্ঠ ঘন ঘন কম্পিত হয়; এবং কখনও কখনও ধরাপৃষ্ঠ বিদারণ করিয়া জ্বালারাশি ও দ্রবধাতু-পুঞ্জ বহির্গত হইতে থাকে; ইহাকেই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বলে। যেমন বর্ষার বারি ও ভূগর্ভস্থ ধাতুপুঞ্জের সম্মিলনে ঘোর বিপ্লব ঘটে, তেমনি অকৃত্রিম অনুশোচনাতেও মানব-হৃদয়ে বিপ্লব ঘটাইয়া থাকে। তাহার প্রভাবে ভূকম্পের ন্যায় ঘন ঘন হৃৎকম্প হইতে থাকে, এবং দেখিতে দেখিতে হৃদয় রূপান্তরিত হইয়া যায়, ইহাকেই বলে প্রকৃত অনুতাপ।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে প্রকৃত অনুতাপের লক্ষণ কি? এ প্রশ্নের প্রথম উত্তর ত অগ্রেই দেওয়া হইল। যাহাতে হৃদয়ে ও জীবনে পরিবর্ত্তন উপস্থিত না করে তাহা প্রকৃত অনুতাপ নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে কর তণ্ডুল যদি অন্নরূপে পরিবর্ত্তিত

না হয় তাহা হইলে যেমন স্বীকার্য্য নয় যে, সে অগ্নির উপরে অনেকক্ষণ ছিল, তেমনি মানুষের জীবনে, তাহার চিন্তা বাক্য ও আচরণে,যদি কোনও পরিবর্ত্তন লক্ষিত না হয়, তবে স্বীকার্য্য নয় যে, সে অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়াছিল। প্রকৃত অনুতাপ মানব-হৃদয়ে যে পরিবর্ত্তন আনয়ন করে তাহার প্রকৃতির বিষয়ে চিন্তা করিলে বিস্ময়াবিস্ট হইতে হয়। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে অনুতাপের পূর্ব্বকার লোক ও অনুতাপের পরের সেই লোক দুই যেন স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়। যদিও অনেক স্থলে প্রকৃতি-নিহিত প্রাচীন দুর্ব্বলতা পুনরায় মাথা তুলিয়া থাকে, এবং হয়ত একেবারে অদর্শন হয়না, কিন্তু রুচি, প্রবৃত্তি, আকাঙ্ক্ষা যে প্রাচীন পথকে পরিত্যাগ করে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ধর্ম্মজগতের ইতিবৃত্তে আমরা যে সকল অনুতপ্ত সাধকের জীবন চরিত পাঠ করি, তাঁহাদের সকলেরই জীবনে এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। মনুর বর্ণনানুসারে "আর এরূপ করিব না" বলিয়া তাঁহারা সকলেই পবিত্রতা লাভ করিয়াছেন। তবে হৃদয়-পরিবর্ত্তন ও জীবন-পরিবর্ত্তন প্রকৃত অনুতাপের প্রথম লক্ষণ।

দ্বিতীয় লক্ষণ বিনয়। প্রকৃত অনুতাপের সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ে দীনতা আসে। তখন আর আত্ম-পক্ষ-সমর্থনের প্রবৃত্তি থাকে না। লোক-নিন্দাতে বিরক্তি বা বিদ্বেষের উদয় করে না। লোকনিন্দা শুনিলে প্রকৃত অনুতপ্ত ব্যক্তি বলিয়া থাকেন "তা ত ঠিক, ইঁহারা যা বলিতেছেন তাহা ত সত্য কথা; আমি ত এই নিন্দার প্রকৃত পাত্র।" তখন আর কাহারও প্রতি

শত্রুতাবুদ্ধি জন্মে না। এ সম্বন্ধে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। চীন দেশে এই রীতি আছে যে, কোনও নূতন সম্রাট যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন কারাবাসিদিগকে কারামুক্ত করা হয়। একবার একজন সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বলিলেন যে তিনি নিজে কারাগারে গিয়া প্রকৃত অনুতপ্ত ব্যক্তিদিগকে কারামুক্ত করিয়া দিবেন। তদনুসারে কারাগারে গিয়া বন্দিদিগকে পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রত্যেককেই গিয়া জিজ্ঞাসা করেন "তুমি কেন এখানে আসিয়াছ, কতদিন আসিয়াছ" ইত্যাদি। অধিকাংশ বন্দী দুঃখ করিয়া বলিল যে তাহারা নিরপরাধী, কেবল দুষ্ট লোকে চক্রান্ত করিয়া তাহাদিগকে বিপদে ফেলিয়াছে।" এইরূপে সম্রাট এক একজনকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে অবশেষে এক ব্যক্তির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল যে, সে বাস্তবিক অপরাধী ও অপরাধের শাস্তিভোগ করিবার জন্যই সে কারাগারে আসিয়াছে। সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার শাস্তি কি গুরুতর হইয়াছে? তাহাতে সে ব্যক্তি উত্তর করিল, না, আমার অপরাধ যেরূপ গুরুতর, শাস্তি তাহার উপযুক্ত হয় নাই। আমার আরও সাজা পাওয়া উচিত ছিল।" তখন সম্রাট বলিলেন—"দেখ, উহাদের অনেকে বলিয়াছে যে উহারা নিরপরাধী, তুমি নিজের মুখে স্বীকার করিতেছ যে তুমি অপরাধী। অতএব নির্দ্দোষ ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন দোষীর থাকা কর্ত্তব্য নহে, অতএব তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও।" এই বলিয়া

তাহাকে কারামুক্ত করিয়া দিলেন। চীনের সম্রাট যে প্রণালীতে প্রকৃত অনুতাপের বিচার করিয়াছিলেন, বাস্তবিক তাহা প্রকৃত অনুতাপ নির্ণয় করিবার একটী প্রধান উপায়। যেখানে দীনতা নাই, সেখানে অনুতাপ নাই। যদি দেখ এক ব্যক্তি দুই দিন পূর্ব্বে একটী দুষ্কার্য্য করিয়াছে ও তজ্জন্য মনস্তাপ প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু দুই দিন না যাইতে যাইতে তাহার আচরণে আর দীনতার গন্ধও পাওয়া যায় না,আবার সে দশজনের মধ্যে মাথা তুলিবার জন্য ব্যগ্র হইতেছে, সকল কাজে হাত দিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রকৃত অনুতাপ তাহার হৃদয়কে অধিকার করে নাই। যে প্রকৃত অনুতপ্ত সে সকলের পশ্চাতে লুকাইয়া থাকিতে চায়। সেখান হইতে তাহাকে ধরিয়া টানিয়া সম্মুখে আনিতে হয়।

প্রকৃত অনুতাপের তৃতীয় লক্ষণ আশা। আপনার দুর্ব্বলতা স্মরণ করিয়া দীনতা, ঈশ্বরের করুণা স্মরণ করিয়া আশা। অনুতাপ যখন মানুষকে ভবিষ্যতের উন্নতি সাধনে নিযুক্ত করে, তখনি তাহা প্রকৃত পথে চালিত। যে অনুতাপে কেবল আত্মার শক্তি ক্ষয় হয় কিন্তু ভবিষ্যতের উন্নতির কোনও উপায় হয় না, তাহা বিকৃত। যেমন কোনও ব্যক্তি যদি মৃত আত্মীয়ের শোকে কাতর হইয়া প্রাতে ও সন্ধ্যাতে কেবল শ্মশানে গিয়া পড়িয়া পড়িয়া কাঁদে, এদিকে সংসারের কর্ত্তব্য সকল পড়িয়া থাকে, তবে যেমন আমরা তাহাকে বলি, এ শোক তোমার ব্যধি বিশেষ, যে গিয়াছে তাহার জন্য এতটা সময় না দিয়া যাহারা এখনো আছে তাহাদের জন্য কিছু সময় দেও; তেমনি যে ব্যক্তি

অতীতের দুষ্কার্য্য স্মরণ করিয়া কেবল হা হতোস্মি করিয়া দিন কাটায়, কিন্তু বর্ত্তমানের উন্নতির কোনও উপায় অবলম্বন করে না তাহাকেও বলিতে হয়, এ অনুতাপ তোমার ব্যধি বিশেষ, অতীতের চিন্তাতে এতটা সময় না দিয়া বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের উন্নতি বিধানে কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইলে ভাল হয়। এই জন্যই বলা হইয়াছে, যে প্রকৃত অনুতাপের সঙ্গে সঙ্গেই আশা থাকে। প্রকৃত অনুতপ্ত ব্যক্তি প্রলোভনের গুরুতর আঘাতে পতিত হইলেও ঈশ্বরের করুণাকে আশ্রয় করিয়া পুনরায় দণ্ডায়মান হইবার প্রয়াস পান।

অনুতাপের লক্ষণ জানিলে কি হইবে, আমাদের অন্তরে যে অনুতাপের উদয় হয়না ইহাই ত ব্যাধির প্রধান চিহ্ন। আমাদের জীবনে কি অনুতাপের যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান নাই? কেহ কি এরূপ মনে করেন, "আমরা ত কোনও গুরুতর পাপাচরণ করিতেছি না, তবে এত অনুতাপ আবার কি করিব। ইহাতে এই প্রমাণ হয় যে, আমাদের জীবনের উচ্চ আদর্শ আমরা স্মরণ করি না। তাহা যদি আমরা সর্ব্বদা স্মরণ রাখি, তাহা হইলে আমাদিগকে সর্ব্বদাই 'হায় হায়' করিতে হয়, কারণ আমাদের জীবনের অপূর্ণতা সর্ব্বদাই রহিয়াছে। নিরন্তর আমরা জীবনের উন্নত ভুমি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছি; নিরন্তর স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য সাধনে অপারগ হইতেছি; এবং প্রবল প্রবৃত্তিকুলকে সম্পূর্ণরূপে সংযত রাখিতে অসমর্থ হইতেছি। আমাদের যদি আত্ম-পরীক্ষার অভ্যাস থাকে, এবং আপনাদের এই সকল ত্রুটী ও দুর্ব্বলতা সর্ব্বদা স্মরণ করি, তাহা হইলে আমাদিগকে সর্ব্বদাই দীনভাবাপন্ন থাকিতে হয়।

বদ্ধ ধর্ম্ম ও মুক্ত ধর্ম্ম।

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।

উপনিষদ্।

অর্থ—"সেই পরাৎপর পরমপুরুষকে জানিলে, কর্ম্ম-বন্ধন ক্ষয় হয়।"

"ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" এরূপ সাধকের কর্ম্ম সকল ক্ষয় হয়, এই কথার তাৎপর্য্য এ দেশের সাধকগণ আর এক ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার এক অর্থ জ্ঞানীদিগের পক্ষে কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা নাই, কারণ কর্ম্মের চরম ফল যে জ্ঞান, তাহা যখন তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন আর কর্ম্মের প্রয়োজন কি? সন্ন্যাসের পথই তাঁহাদের পক্ষে প্রকৃত পথ। ইহার আর এক প্রকার অর্থ আছে, যে ব্যক্তি জ্ঞানসিদ্ধ হইয়া মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার শুভাশুভ উভয়বিধ কর্ম্মই নিরস্ত হইয়াছে। তিনি পাপ বা পুণ্য উভয়েরই অতীত হইয়াছেন। পাপের ফলভোগ করিবার নিমিত্ত জন্ম এবং পুণ্যের ফলভোগ করিবার নিমিত্ত স্বর্গবাস, তিনি এই উভয়েরই অতীত। স্বর্গ তাঁহার নিকট তুচ্ছ, জন্ম তাঁহার আর হয় না। আমরা কিন্তু এই প্রচলিত উভয় অর্থে উক্ত বচনকে গ্রহণ করি নাই। আমরা এই অর্থে পূর্ব্বোক্ত বচনকে গ্রহণ করিয়াছি যে, সেই পরাৎপর পুরুষকে দর্শন করিলে মানুষ কর্ম্মরূপ বন্ধনে আর আবদ্ধ থাকে

না। ইহার অর্থ এ নয়, যে সেরূপ ব্যক্তি আর কর্ম্মের আচরণ করেন না, কিন্তু ইহার অর্থ এই যে তিনি কর্ম্মকেই একমাত্র ধর্ম্ম জানিয়া তাহাতে আবদ্ধ হন না। একটু নিগূঢ় ভাবে চিন্তা করিলেই ধর্ম্ম ও কর্ম্ম এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হইবে। একটী শস্য অপরটী ত্বক। ত্বকটী শস্যের রক্ষার জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও ত্বকটী শস্য নহে।

জগতের সকল বিদ্যারই দুইটী দিক আছে, একটী আধ্যাত্মিক অপরটী লৌকিক বা ব্যবহারিক। আধ্যাত্মিক দিকে বিদ্যা জ্ঞান-সমষ্টিকে বর্দ্ধিত করে, চিন্তাশক্তিকে বিকশিত করে, জগদ্দর্শনেরও বিচারের শক্তিকে বর্দ্ধিত করে, মানবচরিত্রে বিজ্ঞতা, বিমৃষ্যকারীতা, আত্ম-সংযম প্রভৃতি গুণকে বিকাশ করে। বিদ্যার কোনও লৌকিক ও ব্যবহারিক প্রয়োজন থাকুক আর না থাকুক তাহা মানবাত্মাতে পূর্ব্বোক্ত ফল সকল উৎপন্ন করিয়াই থাকে। কিন্তু বিদ্যা কেবল মানবের আত্ম-কোষে বদ্ধ থাকে না; লৌকিক জীবনেও স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। কোনও নূতন বিদ্যা অধিগত হইলেই মানব-মনে এই চিন্তার উদয় হয় ঐ বিদ্যাকে জগতের কোন্ ইষ্ট-সাধনে নিয়োগ করা যাইতে পারে? তখন ঐ বিদ্যা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ লৌকিক ইষ্ট-সাধনের দিকে চিত্তকে প্রেরণ করিতে থাকেন। দেখিতে দেখিতে জনসমাজের সুখ সৌকর্য্য বৃদ্ধির নানা প্রকার উপায় আবিষ্কৃত হইতে থাকে। এইরূপে প্রায় সর্ব্ববিধ বিদ্যাই মানবের লৌকিক সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধির জন্য নিয়োজিত হইয়াছে, অধিক কি গগন-বিহারী জ্যোতিষ্ক-গণের

গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া যে জ্যোতির্ব্বিদ্যার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাকেও মানুষ আপনার লৌকিক ইষ্টসাধনে নিযুক্ত করিয়াছে। জ্যোতির্বিদ্যার ফলস্বরূপ সমুদ্র-বক্ষে নৌচালনার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। এইরূপে পদার্থ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ প্রভূত গবেষণার দ্বারা যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহারই সাহায্যে জগতের শিল্প ও বাণিজ্যের অদ্ভুত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি বর্ত্তমান সভ্যতার উপকরণ সামগ্রী যে কিছু দেখিতে পাইতেছি, সে সমুদায় পদার্থ-বিদ্যার উন্নতির ফল মাত্র।

বিদ্যার যেমন দুইটা দিক আছে, ধর্ম্মেরও তেমনি দুই দিক আছে। আধ্যাত্মিক দিক ও লৌকিক দিক। ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক দিক আত্মা পরমাত্মাতে যোগ, অনন্যগতি ও অনন্যমতি হইয়া সেই পরাৎপর পরমপুরুষে প্রীতি স্থাপন। এইটুকু ধর্ম্মের সার ভাগ। ফলের মধ্যে যেমন বীজ, দেহের মধ্যে যেমন অস্থি, ধর্ম্মের মধ্যে তেমন এইটুকু প্রকৃত সার বস্তু। বীজ না থাকিলে যেমন ফল থাকে না, অস্থি না থাকিলে যেমন দেহ দাঁড়ায় না, তেমন এটুকু না থাকিলে প্রকৃত ধর্ম্মই দাঁড়ায় না। যে জীবনে এই সার ভাগ টুকুর পরিমাণ অল্প, কিন্তু বাহিরের ভাব বা ক্রিয়া অধিক, তাহা দুর্ব্বল ও ক্ষীণাস্থি সম্পন্ন মাংস ও মেদ-বহুল দেহের ন্যায় দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য। যাহা হউক ধর্ম্মের এই আধ্যাত্মিক দিকে আমাদের ঈশ্বরের সহিত যোগ; এখানে আমরা তাঁহারই সন্নিধানে বাস করি, তাঁহার প্রেমের অমৃত রস আস্বাদন করি। এই আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম হৃদয় মনকে উন্নত করে,

চিত্তকে আনন্দে পূর্ণ করে, ও মনকে সমুদায় ক্ষুদ্র বিষয়ের আসক্তি হইতে উদ্ধার করে।

কিন্তু এই আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম কেবল অন্তর রাজ্যেই বদ্ধ থাকে না। আত্মাতে ধর্ম্মের স্ফূর্ত্তি হইলেই, সাধকদিগের চিত্তে এই চিন্তার উদয় হয় যে, সেই অন্তরস্থিত আদর্শকে মানবের ও মানব সমাজের বাহিরের জীবনে প্রয়োগ করিলে কি ফল উৎপন্ন করিবে? তদ্দ্বারা কি মানুষকে পাপ তাপ হইতে উদ্ধার করিতে পারা যাইবে? এইরূপ চিন্তা হইতেই শাস্ত্র ও দর্শন রচনা, সাধন-প্রণালী নির্দ্দেশ ও বিবিধ সামাজিক রীতি নীতির সৃষ্টি। যদিও আমাদের দেশে এরূপ অনেক সাধক আছেন, যাঁহারা ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ভাবে আপনারাই তুষ্ট, জীবের দুঃখের প্রতি দৃষ্টি নাই, তথাপি ইহা ঈশ্বরের করুণা বলিতে হইবে যে সকল সাধক এ ভাবাপন্ন নহেন। তাঁহাদের অনেকে জীবানুকম্পা-পরবশ হইয়া আপনাদের অন্তর্নিহিত সুমিষ্ট ধর্ম্মকে জগতে বিতরণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। মহাত্মা বুদ্ধ ছয় বৎসর কাল নিরঞ্জন নদীর তীরে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, মনে করিলে জীবনের অবশিষ্টকাল কি সেই নদী তীরেই ধ্যানস্থ হইয়া যাপন করিতে পারিতেন না? কিন্তু কে তাঁহাকে সে বিশ্রাম সুখে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য করিল? তাঁহার শিষ্যগণ উত্তর করিবেন—জীবানুকম্পা। ঠিক কথা, এই সকল মহাজনের অন্তরে জীবানুকম্পা এত অধিক ছিল যে, তাহা তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ভাগ লইয়া আত্ম-তৃপ্ত হইয়া থাকিতে দেয় নাই।

কিন্তু এই যে জগতে ধর্ম্মভাব বিতরণের চেষ্টা, ইহা হইতে আর এক প্রকার ফল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হয়ত এই সকল মহাজন প্রার্থনীয় বলিয়া মনে করেন নাই। সে অনিষ্ট ফল এই, ধর্ম্মের বাহ্য ক্রিয়া সকল মানুষের বন্ধনস্বরূপ হইয়াছে। সাধকগণ সিদ্ধিলাভ করিয়া অন্তরস্থিত আধ্যাত্মিক ধর্ম্মকে লৌকিক ব্যবহারে প্রয়োগ করিয়া নানা প্রকার শাসন, নীতি ও সাধন-প্রাণালীর উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অজ্ঞ মানবগণ সেই সকল বাহ্য ক্রিয়া-কলাপকেই ধর্ম্মবোধে তাহাতেই আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্ম বলিতে তাহারা তাহাই বোঝে ও সেই সকল নিয়মের পরিপালন করিয়াই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে। এই বদ্ধ ধর্ম্মে যাহারা বাস করিতেছে তাহাদের দৃষ্টি অতি সংকীর্ণ। ধর্ম্মের উদারভাব তাহাদের অন্তরে নাই। তাহারা চিরদিন তুচ্ছ মত ও ক্রিয়া লইয়া ধর্ম্মের বহিঃপ্রাঙ্গণেই মারামারি করিতেছে। কোন্ নিয়মের বা বাহিরের কোন্ ক্রিয়ার কোথায় ত্রুটী হইল, তাহারা তাহাই কেবল গণনা করে; অন্তরের প্রেম ঈশ্বরে অর্পিত হইল কিনা তাহা অনুসন্ধান করে না। এইরূপে এই বদ্ধ ধর্ম্মের উপাসকগণ এরূপ এক ঘোর আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্যে পড়িয়া থাকে যে মুক্তি লাভের দিকে কোনও দৃষ্টি থাকে না। চরিত্রে সকল প্রকার দুর্ব্বলতা থাকিয়া যায়, সংসারাসক্তি হ্রাস না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কাম ক্রোধাদি রিপুগণ অবাধে রাজ্য করিতে থাকে, অথচ এই বদ্ধ ধর্ম্মের উপাসকগণ মনে মনে এই ভাবিয়া আপনাদিগকে প্রবোধ দেন যে ধর্ম্ম সাধন চলিতেছে।

ব্যক্তিগত জীবনে যেমন এইরূপ আত্ম-প্রবঞ্চনা দৃষ্ট হয়, সামাজিক জীবনেও সেই প্রকার আত্ম-প্রবঞ্চনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সমাজ মধ্যে সর্ব্ববিধ দুর্নীতি প্রকাশ পাইতেছে, নরনারী সংসারাসক্তি ও বিলাস-পরায়ণতাতে ডুবিতেছে, কেহ কাহাকেও শ্রদ্ধা করিতেছে না, সামান্য সামান্য কারণে দলাদলি উপস্থিত হইয়া হিংসা ও বিদ্বেষের গরলে সমাজ ছারখার হইয়া যাইতেছে, অথচ তাহারা এই বলিয়া অহঙ্কার করিতেছে যে স্বর্গরাজ্য তাহাদের মধ্যেই অবতীর্ণ! ধর্ম্ম তাহাদের এক চেটিয়া সম্পত্তি! জগদীশ্বর এরূপ অহঙ্কার অধিক দিন সহ্য করেন না। তাঁহার প্রদত্ত গুরুতর শাস্তি অবিলম্বে আসিয়া এই সকল ব্যক্তিকে ও এই সকল সমাজকে ধরাশায়ী করিয়া দেয়; তাহারা লোকের অবজ্ঞা, নিন্দা ও কুৎসার তলে ডুবিয়া যায়। এইজন্য আমরা ইহা নিরন্তর অনুভাব করিতেছি যে বদ্ধ ধর্ম্ম মানুষকে পরিত্রাণ দিতে পারে না। এরূপ দৃষ্টান্ত আমরা ভূরি ভূরি দেখিতেছি যে লোকে এই প্রকার বদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যে বাস করিয়া ও কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে না; তাহাদের চিত্তবিকার ঘুচিতেছে না। মানবাত্মাকে স্বাধীন ও মুক্ত করিয়া প্রীতি-যোগে সেই পরম পুরুষের সহিত মিলিত করাই ধর্ম্মের প্রধান কাজ। কি পরিতাপের বিষয়, সেই ধর্ম্মই বন্ধন-রজ্জু-স্বরূপ হইয়া মানবাত্মাকে অসার কর্ম্মের মধ্যে বাঁধিয়া ফেলিতেছে।

কিন্তু এই বদ্ধ ধর্ম্মের পার্শ্বেই মুক্ত ধর্ম্ম বলিয়া একটা পদার্থ আছে। অনন্যগতি ও অনন্যমতি হইয়া ঈশ্বরে প্রীতি স্থাপন

করিলেই সে ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। ইহাকে মুক্ত ধর্ম্ম বলা হইয়াছে কারণ বিশুদ্ধ প্রেমের স্বভাবই এই যে তাহা স্বাধীনতাকে আনিয়া দেয়। আত্মা তখন মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গমের ন্যায় প্রেমালোকে বিচরণ করিতে থাকে। এই মুক্ত ধর্ম্ম স্বভাবতঃই উদার; কারণ প্রেম সকল প্রকার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া মানবহৃদয়কে জগতের সঙ্গে একীভূত করিয়া দেয়। যেমন কোনও নদীর শাখা প্রশাখা ধরিয়া যাহারা তাহার উৎপত্তি স্থানের অভিমুখে গমন করিতে থাকে, যতই সেই আদি উৎসের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে ততই যেমন পরস্পরকে নিকটস্থ দেখিতে পায়, তেমনি ধর্ম্মের উৎস স্বরূপ যে বিশুদ্ধ ভক্তি তাহাতে যাঁহারা উপস্থিত হন, তাঁহারা সকল ভক্তকে সেখানে দেখিতে পান। বদ্ধ ধর্ম্মের রাজ্যে মানুষ যতদিন বাস করে, ততদিন জাতিভেদ লইয়া মারামারি করিয়া থাকে; কিন্তু প্রেমের মুক্ত ধর্ম্মের আস্বাদন একবার পাইলে জাতিভেদ আপনাপনি খসিয়া পড়িয়া যায়। প্রেমের মুক্ত ধর্ম্মের আস্বাদন যাঁহারা পাইয়াছেন তাঁহাদিগকে আর নীতি-শাস্ত্রকারদিগের গ্রন্থ খুলিয়া নীতির উপদেশ সকল পাঠ করিতে হয় না; কিন্তু তাঁহারা আত্মমধ্যেই জীবন্ত নীতি দর্শন করিয়া থাকেন।

এই প্রেমের মুক্ত ধর্ম্ম যাঁহারা সাধন করেন, তাঁহারা আধ্যাত্মিক-ভাব-সম্পন্ন। তাঁহারা কি বাহিরের কোনও প্রকার সাধন-প্রাণালী অবলম্বন করেন না? আবশ্যকমত তাঁহারা বাহিরের সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তদুপরি তাঁহাদের সমগ্র নির্ভর নহে। তাঁহাদের

সাধন-প্রণালী ও আধ্যাত্মিক। ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে তাঁহাদের অন্তরে নিরন্তর সংগ্রাম চলিতে থাকে। আত্ম-সংযম, বৈরাগ্য, বিনয় এক একটী সাধন করিতে তাঁহাদিগকে কত চক্ষের জল ফেলিতে হয়, কত আত্ম-বলিদান করিতে হয়, কত আত্ম-পরীক্ষা, চিন্তা ও প্রার্থনা করিতে হয়। অন্তরের এই সংগ্রামের প্রতিই তাঁহাদের প্রধান দৃষ্টি থাকে। এই সংগ্রাম যদি কোনও কারণে মন্দীভূত হয় তাহা হইলে ইহারা বিপদ গণনা করেন, সেই আধ্যাত্মিক ক্ষুধামান্দ্য দর্শন করিয়া তাঁহারা আর সুস্থির থাকিতে পারেন না; আত্মাকে পীড়িত জানিয়া তখনি তাহার উপায় বিধান করিবার জন্য ব্যগ্র হন। বাহ্য সাধন এই উপায় মাত্র,জগদীশ্বর আমাদের সকলেরই অন্তরে সময়ে সময়ে ব্যাকুলতা ও সংগ্রামের উদয় করিয়া থাকেন; তাহা তাঁহার আহ্বানধ্বনি-স্বরূপ। তিনি যেন নিদ্রিত আত্মাকে ডাকিয়া বলেন—"আর কত আলস্য-শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে? উত্থান কর, জাগ্রত হও," প্রেমিক সাধকগণ এই আহ্বানধ্বনি শুনিয়া তৎক্ষণাৎ উত্থিত হন, এবং সেই বাণীর অনুসরণ করেন; কিন্তু সুখ-প্রিয় প্রকৃতি শুনিয়াও পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করে। তাহার শাস্তি এই হয়, ঈশ্বরের প্রেম-মুখ সে হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। হায় হায়! এইরূপে আমরা কতবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি, তাঁহার আহ্বানধ্বনি শুনিয়াও অবহেলা করিয়াছি! আপনাদের মৃত্যু আপনারা ডাকিয়া আনিয়াছি!

বদ্ধ ধর্ম্ম হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায় সত্য স্বরূপকে সত্যভাবে দর্শন করা। যতদিন মানুষ সত্যকে না দেখে

ততদিন অপরের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিতে হয়, যে যাহা বলে শুনিতে হয় ও করিতে হয়। এরূপ ব্যক্তি স্বভাবতঃই পরাধীন! তুমি যে দেশ দেখ নাই, তাহার বিবরণ পর্য্যটক-দিগের গ্রন্থে পড়িয়া জানিতে হয় ও তদুপরিই নির্ভর করিতে হয়। যে সে দেশ দেখিয়াছে সে ব্যক্তি সে সম্বন্ধে স্বাধীন ও মুক্ত। তাহার নির্ভর নিজের অভিজ্ঞতার উপরে। তাহার হৃদয়স্থ জ্ঞানকে কেহ বিলুপ্ত করিতে পারে না, তাহার জ্ঞান লোকের অনুরাগ বিরাগের উপরে নির্ভর করে না। সেইরূপ যিনি সত্য-স্বরূপকে সত্যভাবে দর্শন করিয়াছেন তিনিই মুক্ত ধর্ম্মের তিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্ম আর গুরু বা শাস্ত্রের উপরে নাই; আত্মার স্বাধীন ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান। এইরূপ হৃদয়ের প্রেমের উৎস কখনই বিশুষ্ক হয় না।

নাল্পে সুখমস্তি।

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং। নাল্পে সুখমস্তি।

উপনিষদ।

অর্থ—"যিনি মহান তাঁহাতেই সুখ, অল্পে সুখ নাই।"

ঋষিগণ আত্মার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন যে, আত্মা সেই অনন্ত ও মহান পুরুষের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনেতেই সুখী হইয়া থাকে; যাহা কিছু ক্ষুদ্র ও পরিমিত তাহাতে মানবাত্মার প্রকৃত তৃপ্তি নাই। ইহার কারণ এই,—অনন্তই আত্মার বাস ও বিহারের ভূমি। সত্য, ন্যায়, প্রেম ও পবিত্রতা প্রভৃতি আত্মার উচ্চ ভাবগুলির বিষয়ে চিন্তা করিলেই আমরা দেখিতে পাই যে, তাহাদের প্রকৃতির মধ্যেই অনন্ততা নিহিত রহিয়াছে। আমরা কল্পনা দ্বারা তাহাদের কোনও সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারি না। চিন্তাতে এরূপ একটী রেখা পাই না, যাহার ওদিকে আর সত্য নাই, বা যাহার অপর দিকে আর ন্যায়ের গতি নাই, বা প্রেমের প্রসার নাই। সুতরাং আত্মার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলেই ইহা অনুভব করা যায় যে আমরা দেহ ও ইন্দ্রিয়ের দিকে সীমাবদ্ধ, কিন্তু অধ্যাত্ম-দিকে অনন্তমুখীন। আমরা যেন এমন একটী প্রাসাদে বাস করিতেছি, যাহার সম্মুখে একটী পর্ব্বতশ্রেণী দৃষ্টিপথকে রোধ করিতেছে, কিন্তু পশ্চাৎদিকে অকূল সমুদ্র প্রসারিত; মানবপ্রকৃতির মধ্যে এই অনন্তের ভাব নিমগ্ন আছে বলিয়াই মানবাত্মা মহৎ ও উদার বিষয়ের চিন্তাতে সুখী হইয়া থাকে। এ বিষয়ে মানবাত্মার

প্রকৃতি যেন মৎস্যের প্রকৃতির ন্যায়। মৎস্যকে যতই দীর্ঘায়তন সরোবরে রাখিবে, ততই তাহার বলবীর্য্য ও শ্রী সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইবে, আর যতই তাহাকে ক্ষুদ্রায়তন স্থানে আবদ্ধ করিবে ততই তাহার দুর্গতি। একদিন এক সময়ে একটী ক্ষুদ্রায়তন জলাশয়ে ও একটী প্রকাণ্ড দীর্ঘিকাতে একজাতীয় মৎস্যের শিশু ছাড়িয়া দেও, এবং দুই বৎসর পরে একদিনে একই সময়ে উক্ত উভয় জলাশয় হইতে মৎস্য ধর, উভয়ের কত প্রভেদ দেখিতে পাইবে। যে সকল মৎস্য এই দুই বৎসর কাল ক্ষুদ্রায়তন জলাশয়ে বাস করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহারা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় ও কদাকার, কিন্তু যাহারা প্রকাণ্ড দীর্ঘিকাতে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহারা সবল সুন্দর ও দীর্ঘকায়। ইহা আমরা কতবার লক্ষ্য করিয়াছি। মৎস্যগণ যে পরিমাণে ক্রীড়া ও বিহার করিবার ক্ষেত্র পায়, সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই কারণে বুদ্ধিমান গৃহস্থগণ অনেক সময়ে বড় বড় পুষ্করিণীর পার্শ্বে তালবৃক্ষ সকল রোপণ করিয়া থাকেন; অভিপ্রায় এই, বায়ু-সমাগমে ঐ সকল তালবৃক্ষের পত্রের এক প্রকার শব্দ হয়, যাহাতে ত্রস্ত হইয়া মৎস্যগণ চারিদিকে দৌড়িতে থাকে। মৎস্যকে ক্ষুদ্র স্থানে রাখিলে, ক্ষুদ্রকায় হইয়া যায় ইহা আমরা কতবার দেখিয়াছি। কলিকাতা সহরের ধীবরগণ অনেক সময়ে বহু দূরবর্ত্তী স্থান সকল হইতে মৎস্য আমদানী করিয়া বাজারে তাহাদিগকে বিক্রয় করিয়া থাকে। ঐ সকল মৎস্য বহুদিন নৌকার গর্ভে ও তৎপরে জল কলসে বাস করে। কিছুকাল ঐরূপ সংকীর্ণ স্থানে বাস করিলেই তাহাদের আকৃতি ও বর্ণ

বিকার প্রাপ্ত হয়। তখন লোকে তাহাদিগকে ঘৃণা করিতে থাকে। মানবাত্মাকে উদার, মহৎ ও পবিত্র বিষয়ের চিন্তা হইতে বিরত করিয়া ক্ষুদ্র বিষয়ের চিন্তাতে নিরন্তর রাখিলে তাহারও দশা ঐ প্রকার হইয়া থাকে। সেরূপ আত্মার বলবীর্য্য, শ্রী, সৌন্দর্য্য সমুদায় অন্তর্হিত হয়।

স্ত্রী পুত্র পরিবারাদি লইয়া জনসমাজে বাস করিতে গেলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে মনোনিবেশ করা অনিবার্য্য। প্রত্যেক দিন আমাদের হৃদয় দ্বারে নব নব চিন্তাকে আনয়ন করে, প্রত্যেক দিন নব নব অভাব ঘটিতে থাকে, সুতরাং আমাদিগকে বাধ্য হইয়া সেই সকলে মনোনিবেশ করিতে হয়। কেবল তাহা নহে, সে সকলের প্রতি মনোনিবেশ করা আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য। এক অর্থে সে সমুদায় আমাদের ধর্ম্মসাধনের অঙ্গস্বরূপ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আমরা সকল সময়ে তাহাদিগকে আমাদের ধর্ম্মসাধনের অঙ্গস্বরূপ বলিয়া মনে করিতে পারি না। অনেক সময়ে ঐ সকল বিষয়ে এরূপ আসক্ত হইয়া পড়ি যে, তাহাদের অতিরিক্ত যে আরও কিছু আছে, মন যেন তাহা বিস্মৃত হইয়া যায়। জীবন ধারণের উচ্চ লক্ষ্য সকল বিস্মৃত হইয়া মন জীবনধারণের উপায় গুলিকেই লক্ষ্য বলিয়া অবলম্বন করে। ইহাকেই বলে বিষয়াসক্তি। বিষয়াসক্তিতে মানব-আত্মাকে অতিশয় ক্ষুদ্র করিয়া ফেলে। এরূপ ব্যক্তির চিন্তা ক্ষুদ্র, আকাঙ্ক্ষা ক্ষুদ্র, দৃষ্টি ক্ষুদ্র, আশয় ক্ষুদ্র, বন্ধুতা ক্ষুদ্র, সকলি ক্ষুদ্র।

একদিকে বিষয় যেমন মানুষকে ক্ষুদ্র করে, অপর দিকে সেই

অনন্ত অবিনাশী পুরুষের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন তাহাকে মহত্ত্ব-সম্পন্ন করে; তাঁহার স্বরূপ যে সত্য, ন্যায় প্রেম ও পবিত্রতা তাহারও চিন্তনে মানবাত্মা মহত্ত্ব লাভ করিয়া থাকে। তাহাতে যে কেবল মহত্ত্ব লাভ হয় তাহা নহে, তাহাতে গভীর তৃপ্তিও আছে। জলে বিহার করিয়া মৎস্যের তৃপ্তি; আকাশে উড়িয়া পক্ষীর তৃপ্তি। বিধাতা যাহাকে যে শক্তি বা বৃত্তি দিয়াছেন, তাহার পরিচালনাতেই সুখ। অনেকবার অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে একটী কুকুর একটী বায়ু-তাড়িত শুষ্ক পত্রের পশ্চাতে এমনি ব্যগ্রতা ও উৎসাহের সহিত ছুটিতেছে যেন সেটী তাহার পক্ষে কত প্রয়োজনীয় বস্তু। অথবা একটী গোবৎস ঊৰ্দ্ধ-লাঙ্গুল হইয়া এমনি ছুটিতেছে যেন কে তাহাকে হত্যা করিবার জন্য অনুসরণ করিতেছে। ইহার কারণ কি? কারণ অঙ্গ সকলের চালনা-জনিত সুখ। দ্রুতবেগে ধাবিত হওয়াতেই এক প্রকার আনন্দ। একটী ক্ষুদ্র শিশু তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্ত পদগুলি নাড়িয়া খেলা করিতেছে, তাহার হস্তপদ দুই মিনিটের জন্য ধরিয়া রাখ, পূর্ব্ববৎ নাড়িতে দিও না, দেখিবে যে ক্রন্দন করিয়া উঠিবে। সে ক্রন্দন করিল কেন? তুমিত তাহাকে আঘাত কর নাই, বা অপর কোনও প্রকারে ক্লেশ দেও নাই। চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে, তাহার হস্ত পদের সঞ্চালন নিবন্ধন তাহার যে সুখ হইতেছিল, তাহার ব্যাঘাতই তাহার অসুখের কারণ। এইরূপ উন্নত ও উদার বিষয় সকলের অনুধ্যানেই আত্মার উন্নত বৃত্তিনিচয়ের পরিচালনা ও বিকাশ হইয়া থাকে, তন্নিবন্ধন একপ্রকার গভীর আধ্যাত্মিক সুখ

উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেবল তাহাও নহে, ইহার উপরে আবার ঈশ্বর-সহবাসের সুখ। অদ্ভুত প্রকৃতি সম্পন্ন অমরাত্মার পূর্ণ তৃপ্তির বিষয় তিনি। তাঁহাতে সত্য, ন্যায়, প্রেম ও পবিত্রতা পূর্ণ মাত্রাতে বিরাজিত সুতরাং তাঁহাকে পাইলেই আমাদের প্রকৃতির পূর্ণ চরিতার্থতা। যেমন ক্ষুধার সময় অন্ন লাভ করাতে তৃপ্তি, পিপাসার সময় বারি লাভ করাতে তৃপ্তি, তেমনি তাঁহাকে লাভ করিয়া অমরাত্মার তৃপ্তি। এই জন্যই ঋষিরা বলিয়াছেন—"যো বৈ ভূমা তৎসুখং।"

কিন্তু সেই অনন্তের চিন্তাতেই মানবের আনন্দ একথা বলিয়া ঋষিরা ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা বলিলেন—"নাল্পে সুখমস্তি" —অল্পেতে সুখ নাই। এই কথা আমরা দুই প্রকার অর্থে গ্রহণ করিতে পারি। প্রথম, যাহা ক্ষুদ্র ও পরিমিত, যাহা অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী তাহাতে সুখ নাই। কারণ তাহা এক দিন বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যাহার সীমা আমি দেখিতে পাই, তাহা আমার অপেক্ষা ক্ষুদ্র, আমার চিত্ত তাহাতে পরিতৃপ্ত হইতে পারে না; মন তাহার উপরে নির্ভর করিতে পারে না; তাহার হস্তে আপনাকে অর্পণ করিতে পারে না; সুতরাং তাহা আমাদের আত্মার বিশ্রাম-ভূমি নহে। ইহার আর এক প্রকার অর্থ হইতে পারে তাহা এই—যাহা অল্প অর্থাৎ আমাদের আত্মা যাহা চাহে তাহা অপেক্ষা কম, তাহাতে আত্মার সুখ নাই। সত্য বস্তু লাভ করিবার জন্য আমাদের আত্মার আকাঙ্ক্ষা, সুতরাং যাহা সত্য নহে কেবল ছায়া মাত্র, তাহা লইয়া আমাদের আত্মা সুখী হয় না। জগতের মহা-

জনদিগের জীবন-চরিত যদি অলোচনা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, তাঁহারা যেন বহুদিন অতৃপ্ত অন্তরে কি একটা অন্বেষণ করিয়া বেড়াইয়াছেন ; এবং যতদিন সেই বস্তুটা ধরিতে না পারিয়াছেন, ততদিন তাঁহাদের চিত্ত কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই। চির প্রচলিত ধর্ম্মের যে সকল ক্রিয়াকে অবলম্বন করিয়া লক্ষ লক্ষ সাধারণ লোক সন্তুষ্ট থাকিয়াছে, তাঁহারা তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। সে সকলকে তুষ বোধে উপেক্ষা করিয়া যেন তাঁহারা কি শস্যের অনুসন্ধান করিয়াছেন। এই শস্য কি ? যাহা না হইলে আর সমুদায়ই অসার হইয়া যায় ?

প্রকৃত সাধাকদিগের এই সার শস্যের প্রতিই প্রধান দৃষ্টি। ইহা অপেক্ষা যাহা অল্প অর্থাৎ হীন তাহাতে তাঁহারা কোনও রূপেই তৃপ্ত হইতে পারেন না। সকল বিষয়েই সারটী না দিয়া অসার বস্তু দিলে বুদ্ধিমান লোকে সন্তুষ্ট হয় না। মনে কর একজন দোকানদার তোমার নিকট প্রাপ্য টাকার জন্য তাগাদা করিতে আসিয়াছে। তুমি তাহাকে এস ভাই, বস ভাই, বলিয়া অভ্যর্থনা পূর্ব্বক বসাইলে, ভদ্রতার রীতি অনুসারে পাণ তামাক দিলে, প্রচুর পরিমাণে মৌখিক সৌজন্য প্রদর্শন করিলে, অনেক গল্প গাছা হাস্য পরিহাস করিলে কিন্তু তাহার টাকা কয়টী কবে দিবে তাহার কিছু বলিলে না। ইহাতে কি সে সন্তুষ্ট হয়? সে কি তোমার পাণ তামাক ও সৌজন্য দেখিয়া ভুলে ? কখনই না, অবশেষে সে তোমাকে বলে, “মহাশয় ! ও সব কথা থাক্ টাকা কয়টী কবে দিবেন বলুন।”

সেইটী তার সার কথা! সেটীর বন্দোবস্ত যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ কোনও সৌজন্যে তার মন ভুলে না। অথবা মনে কর, একজন প্রকৃত তত্ত্ব জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী ছাত্র গুরু-সন্নিধানে কোন কোনও দুর্ব্বোধ বিষয়ের অর্থ জানিতে চাহিয়াছে। গুরুর নিজেরই সে বিষয়ে পরিষ্কার জ্ঞান নাই; অথচ ছাত্র-সন্নিধানে তাহা ব্যক্ত করিতে ইচ্ছুক নহেন; তিনি বৃথা বাগাড়ম্বর করিয়া ছাত্রকে ভুলাইতে চাহিতেছেন, স্বর্গ মর্ত্ত্যের কত কথা আনিতেছেন, কত দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ দিতেছেন, কিন্তু বুদ্ধিমান ছাত্র অতৃপ্ত থাকিয়া মনে মনে বলিতেছে—"বৃথা বাগাড়ম্বরে ফল কি, আসল কথার ত কোনও মীমাংসা হইল না।" তেমনি প্রকৃত ধর্ম্মার্থী ব্যক্তিদিগেরও অন্তরে একটা আসল কথা থাকে সেটার কোনও উপায় না হইলে, বাহিরের ধর্ম্মের ক্রিয়া সকলকে বৃথা আড়ম্বর বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা অল্পে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না।

ধর্ম্মের ভিতরকার এই আসল কথাটা কি? আসল কথাটা বিষয়াসক্তির অভাব অর্থাৎ প্রধান মনটা ঈশ্বরে ও গৌণ মনটা সংসারে রাখা। যাহার প্রধান মনটা সংসারে গৌণ মনটা ঈশ্বরে সেই বিষয়ী, এবং যাঁহার প্রধান মনটা ঈশ্বরেও গৌণ মনটা সংসারে তিনিই ধার্ম্মিক। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া বাস করিতে হইলেই গৃহস্থ মাত্রেরই বাসভবনে একটা রন্ধনশালা রাখিতে হয়; তাহা অনিবার্য্য রূপে প্রয়োজনীয়। গৃহস্থ মাত্রেই স্বীয় স্বীয় রন্ধনশালাকে আপনাদের কার্য্যের উপযোগী করিয়া লয়। কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ

রন্ধনশালার উপরে প্রধান মন রাখে না; শয়নে স্বপনে রন্ধনশালার ধ্যান করে না; প্রধান মনটা সংসারের উন্নতি বিষয়ে থাকে। এইরূপ সংসারে বাস করিতে গেলেই খাইয়া পরিয়া থাকিতে হয়, খাইয়া পরিয়া থাকিবার জন্য অর্থোপার্জ্জন, অর্থ-সংস্থান প্রভৃতির প্রয়োজন হয়, সে কাজটাকে যথাসাধ্য আপনাদের অবস্থা ও প্রয়োজনের উপযোগী করিয়া লও, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু প্রধান মনটা তাহার উপরে না রাখিয়া আত্মার উন্নতির উপরেই রাখ। এই ভিতরকার কথা। সেই জন্যই বলি, যিনি প্রধান মনটা বিষয়-সুখে না রাখিয়া ধর্ম্মে রাখিতে পারিয়াছেন তিনিই ধার্ম্মিক।

এখন প্রশ্ন এই প্রধান মনটা ধর্ম্মের উপরে থাকে না কেন? এই প্রশ্ন লইয়াই সাধু মহাজনগণ ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ভক্তিপথাবলম্বিগণ ভাবিলেন ভগবানে অকপট প্রেম ও ভক্তি অর্পিত হইলেই প্রধান মনটা ধর্ম্মের উপরে পড়িবে। সেই জন্য তাঁহারা ভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া অবলম্বন করিলেন। প্রকৃত ভক্তি ভিন্ন কেহই মানব-হৃদয়ের গতিকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না। আবার ভক্তি দীনতা-প্রসূত। ভক্তিবিহীন জ্ঞান, ও ভক্তিবিহীন ক্রিয়া অহঙ্কারকে উৎপন্ন করে, রাজসিক ভাবকে প্রবল করে। ইহা প্রমাণিত সত্য। বৈরাগ্য ও দীনতা দ্বারা মানব-হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়া ভক্তির জন্য উন্মুখ হয়। এই কারণে ভক্তির সাধকগণ উক্ত উভয় ভাবের উদয় করিয়া মানব-হৃদয়কে পরিবর্ত্তিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এবং যে ভক্তির দ্বারা মানব-হৃদয় পরিবর্ত্তিত হয় তদপেক্ষা অল্প

যাহা তাহাতে তাঁহাদের হৃদয় তৃপ্ত হয় নাই। তাঁহাদের মন যেন সর্ব্বদা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছে—"নাল্পে সুখ-মস্তি" "নাল্পে সুখমস্তি" "অল্পে সুখ নাই" অল্পে সুখ নাই।" আমরা কি সময়ে সময়ে এরূপ অতৃপ্তি অনুভব করি না? আমাদেরও মন কি অনেক সময়ে ধর্ম্মের বাহিরের ক্রিয়া-কলাপে অতৃপ্ত হইয়া বলে না,—'এ সকল ত অসার, সার বস্তু কিরূপে পাইব?" "নাল্পে সুখ মস্তি,"—যাহা ক্ষুদ্র, যাহা পরিমিত, যাহা হীন তাহাতে সুখ নাই।

———

পরমাত্মজাত আত্মা।

The wind bloweth where it listeth and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh and whither it goeth : so is every one that is born of the spirit.

অর্থ—বায়ু যথা ইচ্ছা বহমান হয় এবং তুমি কেবল তাহার শব্দ শ্রবণ কর, কিন্তু কোথা হইতে সেই বায়ু আসিতেছে এবং কোথায় তাহা যাইতেছে; তাহা বলিতে পার না; পরমাত্মজাত প্রত্যেক আত্মাই এইরূপ।

অন্ন, পান, সূর্য্যকিরণ, বর্ষার জল প্রভৃতি যে সকল স্থূল ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শক্তি মানবদেহের উপরে কার্য্য করে তাহাদিগকে আমরা প্রত্যক্ষ করি, সুতরাং তাহাদের প্রকৃতি ও কার্য্য বিষয়ে আমরা অভিজ্ঞ আছি। বিজ্ঞান গবেষণা দ্বারা তাহাদের কার্য্যের প্রণালী ও নিয়ম সকল নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

কিন্তু এতদ্ব্যতীত এমন সকল সূক্ষ্ম ভৌতিক শক্তি আছে যাহাদের কার্য্যের ক্রম আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি না। কেন তাহারা আমাদের দেহের উপরে কার্য্য করে, কি প্রণালীতে সেই কার্য্য হয়, এ সকল বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। যেমন, সে কালের লোকে বিশ্বাস করিতেন যে গ্রহনক্ষত্র সকল নভোমণ্ডলের বিশেষ বিশেষ স্থানে অবস্থিত হইলে মানবের জীবনের উপরে বিশেষ বিশেষ ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে।

এইরূপে এদেশীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। গ্রহনক্ষত্রগণ কোনও সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয় প্রণালীতে মানবের ভাগ্যকে নিয়মিত করে কি না জানি না; কিন্তু অনেকে বিশ্বাস করেন যে, বিশেষ বিশেষ তিথিতে মানবের দেহের স্বাস্থ্যের অবস্থা বিশেষ বিশেষ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যাঁহাদের দেহ বাত-রোগগ্রস্ত তাঁহারা অমাবস্যা পূর্ণিমা প্রভৃতি তিথিতে এ সকলের পর্য্যায় অনুসারে তাঁহাদের দৈহিক অবস্থার ইতর-বিশেষ লক্ষ্য করিয়া থাকেন। তিথি বিশেষে তাঁহাদের পীড়ার হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই বিষয়টীও যে ভূয়োদর্শন দ্বারা অভ্রান্তরূপে বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভূমির উপরে স্থাপিত হইয়াছে এরূপ বলা যায় না।

আর এক প্রকার সূক্ষ্ম ভৌতিক শক্তির কার্য্য আমরা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতেছি। যখন কোনও সহরে বসন্ত কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন তাহাদের ভয়ে সেই নগরবাসী লোকদিগকে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতে হয়, কিন্তু কেন যে ঐ সকল রোগ এত সংক্রামক, কেন যে উহারা মানবদেহকে এমন কঠিনরূপে আক্রমণ করে, তাহা আমরা জানি না। চিকিৎসা-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে ঐ সকল রোগের সূক্ষ্ম বীজ সকল জল, বায়ু, অন্ন, পান প্রভৃতিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া মানবদেহে সংক্রান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল সূক্ষ্ম-বীজ যে কি প্রকার, কেন যে তাহারা এক দেহে কার্য্য করে এবং অপরদেহে করে না, সে বিষয়ে তাঁহারা অদ্যাবধি কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সমর্থ হন

নাই। তাঁহারা সাধারণ ভাবে এই মাত্র বলিয়া থাকেন যে, যে দেহ predisposed থাকে অর্থাৎ উক্ত বীজ সংক্রমণের অনুকূল অবস্থাতে থাকে, তাহাতে উহার শক্তি প্রকাশ পায়। এ কথা বলিবার জন্য বিজ্ঞানবিদের আবশ্যক নাই। ইহা সকলেই জানে যে, যে দেহ রোগের বীজ পাইবার পক্ষে অনুকূল তাহাতেই সেই বীজ সংক্রান্ত হয়। কিন্তু সেই অবস্থার কারণ ও লক্ষণ কি? দেহ কিরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত হইলে উক্ত রোগে আক্রান্ত হওয়া সম্ভব, তাহা কেহ বলিতে পারেন না।

অতএব আমরা দেখিতেছি যে সূক্ষ্ম ভৌতিক শক্তি সকল অতি বিচিত্র ভাবে মানব-শরীরের উপরে কার্য্য করিয়া থাকে। কি প্রণালীতে এবং কি নিয়মে যে তাহারা কার্য্য করে, তাহা আমরা জানি না। আমরা কেবলমাত্র তাহাদের কার্য্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাই।

ভৌতিক বিষয়ে আমরা যেমন সূক্ষ্ম শক্তির আশ্চর্য্য কার্য্য দেখিতেছি, আধ্যাত্মিক বিষয়েও তদপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য কার্য্য দেখিতে পাই। মানব মনের উপরেও নানাপ্রকার সূক্ষ্ম শক্তি কার্য্য করিয়া থাকে। এমন কি, মানবের হর্ষ বিষাদের সহিত বাহিরের প্রকৃতিরাজ্যেরও অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ভৌতিক জগতও মানব-মনের উপরে অতি আশ্চর্য্য লীলা করিয়া থাকে। রক্ত মাংসবিশিষ্ট আমাদের এই জড়দেহের সহিত আমাদিগের মানসিক বৃত্তি সমূহের এত নিকট সম্বন্ধ, মস্তিষ্কের ও স্নায়ুমণ্ডলের সহিত মনের এত ঘনিষ্ট যোগ যে, সম্পূর্ণ বাহিরের বিষয় সকলও অনেক সময়ে আমাদের

মানসিক রাজ্যে সুমহৎ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া থাকে। বাসন্তী পূর্ণিমার রজনীতে যখন ধীরে ধীরে মলয় পবন প্রবাহিত হইয়া থকে, প্রস্ফুটিত পুষ্পের গন্ধভার বহন করিয়া যখন সেই পবন চতুর্দ্দিককে আমোদিত করে, শুভ্র জ্যোৎস্নালোক যখন তাবত পদার্থে পতিত হইয়া কমনীয় স্নিগ্ধ কান্তিতে ধরার মুখকে পূর্ণ করে, তখন সে দৃশ্য দেখিয়া কাহার চিত্ত না আপনাপনি আনন্দে পূর্ণ হয়? চিরবিষণ্ণ ব্যক্তিও তখন অন্ততঃ একটী বারের জন্য আর সকল দুঃখ ভুলিয়া সে দৃশ্য উপভোগ করে। আবার বর্ষাকালের দিনে শ্রাবণের বর্ষাধারা যখন অবিরাম-গতিতে পড়িতে থাকে, প্রখর গ্রীষ্মের উত্তাপে যখন গলদঘর্ম্ম কলেবর হইয়া পড়িতে হয়, শয়নে উপবেশনে যখন সুখ পাওয়া যায় না, বিশ্রামের সুখ যখন ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারা যায় না, এবং ঘনঘটা-সমাচ্ছন্ন আকাশ যখন গভীর গর্জ্জনে মেদিনীকে কম্পিত করে, তখন আপনাপনিই মনের মধ্যে একপ্রকার বিষাদ উপস্থিত হয়; চিত্ত আপনাপনিই গম্ভীর ভাব ধারণ করে। এইরূপ অজীর্ণতা রোগেও মানুষকে বিষণ্ণ, বিরক্ত এবং নরদ্বেষী করিয়া ফেলে। মানুষের যদি পরিপাক ক্রিয়া সুচারু রূপে সম্পন্ন না হয়, রাত্রিকালে উত্তমরূপ নিদ্রা না হয়, পাকস্থলীর যন্ত্র সকল প্রকৃত অবস্থাতে না থাকে, তাহা হইলেও মানব মনের প্রফুল্লতা নষ্ট হয়; মানবচিত্তে চিরবিষন্ন-তার উদয় হয় এবং সেরূপ মানুষ সচরাচর নরদ্বেষী হয়; তাহার স্বভাব উগ্র হয়; সকল কার্য্যেই মন বিরক্ত হয়; কাহাকেও ভাল বাসিতে পারে না; সে ব্যক্তি সর্ব্বদাই অসুখী; সে যেন

কি এক প্রকার বিরক্তির ও বিষাদের চসমা পরিধান করে, যাহার দ্বারা সে সকলকেই বিদ্বেষের চক্ষে দেখে, সকলকেই বিরক্তির চক্ষে দর্শন করে। আমরা যে 'নরপ্রেম' 'নরপ্রেম' বলিয়া চীৎকার করি, এই নরপ্রেমিক হইবার জন্য, ধর্ম্মপথে চলিবার জন্য, মানুষের ভালরূপ পরিপাকক্রিয়া হওয়া আবশ্যক। আমি একবার একখানি পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলাম যে কোনও এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ে যখন কেহ দীক্ষার্থী হইয়া আসিত তখন অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে তাহাকে প্রশ্ন করা হইত যে, তাহার উত্তমরূপ পরিপাক হয় কি না। যখন আমি ইহা পাঠ করি, তখন প্রথমতঃ আমার কিছু আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল, যে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দীক্ষার্থীকে আবার "তোমার ভালরূপ পরিপাক হয় কি না, রাত্রিকালে উত্তমরূপ নিদ্রা হয় কি না," এ সকল প্রশ্ন কেন? তৎপরে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি যে ধর্ম্মসাধনের জন্য এ সকলের অতিশয় প্রয়োজন। অজীর্ণদোষ ও অনিদ্রা ধর্ম্মসাধনের পক্ষে এক প্রধান প্রতি-বন্ধক। সুতরাং আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে ভৌতিক জগত ও আধ্যাত্মিক রাজ্যে অতি বিচিত্র কার্য্য সকল করিয়া থাকে।

আবার এক আত্মার উপরে অপর আত্মার যে কার্য্য তাহার প্রকৃতি ভাবিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এই কারণেই সামাজিক উপাসনা আবশ্যক। যেখানে দশটী আত্মার শক্তি মিলিত হয় সেখানে অতি আশ্চর্য্য ফল ফলিয়া থাকে। আমরা মাঘোৎসবের সময় দেখিয়াছি সে সময়ে এই মন্দিরে এক প্রকার আশ্চর্য্য শক্তি কার্য্য করিয়া থাকে। সে দিনের দৃশ্য কি

চমৎকার ! কি সুন্দর ! কেন এরূপ হয় ? এই একই মন্দির, একই আচার্য্য, একই উপাসকমণ্ডলী,—সে দিন যে নূতন কেহ আসিয়া বেদীতে বসেন, নূতন উপাসমণ্ডলীর দ্বারা মন্দির পূর্ণ হয় তাহা নহে, কিন্তু সে দিন এই মন্দিরে কি এক নূতন ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। কেন এমন হয় ? ইহার কারণ এই যে, সে দিন উপাসকগণ কি এক নূতন ভাবে, কি এক নূতন ব্যাকুলতার সহিত এখানে আসিয়া উপস্থিত হন, যে ব্যাকুলতা এক আত্মা হইতে অপর আত্মাতে সঞ্চারিত হয়। সে দিন এক আত্মার প্রেম অপর আত্মাতে গিয়া সঞ্চারিত হয় ; সে দিন শক্তি, সংক্রামক রোগের ন্যায়, এক হৃদয় হইতে অপর হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়।

আমরা সকলেই অনেকবার দেখিয়াছি যে ভয় সাহস প্রভৃতিও এক হৃদয় হইতে অপর হৃদয়ে সংক্রান্ত হইয়া থাকে ! বিদ্যালয়ে দশটী বালক বসিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছে, হঠাৎ তাহাদের মধ্যে একজন কোনও কারণে ভীত হইয়া “মাগো” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, অমনি আর সকলে নিমেষের মধ্যে চমকিয়া উঠিল এবং সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। ইহা কেমন সূক্ষ্ম এবং অতীন্দ্রিয় ব্যাপার। সাহস সম্বন্ধেও এইরূপ। রণক্ষেত্রে সৈন্যগণ পরাস্ত হইবার উপক্রম দেখিয়া নিরাশ হৃদয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ পশ্চাৎ দিক হইতে একজন বীর-হৃদয় যোদ্ধা “ভয় নাই, অগ্রসর হও” বলিয়া বজ্র-গম্ভীর নিনাদে তাহাদিগকে আহ্বান করিলেন, অমনই সকলে আবার বীরবলে বলী হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। ইহা কেমন সংক্রামক !

আবার বশীকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা একজন অতি আশ্চর্য্যরূপে আপনার সমুদায় ভাব অপর জনের অন্তরে ঢালিয়া দিতে পারে। যেমন, একজন সুবক্তা উৎসাহ প্রভৃতি স্বীয় হৃদয়ের ভাব সকল অতি বিচিত ভাবে শ্রোতৃবর্গের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারেন। তিনি স্বীয় ইচ্ছামত শ্রোতৃবর্গকে হাসাইতে এবং কাঁদাইতে পারেন। মানব-হৃদয়ের উপরে মানব মনের এই কার্য্যের কথা ভাবিলেই অনুভব করা যায়, যে আমাদিগকে উৎসাহিত, উন্মাদিত ও অনুপ্রাণিত করিতে পারেন, এমন আচার্য্য, গুরু বা নেতা থাকা একটা সৌভাগ্যের বিষয়। যে দলে উন্মাদিত, ও অনুপ্রাণিত করিবার উপযুক্ত কেহ নাই, তাহা দিন দিন অবসন্ন দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সকল সূক্ষ্ম শক্তি বহুল পরিমাণে ভৌতিক হইলেও ইহাদের কার্য্য বহুল পরিমাণে আধ্যাত্মিক।

কিন্তু এ সকল অবস্থাকেও আত্মার বহিঃপ্রকোষ্ঠের ব্যাপার বলা যাইতে পারে ; ইহারও অন্তরে, আত্মার অন্তরতম স্থানে আর এক প্রকার সূক্ষ্ম শক্তির কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। সে শক্তি অতি কোমল, অতি চমৎকার। তাহা মানব মনের উপরে সত্যের শক্তি, বিবেকের শক্তি ও প্রেমের শক্তি। মানব চিত্তের উপরে সত্যের একটা শক্তি আছে, যাহা তাহার চরিত্রের উপরে কার্য্য করে ; যাহা তাহার সকল কার্য্যকে নিয়মিত করে। সত্যকে যিনি জানিয়াছেন, সত্য তাঁহার বাক্যে কার্য্যে এবং চিন্তায় প্রবিষ্ট হয়। সত্য ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার আচরণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হয় ; তিনি যেন সত্যগ্রস্ত হইয়া

থাকেন। ইহারই নাম সত্যের শক্তি। যেমন সত্যের শক্তি আছে, সেইরূপ আবার বিবেকের একপ্রকার শক্তি আছে, অর্থাৎ মানুষ ইচ্ছা করিলেই একটা কিছু করিতে পারে না। যখনই সে ব্যক্তি অন্যায় কার্য্য করিতে যায়, তখনই ভিতর হইতে কে যেন বলিতে থাকে,—"ছি! ছি! এমন কার্য্য করিও না," অমনই সে ব্যক্তি তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। অন্যায়ের পথ হইতে মন আপনাপনি সরিয়া দাঁড়ায়। ইহার নাম বিবেকের শক্তি। এইরূপ আবার প্রেমের শক্তি আছে। প্রেম মানুষকে স্বার্থনাশে প্রবৃত্ত করে ও অপরের বোঝা বহিতে নিযুক্ত করে। এই সকল শিক্ষা যখন একাধারে সন্নিবিষ্ট হয়, তখন অদ্ভুত মানবচরিত্র গঠিত হয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় সকল প্রকৃতির উপরে ইহাদের শক্তি সমান হয় না। সত্য জানিলেই আমি তদনুসারে চলিতে বাধ্য, যাহা গর্হিত তাহা বর্জ্জন করিতে এবং যাহা কিছু সৎ তাহা গ্রহণ করিতে আমি বাধ্য, ইহা সকলে অনুভব করে না। কত লোক কত উৎকৃষ্ট সত্য সকল দিবানিশি শ্রবণ করিতেছে, কিন্তু সকল হৃদয়ে তাহাদের শক্তি হয় না; তাহা যদি হইত, তবে এত দিনে মানব-সমাজ আর এক আকার ধারণ করিত। আমরা প্রতিদিন যে সকল উচ্চ উচ্চ সত্য লাভ করিতেছি, জগতের সাধুরা হয়ত তাহার শতাংশের একাংশও প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু তাঁহারা যে একটু সত্য লাভ করিয়াছেন তাহাতেই প্রাণে এমন আশ্চর্য্য শক্তির সঞ্চার হইয়াছে যে, তাহার জন্য আর সকলকে অতি হীন বিবেচনা করিয়াছেন। সুতরাং আমরা দেখিতেছি

যে সত্য জানিলেই তাহাতে প্রাণে বলের সঞ্চার হয় না। প্রেম সম্বন্ধেও ঐরূপ ;—প্রেমেরও বাধ্যতা সকল প্রকৃতির উপর সমান নহে।

সত্য, ন্যায় ও প্রেমের যে শক্তি তাহা ঈশ্বরেরই শক্তি। উহা যে কি নিয়মে, কি প্রণালীতে মানব প্রাণে আবির্ভূত হয় এবং কি প্রণালীতে তিরোহিত হয়, তাহা আমরা জানি না। উহার অনুকূল অবস্থাই বা কিরূপ আর প্রতিকূল অবস্থাই বা কিরূপ তদ্বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। উহা বায়ুর গতির ন্যায় আমাদের হৃদয়ে কার্য্য করে। কখন যে আসিবে, কি নিয়মে যে আসিবে, তাহা আমরা জানি না। আমরা কেবলমাত্র উহা উপভোগ করি। বায়ু যে কখন এবং কি প্রণালীতে প্রবাহিত হইবে, তাহা যেমন আমরা জানি না, তথাপি উহার প্রবেশের নিমিত্ত যেমন গৃহের দ্বার উন্মুক্ত রাখিতে হয়, সেইরূপ ব্রহ্মশক্তির আবির্ভাব ও তিরোভাবের নিয়ম ও প্রণালী সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইলেও প্রার্থনারূপ দ্বার আমাদিগকে সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখিতে হইবে এবং উঁহার আবির্ভাবের নিমিত্ত ব্যাকুল অন্তরে প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

আমরা কেবল এই মাত্র জানি যে, নবজীবন প্রাপ্ত বা পরমাত্মজাত আত্মাই সেই শক্তি অনুভব করিয়া থাকে। নির্ম্মলচিত্ত, পবিত্রাত্মা, সত্যানুরাগী ব্যাক্তিদের জীবনেই ব্রহ্মশক্তির অপূর্ব্ব ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। বিধাতা যেন, কি এক মধুর স্বরে তাঁহাদিগকে আহ্বান করেন, যাহা শ্রবণ করিয়া

তাঁহারা অন্য সকল কার্য্য ছাড়িয়া, ক্ষতিলাভ গণনা ভুলিয়া, উন্মত্তের ন্যায় সে চরণে আত্মসমর্পণ করেন। তাহাই তাঁহাদের মিষ্ট লাগে; আর সকলই তিক্ত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু চিত্ত-শুদ্ধি ব্যতীত সে মধুর স্বর শ্রবণ করা যায় না।

এই যে ব্রহ্মশক্তি, ইহার আবার দুই প্রকার কার্য্য আছে। এই কারণে বায়ুর সহিত ইহার উপমা দেওয়া হইয়াছে। বায়ুর দুই প্রকার গতি আছে,—সাধারণ গতি ও বিশেষ গতি। এই যে বায়ু প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্তে প্রবাহিত থাকিয়া আমাদের জীবন ধারণের পক্ষে সাহায্য করে, ইহা বায়ুর সাধারণ গতি। আর যখন উহা খরতর বেগে প্রবাহিত হইয়া মহা প্রলয়ের আকার ধারণ করে এবং বৃক্ষলতাদির মূল পর্য্যন্ত উৎপাটন করিয়া ফেলে তখন উহার বিশেষ গতি দেখিতে পাই। কিন্তু এই যে বিশেষ গতি, উহার কি কোনও নিয়ম নাই?—অবশ্য আছে। উহা আর কিছুই নহে, কেবল এই সাধারণ বায়ু ঘনীভূত হইয়া মহা ঝটিকাতে পরিণত হয়। সেইরূপ কোনও সত্য যখন কোনও জাতি মধ্যে বাস করিতে থাকে, তখন ব্রহ্ম-শক্তির সাধারণ কার্য্য, আর যখন সেই সত্য ঘনীভূত হইয়া কোনও সাধু মহাজনের ভিতর দিয়া প্রবল ঝটিকার আকারে বাহির হয়—তখন উহার বিশেষ কার্য্য।

সাধু মহাজনগণের জীবনেই ব্রহ্মশক্তির বিশেষ কার্য্য দেখিতে পাই। শত শত হৃদয়ে যে সত্যাগ্নি প্রধূমিত হইতে থাকে, তাহাই তাঁহাদের এক এক জনের হৃদয়ে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। ঈশা, মুষা, মহম্মদ প্রভৃতি সকল সাধুর

জীবনেই এই বিশেষ ভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁহারা এক এক জন এক এক মহাসত্য প্রাণে ধারণ করিয়াছেন যাহার জন্য জীবন যৌবন সকলই বিসর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহারা যেন ঈশ্বরের কি এক মহা আহ্বান ধ্বনি শুনিয়াছেন যাহার জন্য ধন মান প্রাণকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন। জগতের প্রত্যেক সাধুর জীবনেই এই ভাব দেখিতে পাই। তাঁহারা অধর্ম্মকে ভয় করেন; অন্যায়ের গন্ধ পর্য্যন্ত তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না। মানবদেহ পক্ষাঘাত-রোগাক্রান্ত হইলে যেমন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, হস্ত পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কার্য্যকারিণী শক্তি লোপ প্রাপ্ত হয়, জগতের সাধুগণও অসত্যের গন্ধ পাইলে কি এক প্রকার আধ্যাত্মিক পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন, যাহাতে তাঁহাদের আত্মা একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। মার্জ্জার শাবককে যেমন বহু চেষ্টা এবং পরিশ্রম করিয়াও জলে লইয়া যাওয়া কঠিন, তাহার গলায় দড়ি বাঁধিয়া যদি ক্রমাগত টানাটানি করা যায়, তথাপি সে যেমন জলে যায় না, সাধুদিগকেও সেইরূপ বহু আয়াস বহু চেষ্টা দ্বারাও অন্যায়ের পথে লইয়া যাওয়া যায় না। ইঁহারা সত্যের সেবক; সত্যে ইঁহাদের বাস, সত্যে ইঁহাদের স্থিতি, সত্যই ইঁহাদের প্রধান অবলম্বন।

সাধু মহাজনগণ ব্যক্তিগত ভাবে যাহা সাধন করিয়াছেন, আমাদিগকে সামাজিক ভাবে তাহাই করিতে হইবে। ইহাই আমাদের মহালক্ষ্য। আমাদের আত্মা যাহাতে তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য কঠোর সাধনে সর্ব্বদা নিযুক্ত

থাকিতে হইবে। ইহার জন্য আমাদের প্রত্যেককেই কিছু কিছু করিতে হইবে, প্রত্যেককেই দেহ মন পবিত্র রাখিয়া বায়ুর গতির ন্যায় তাঁহার শক্তির নিমিত্ত ব্যাকুল অন্তরে অপেক্ষা করিতে হইবে। তাহা হইলেই জনসমাজে নবজীবন আসিবে এবং ব্রহ্মশক্তির বিশেষ ক্রিয়া এখানে দেখিতে পাইব। তখন লোকে আমাদের তেজ এবং শক্তি দেখিয়া অবাক্ হইবে। যদি ধর্ম্মসাধন করিতে হয় তবে এই ভাবেই করা উচিত নতুবা এ বিড়ম্বনা কেন?—পরমেশ্বরের নাম করিব, অথচ প্রাণে তাঁহার শক্তি উপলব্ধি করিব না,সত্য, ন্যায় এবং প্রেম আমাদের হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিবে না, এ কেমন কথা? অন্ন আহার করিব, জল পান করিব, অথচ ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ হইবে না, ইহা কি সম্ভব? ঈশ্বর করুন, আমরা সকলে অকপটচিত্তে তাঁহার শক্তির হস্তে যেন আপনাদিগকে সমর্পণ করিতে পারি!

আধ্যাত্মিক আলস্য।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—উপনিষদ।

অর্থ—"এই পরমাত্মা বলহীন ব্যক্তির লভ্য নহেন।"

খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেল গ্রন্থে দায়ুদের সংগীতাবলী নামে একটী গ্রন্থ আছে, তাহা অতি উপাদেয়। ঈশ্বরে অকপট প্রীতি ও একান্ত নির্ভরের জন্য উক্ত গ্রন্থ প্রসিদ্ধ, তাহা হইতে একটী বচন উদ্ধৃত করা যাইতেছে। কিরূপ ভাবে, ও কিরূপ অবস্থাতে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য, পূর্ব্বোক্ত বচনটী তাহার নিদর্শন স্বরূপ। সে বচনটী এইঃ—

Hold up my goings in thy paths that my footsteps slip not.—Ps. XVII-Ver 5.

অর্থঃ—"হে প্রভো! আমি যখন তোমার পথে চলিতে চেষ্টা করি, তখন তুমি আমাকে তুলিয়া ধর, যেন আমার চরণ স্খলিত না হয়।"

যত প্রকার সন্দেহে ধর্ম্মার্থীদিগের চিত্তকে আন্দোলিত করিয়া থাকে, প্রার্থনার আবশ্যকতা ও উপকারিতা বিষয়ক সন্দেহ তন্মধ্যে প্রধান। প্রার্থনার উপকারিতা বিষয়ে সন্দেহ জন্মিবার যথেষ্ট কারণ আছে। আমাদের সকলকেই একথার সাক্ষ্য দিতে হইবে যে, আমাদের অনেক প্রার্থনা বিফলে গিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত আমরা ঈশ্বরের নিকটে যত প্রার্থনা করিয়াছি, সে সমুদায় যদি পূর্ণ হইত, তবে আর ভাবনা ছিল না। মানুষ প্রার্থনা করে অনেক, কিন্তু তাহার মধ্যে সফল হয়

অতি অল্প! এ প্রশ্ন স্বতঃই হৃদয়ে উদিত হয় যে, এত প্রার্থনা বৃথা যায় কেন? দ্বিতীয়তঃ, অনেক স্থলে এরূপ দেখা যায় যে, দুইজন ধর্ম্মার্থীর মধ্যে একজনের জীবনে প্রার্থনার অতি আশ্চর্য্য ফল ফলে, আর একজনের জীবনে তাহার ফল কিছুই দৃষ্ট হয় না। দ্বিতীয় ব্যক্তি হয়ত বিশ বৎসর কিম্বা ত্রিশ বৎসর কাল ধর্ম্মসমাজের ক্রোড়ে পড়িয়া রহিয়াছেন, সাপ্তাহিক বা পারিবারিক উপাসনাতে রীতিমত যোগ দিয়া থাকেন, ধর্ম্মসমাজের বিধি সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করেন, এবং ঈশ্বর-চরণে নিত্য অনেক সুদীর্ঘ প্রার্থনা করিয়া থাকেন, অথচ তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনে উন্নতির বিশেষ কোনও লক্ষণ লক্ষিত হয় না। তিনি বিশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিলেন আজিও তাহাই রহিয়াছেন। সেই স্বার্থপর, ক্ষুদ্রাশয়, সংকীর্ণ চেতা ও অনুদার মানুষ রহিয়াছেন; সেই কামী, ক্রোধী, ঈর্ষাপরতন্ত্র লোক রহিয়াছেন; বিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাকে যিনি দেখিয়াছেন, তিনি যদি আজি আসিয়া দেখেন, হয়ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিবেন যেখানকার মানুষ সেখানেই রহিয়াছে। বিষয়াসক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই; জ্ঞান বা প্রেমের গভীরতা কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় নাই; চরিত্রে ভক্তির বিকাশ কিছুমাত্র হয় নাই। চিন্তা করিয়া দেখ কত ব্যক্তির জীবন সম্বন্ধে এ কথা সত্য। আবার এরূপ লোকও দেখিতেছি, যাঁহারা ব্যাকুল প্রার্থনার গুণে দিন দিন অগ্রসর হইয়া যাইতেছেন। এই উপাসনা ও প্রার্থনা তাঁহাদের জীবনে কি সুমিষ্ট ফলই প্রসব করিতেছে! প্রার্থনা যদি ধর্ম্মজীবন লাভের একটী প্রধান উপায় হয় তবে তাহার ফলে এত তার-

তম্য হয় কেন? একই ঈশ্বরের নাম ত দুই ব্যক্তিই করিয়া থাকেন, একই ধর্ম্মসমাজে ত দুইজনেই রহিয়াছেন এবং একই উপদেশ ত দুইজনেই শ্রবণ কে'ন, তবে এরূপ প্রভেদ কেন লক্ষ্য করি? এতদ্দ্বারা এই কথারই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সকল লোকে প্রার্থনার সমাধিকারী নহে। ভাষা রচনার শক্তি মানব মাত্রেরই আছে, সুতরাং ইহা দেও, তাহা দেও বলিয়া ঈশ্বরের নিকটে সকলেই প্রার্থনা জানাইতে পারে; কিন্তু সকল প্রার্থনা প্রার্থনা নয় এবং সকলে প্রার্থনার অধিকারীও নহে। তাহা যদি হইত তবে ঈশ্বরের নামের এত গৌরব থাকিত না; ধর্ম্মসাধনেরও প্রয়োজনীয়তা থাকিত না।

এক অর্থে ইহা সত্য যে সকলেই প্রার্থনার অধিকারী। কারণ এমন পাপী কেহই হইতে পারে না, যে ব্যক্তি প্রার্থনা করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে! অবশ্য একথা স্বীকার করি যে, ঈশ্বরের আরাধনা করিবার, বা তাঁহার সেবা করিবার বা তাঁহার স্বরূপ জানিবার পক্ষে অধিকার সকলের থাকে না। বিশেষ সাধনাদ্বারা এ সকল অধিকার লাভ করিতে হয়। কিন্তু প্রার্থনা সম্বন্ধে বরং একথা বলিতে পারা যায় যে, যে যত দরিদ্র, যে যত দুর্ব্বল, যে যত পতিত, সেই তত প্রার্থনার অধিকারী। যেমন দীন হীন ব্যক্তিগণেরই ধনীদিগের দয়াতে অধিকার, তেমনি পাপী তাপীদিগেরই পতিতপাবন পরমেশ্বরের কৃপাতে অধিকার। যে সন্তানটী গৃহে আছে তদপেক্ষা যেটী বিপথে গিয়াছে, তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্যই পিতার অধিক ব্যগ্রতা; সুতরাং সেটীর পিতার কৃপাতে অধিক অধিকার।

তথাপি এ কথাও সত্য যে, প্রার্থনার একটী বিশেষ ভাব আছে, ইহার বিশেষ কিছু নিময় আছে। দায়ুদের সঙ্গীতের মধ্যে বলা হইয়াছে,—"হে প্রভো ! যখন আমি তোমার পথে চলিতে চেষ্টা করি, তখন তুমি আমাকে তুলিয়া ধর।" অর্থাৎ আমি যখন নিরাশার হস্তে আত্ম-সমর্পণ না করিয়া যথাসাধ্য নিজ শক্তিকে প্রয়োগ করি, যখন আমি বদ্ধপরিকর হইয়া ধর্ম্মসংগ্রামে প্রবৃত্ত হই, তখন তুমি আমাকে সাহায্য কর। ইহার বিপরীত উক্তি বিষয়ে একবার চিন্তা কর। যখন আমি নিজে চেষ্টা না করি, যখন আমি যথাসাধ্য আত্মশক্তি প্রয়োগ না করি, তখন তুমি সাহায্য করিও না; তখন আমার তোমার নিকটে সাহায্য চাহিবার অধিকার নাই। কেমন চমৎকার কথা! যে সংগ্রাম করে, সেই সাহায্য পায়। যে ব্যক্তি উঠিতে চাহিতেছে, পাপ-পথ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইতেছে এবং তাহার জন্য দিবানিশি চেষ্টা করিতেছে, যতবারই পতিত হইতেছে ততবারই নব প্রতিজ্ঞা-বলে দৃঢ় হইয়া উঠিবার প্রয়াস পাইতেছে, তাহারই প্রার্থনা করিবার অধিকার আছে; তাহারই প্রার্থনা সফল হয়। ইহাই জগদীশ্বরের রাজ্যের নিয়ম। তিনি যেন মানুষকে বলিয়া থাকেন,—'তোমার যাহা করিবার কর, আমার যাহা করিবার করিতেছি।' তিনি কৃষককে বলিতেছেন,—"তুমি ভূমি কর্ষণ কর, আমি বারি বর্ষণ করিতেছি। তুমি যদি ভূমি কর্ষণ না কর, তুমি যদি মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া শ্রম না কর, তবে আমার করুণায় ফললাভ করিতে সমর্থ হইবে না। তোমার

যথাশক্তি তুমি কাজ কর, আমার যাহা করিবার তাহা আমি করিব। সে জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না।” এই নিয়মেই তাঁহার রাজ্য চলিতেছে, সর্ব্বত্রই তাঁহার এই একই কথা। তাঁহার কার্য্যের প্রণালীর বিষয়ে চিন্তা করিলে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়! যাঁহারা তর্ক করেন যে তিনি ত সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান, তবে তাঁহার দ্বারে প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন কি আছে? তাঁহারা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, কি জগতের ধন ধান্য উপার্জ্জনে, কি বিদ্যালাভে, কি ধর্ম্মসাধনে সর্ব্ব বিষয়েই মানবের উন্নতিকে তিনি কিরূপ শ্রমসাধ্য ও সাধনাসাপেক্ষ কয়িয়া রাখিয়াছেন। যদ্দ্বারা আমাদের শারীরিক অভাব সকল পরিপূরিত হইতে পারে, সে সকল সামগ্রী এই ধরাগর্ভে বা ধরাপৃষ্ঠে বিদ্যমান; যে জ্ঞানের দ্বারা আমাদের অজ্ঞতা নিবারিত হইতে পারে, সেই জ্ঞানের উপকরণ-সামগ্রী সকলও এই জগৎ গ্রন্থ ও মানব-প্রকৃতিরূপ গ্রন্থ, এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যেই নিবদ্ধ রহিয়াছে; যদ্দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা যাইতে পারে, এরূপ তত্ত্ব সকল আত্মরাজ্যেই নিহিত রহিয়াছে। অন্বেষণ কর, আবিষ্কার কর, আয়ত্ত কর, সাধনার দ্বারা নিজস্ব কর, সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। কুক্কুটী যেমন পদদ্বারা মৃত্তিকা খুঁড়িয়া সন্তানের খাদ্য দ্রব্য নিজেই চাপা দিয়া রাখে, অভিপ্রায় এই, সন্তান নিজে অন্বেষণ করিয়া তাহা আবিষ্কার করুক ও ভোগ করুক তদ্দ্বারা তাহার বুদ্ধি কৌশলের বিকাশ হইবে; সেইরূপ জগতের মাতাও যেন খনির গর্ভে মণিকে, সাগরের গর্ভে মুক্তাকে, সৃষ্টি-প্রপঞ্চের পশ্চাতে

জ্ঞানকে ও আত্মতত্ত্বের নিম্নস্তরে অধ্যাত্ম-বিদ্যাকে চাপা দিয়া রাখিয়াছেন, অন্বেষণ কর, তবে তাহা মিলিবে। তোমার সাধ্যে যাহা হয় কর, ঈশ্বরের করুণা তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

আবার বলি ঃ—যে মানুষ সংগ্রাম করে, যে ব্যক্তি আপনার শক্তি সকলকে খাটাইতে চায়, যে ব্যক্তি মস্তকের ঘর্ম্মবিন্দু পায়ে ফেলিয়া উঠিবার জন্য চেষ্টা করে, তাহারই প্রার্থনা করিবার অধিকার আছে ; তাহারই প্রার্থনা তাঁহার চরণে গৃহীত হয়। আর যে চেষ্টা করে না, যে ব্যক্তি সুখের বালিশে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইতে চায়, ঈশ্বরের করুণা তাহার জন্য নহে। একথার আলোচনা আমরা অনেকবার করিয়াছি, যে প্রার্থনার একটা দায়িত্ব আছে। ইহার একটী দৃষ্টান্ত একবার এই বেদী হইতে দেওয়া হইয়াছিল। মনে কর, একজন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট লেপ্টনেণ্ট গভর্ণরকে তারযোগে প্রার্থনা জানাইলেন,—"শীঘ্র একদল সৈন্য প্রেরণ করুন, এখানে প্রজারা বিদ্রোহী হইবার আশঙ্কা"—অথচ লেপ্টনেণ্ট গভর্ণরের প্রেরিত সৈন্যদল যখন যথাস্থানে উপস্থিত হইল, তখন শুনিল যে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব শিকার খেলিতে গিয়াছেন। তাহা হইলে সেই সেনাদলের সেনাপতির মনে কি প্রকার ভাব হয়? তিনি কি মনে করেন না বিদ্রোহের আশঙ্কা সর্ব্বৈব মিথ্যা। কারণ সে আশঙ্কা যদি যথার্থ হইত তাহা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট শিকার খেলিতে যাইতে পারিতেন না ; কিন্তু নিজের হস্তে যে কিছু সৈন্য সামন্ত ছিল, তাহা লইয়া কোনও প্রকারে মহারাণীর

রাজ্য রক্ষা করিবার উপায় করিতেন। অথবা মনে কর কোনও স্থানের কয়েক জন ভদ্রলোক রাজপুরুষদিগের নিকটে এই আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, প্রজাদিগের মহা অন্নকষ্ট ঘটিয়াছে। দলে দলে লোক সাহায্যের অভাবে মারা পড়িতেছে। অথচ রাজ-পুরুষদিগের নিযুক্ত কর্ম্মচারী গিয়া দেখিলেন যে, আবেদন কারীদিগের মধ্যে অনেকেই ধনবান্ লোক অথচ কেহও এক কপর্দ্দকও দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থ দেন নাই; তখন তাঁহাদের সেই আবেদনের প্রতি কাহারও আস্থা থাকে কিনা ও সে প্রার্থনা পূর্ণ করিতে ইচ্ছা হয় কিনা? সেইরূপ ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে আমি যাহা চাহিতেছি সে সম্বন্ধে আমার যাহা করণীয় আছে, তাহা করিতেছি কিনা? তাহা না হইলে আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবে না।

এ স্থানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে আধ্যাত্মিক আলস্য বলিয়া এক প্রকার অবস্থা আছে। যেমন অনেক শ্রম-বিমুখ ছাত্র আলস্যবশতঃ অভিধান দেখিতে চায় না, শ্রম করিতে চায় না, অথচ বিদ্যা লাভ করিতে চায়, তেমনি অনেক ধর্ম্মার্থীও বিনা পরিশ্রমে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে চায়। মণি মুক্তা যেমন শ্রম বিনা লাভ করা যায় না, তেমনি পরমার্থ-তত্ত্বও বিনাশ্রমে কেহ লাভ করিতে পারে না। সংশয়, নিরাশা, প্রবৃত্তিকুলের বিদ্রোহিতা প্রভৃতি অনেক বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তবে আনন্দ-ধামে উপনীত হইতে হয়। যে সকল তত্ত্বের উপরে ধর্ম্ম প্রতি-ষ্ঠিত তাহার এক একটীকে অধিগত করিতে কত শত জ্ঞানীর

কত বৎসর অতীত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে,তথাপিতাঁহারা অন্ধকারের পরপারে জ্যোতির্ম্ময় ধাম দেখিতে পাইতেছেন না। উপনিষদকার ঋষি যে বলিয়াছেনঃ—"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"—"আমি অন্ধকারের পরপারে, এই আদিত্যবৎ উজ্জ্বল মহান্ পুরুষকে দেখিয়াছি।" ইহা কি সামান্য সাধনের ফল? "অন্ধকারের পরপারে," এই কথাগুলির মধ্যে কি গভীর সংগ্রামের ইতিবৃত্ত লুক্কায়িত রহিয়াছে! তুমি যদি অন্ধকার ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে ভয় পাও, যদি সংশয় ও নিরাশার আন্দোলন সহিতে অসমর্থ হও, তবে সে জ্যোতির্ম্ময় ধাম তোমার জন্য নহে। যাহাদের প্রকৃতিতে আধ্যাত্মিক আলস্য প্রবল, ও শ্রম-বিমুখতা স্বাভাবিক. তাহারা সর্ব্বদাই ধর্ম্মের একটা সহজ পথ অন্বেষণ করিয়া থাকে। তাহাদের মন সর্ব্বদাই বলিতেছে, যদি এমন একটা পথ পাওয়া যায়, এমন একটা মানুষ পাওয়া যায়, যাহা পাইলে আর এই সংশয় ও নিরাশার আন্দোলন সহ্য করিতে হয় না, প্রবৃত্তিকুলের আঘাতে অস্থির হইতে হয় না, খনির অন্ধকার গর্ভে প্রবেশ করিয়া রত্ন অন্বেষণ করিতে হয় না, তাহা হইলে বাঁচিয়া যাই। আমাদের সকলেরই মন কি সময়ে সময়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলে না,—"আর এ সংগ্রাম ভাল লাগে না; একবার উঠা আবার পড়া, এ যাতনা আর সহ্য হয় না; যদি এমন একজন মানুষ পাই, যাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিলে এই কঠোর সংগ্রাম হইতে জন্মের মত বাঁচিয়া যাই, তাহা হইলে এখনি তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করি।" ঈশ্বরকে

ধন্যবাদ যে এরূপ দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্ত আমাদের জীবনে স্থায়ী হয় না। আমরা পরক্ষণেই চিন্তা করি, যে বিধাতা ধর্ম্ম-ধনের ন্যায় পরম ধনকে বহু শ্রমসাধ্য করিয়াছেন, সংগ্রামে কাতর হইলে চলিবে না। অমনি সে দুর্ব্বলতা চলিয়া যায়। যাঁহারা আধ্যাত্মিক আলস্যবশতঃ নিজের শ্রমের ভার পরের স্কন্ধে দিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে চান, তাঁহাদের বিষয় চিন্তা করিলে একটী দৃষ্টান্তের কথা মনে পড়ে। আমরা এই মহা নগরের রাজপথে অনেকবার দেখিয়াছি, কয়েকটী শিশু একখানি ছোট টানা-গাড়িতে বসিয়াছে, এবং একটী প্রাপ্ত-বয়স্ক বালক সেই গাড়ির রজ্জু ধরিয়া তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। শিশুগণ তাহাদের ঝুমঝুমী লালা-রসযুক্ত করিতে করিতে মনের আনন্দে চলিয়াছে। ধর্ম্ম-জগতে এরূপ ঝুম্‌ঝুমী লালা-রসযুক্ত করিতে করিতে স্বর্গে যাইবার উপায় নাই। কোনও বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির হস্তে টানাগাড়ির রজ্জু দিয়া, নিজেরা নিশ্চিন্ত মনে সেই গাড়ীতে বসিয়া যে ব্রহ্মধামে যাইব তাহার পথ নাই। নিজে শ্রম করিতেই হইবে, তদ্ভিন্ন ধর্ম্ম-ধন লাভ হইবে না, এই বিধাতার নিয়ম। অলস ও শ্রমকাতর ব্যক্তি প্রকৃত প্রার্থনা করিতে পারে না।

যেমন প্রত্যেক বৃক্ষের জন্ম ও বিকাশ দুইটী পদার্থের বিদ্যমানতার উপরে নির্ভর করে, পৃথিবী হইতে রস ও আকাশ হইতে বায়ু ও উত্তাপ, তেমনি প্রত্যেক মানবাত্মার উন্নতি ও বিকাশ দুইটী শক্তির বিদ্যমানতার উপরে নির্ভর করে, আত্ম-প্রভাব ও দেব-প্রসাদ। জগদীশ্বর সর্ব্ববিধ কার্য্যে আমাদিগকে

তাঁহার সহচর অনুচর করিতে চাহিতেছেন। তিনি বলিতে-ছেন,—"উঠ, উঠ, এই কাজটা করিতে হইবে, ত্বরায় আমার সহায় হও, তোমার সাধ্যে যাহা হয় তুমি কর, আমার যাহা করিবার আমি করিতেছি।" আমাদের ধর্ম্মজীবনের উন্নতি বিষয়েও তাঁহার সেই কথা। আবার ব্যক্তিগত জীবনে যেরূপ আত্ম-প্রভাব ও দেব-প্রসাদ উভয়েরই প্রয়োজন, সামাজিক জীবনেও সেইরূপ। সমাজের উন্নতি ও কল্যাণ যদি দেখিতে চাও, তবে অবিশ্রান্ত ঈশ্বর-চরাণে প্রার্থনা কর। কিন্তু প্রার্থনাতে অধিকারী হইবার পূর্ব্বে নিজ নিজ জীবনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের যাহা কর্ত্তব্য আছে, প্রত্যেকের নিজ সাধ্যে যাহা হয় তাহা সম্পাদন কর। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে কর, তুমি কি সমাজ মধ্যে সর্ব্বত্যাগী পুরুষ সকল দেখিতে চাহিতেছ? তবে অগ্রে আপনাকে ঈশ্বর-চরণে অর্পণ করিয়া পরে প্রার্থনা কর, আমা-দিগের মধ্যে সর্ব্বত্যাগী পুরুষ সকলকে প্রেরণ কর। তুমি কি সমাজ মধ্যে আরও ভ্রাতৃপ্রেম দেখিতে চাহিতেছ? তবে নিজের হৃদয় পরীক্ষা কর, যদি সেখানে অক্ষমা থাকে, তাহাকে বিদায় কর, নিজে ক্ষমা কর, যাঁহাদিগকে বিরুদ্ধ চক্ষে দেখিতেছ তাঁহাদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিবার চেষ্টা কর, অপরের বিরোধ ভঞ্জনে ও প্রীতির স্থাপনে উৎসাহী হও, আর সেই সঙ্গে প্রার্থনা কর,—"আমাদিগকে ক্ষমাশীল কর, আমাদিগের মধ্যে শান্তি ও প্রীতিকে স্থাপন কর।" ইত্যাদি।

কিন্তু এই যে আত্ম-প্রভাব ও দেব-প্রসাদের কথা বলা যাইতেছে, ইহার মধ্যে একটী বিষয়ের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি

রাখিতে হইবে। আত্মোন্নতির জন্য আমার যাহা করিবার আছে, আমি তাহা করিবার জন্য দায়ী, এই ভাবের পথে একটী বিপদ আছে। এ জ্ঞান সহজেই জন্মিতে পারে যে আত্মোন্নতি সম্পূর্ণভাবে আমারই উপর নির্ভর করিতেছে। আমাদিগকে সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে ব্রহ্মকৃপার উপরে নির্ভর রাখিতে হইবে। এদেশীয় কৃষক যেমন হল-চালনা করিবার সময়ে নিশ্চয় জানে যে, দেবতা যদি প্রসন্ন না হন, সুসময়ে বর্ষার বারিধারা যদি না পাওয়া যায়, তবে তাহার ভূমি কর্ষণের শ্রম বৃথা ; আমরা যেন সেইরূপ সর্ব্বদা স্মরণ রাখি, ব্রহ্মকৃপার সহায়তা ভিন্ন আমাদের শ্রম কিছুই নহে। যেখানে পূর্ণ শ্রমের সঙ্গে পূর্ণ নির্ভর বাস করে, সেখানেই প্রকৃত ধর্ম্ম ভাব। ধন বল, বিদ্যা বল, সকল বিষয়েই যেমন শ্রম ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন, পরমার্থ লাভ সম্বন্ধেও তেমনি শ্রম ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। শ্রমকাতর ও অসহিষ্ণু ব্যক্তিগণ কোনও বিষয়েই কৃতকার্য্য হইতে পারে না। শ্রমকাতর ব্যক্তিগণ ধর্ম্ম-ধন লাভেও সমর্থ হয় না। এই জন্যই উপনিষদকার ঋষিগণ বলিয়াছেন,—"নায়মাত্মা বল-হীনেন লভ্যঃ"—"এই পরমাত্মা বলহীন ব্যক্তির লভ্য নহেন।" ধর্ম্মধন লাভ বিষয়ে কিরূপ শ্রম ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন, তাহাও আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে ঋষিগণ অতি উৎকৃষ্টাদৃষ্টান্ত দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—"ধর্ম্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াৎ বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ।" "পুত্তিকারা যে প্রকার শনৈঃ শনৈঃ তাহাদের বল্মীক নির্ম্মাণ করে, তেমনি শনৈঃ শনৈঃ ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে"। ধর্ম্মসাধন বিষয়ে পুত্তিকাদিগের ন্যায় আমাদের শ্রমশীলতা ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন।

অধ্যাত্ম-যোগ।

(প্রথম উপদেশ।)

"তন্দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং,
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরোহর্ষশোকৌ জহাতি।"

উপনিষদ—

অর্থ—"সেই দুর্দ্দর্শ পুরাতন পুরুষ হৃদয়-গুহাতে গূঢ়রূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, ধীর ব্যক্তি আধ্যাত্ম-যোগ দ্বারা তাঁহাকে জানিয়া হর্ষ ও শোককে অতিক্রম করিয়া থাকেন।"

আমাদের হৃদয়ে যে হর্ষ শোকের তরঙ্গ সকল উত্থিত হয়, তাহাদের প্রকৃতি বিষয়ে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেই আমরা মানব হৃদয়ের ভাব সকলের কয়েকটী স্বধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া থাকি।

ভাবের প্রথম স্বধর্ম্ম এই যে, ইহা পরিবর্ত্তনশীল। আমরা যদি প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবন পরীক্ষা করি, তাহা হইলে কি এই কথার প্রমাণ প্রাপ্ত হই না? এই জীবনে কতবার কত ভাব রাজত্ব করিয়াছে, আবার কালক্রমে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। কত বন্ধুতা, কত প্রণয় হইল আবার ভাঙ্গিয়া গেল; কত আকাঙ্ক্ষা হৃদয়কে দুই চারি মাস অধিকার করিয়া থাকিল, আবার হৃদয়কে পরিত্যাগ করিল! একজন ব্যক্তি ধর্ম্মজীবনের নবানুরাগের সময় সঙ্কল্প করিলেন যে, ব্রাহ্ম-সমাজের সেবাতে আপনাকে অর্পণ করিবেন, সেইভাবে কিছু-

কাল চলিলেন, আবার কালক্রমে সে ভাব জুড়াইয়া গেল; তিনি অপর দশ জনের ন্যায় সংসার-সেবাতেই রত হইলেন। ভাবের এই পরিবর্ত্তনশীলতার কথা স্মরণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। অনেক সময় প্রাতে যে ভাব হৃদয়ে প্রবল দেখি, সায়ং-কালে আর তাহার চিহ্নও পাই না। প্রাতঃকালে উপাসনা এমনি মিষ্ট লাগিল যে, দেহ মন প্রাণ ঈশ্বর-চরণে অর্পণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ইচ্ছাধীন হইবার প্রবৃত্তি মনে প্রবল হইতে লাগিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, দিন অবসান হইতে না হইতে দেখি হৃদয়ের প্রেম শুকাইয়া গিয়াছে; উপাসনার সে মধুরতা নাই; সে আত্মসমর্পণের ভাবও আর নাই। রাত্রি-কালে রজনীর অন্ধকারে একাকী শয়ন করিয়া কোনও ব্যক্তি বিশেষের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মনে হইল, তাহার প্রতি অনুচিত ব্যবহার করিয়াছি। মনে অনুতাপের উদয় হইতে লাগিল, এবং মনে এ প্রকার আবেগ উপস্থিত হইতে লাগিল, যেন সেই মুহূর্ত্তে তাঁহাকে নিকটে পাইলে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। মনের আবেগে সঙ্কল্প করিলাম যে প্রাতে উঠিয়া প্রথমে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব। কিন্তু পূর্ব্বা-কাশে ঊষালোক প্রকাশ পাইতে না পাইতে, সেই মানসিক আবেগ নৈশ কুজ্ঝটিকা জালের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। প্রাতে সেই ব্যক্তিকে দেখিলাম, ক্ষমা চাহিবার প্রবৃত্তি হইল না।

ব্যক্তিগত ভাবে যেরূপ, সামাজিক ভাবেও সেইরূপ। জনসমাজের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলেও দেখা যায় যে, এক একটী

ভাব এক এক সময়ে এক এক জাতির মনে প্রবল ভাবে রাজত্ব করিয়াছে। সেই ভাব বিশেষের উত্তেজনাতে বহুসংখ্যক নরনারী উন্মাদ-রোগগ্রস্তের ন্যায় কার্য্য করিয়াছে। কিন্তু সে ভাব অধিক কাল থাকে নাই। সাগরের তরঙ্গ যেমন বায়ুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সাগর-গর্ভে বিলীন হয়, তেমনি সে ভাব-তরঙ্গ সমাজ-গর্ভে পুনরায় বিলীন হইয়াছে; এবং কাল-ক্রমে সমাজ মধ্যে আর সে ভাবের চিহ্ন ও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। এইরূপ যতই চিন্তা করা যাইবে ততই দেখা যাইবে যে, আমাদের ভাব সকলের ন্যায় ক্ষণিক অস্থায়ী ও পরিবর্ত্তনশীল পদার্থ অল্পই আছে।

ভাবের আর একটা স্বধর্ম্ম এই যে, ইহার হ্রাস বৃদ্ধি আছে। কেবল যে এক কালের এক প্রকার ভাব সময়ান্তরে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় তাহা নহে, একই ভাবের হ্রাস বৃদ্ধি দেখা যায়। ইহা আমরা প্রতিদিন প্রত্যেক গৃহে লক্ষ্য করিতেছি। অতপ্য-বাৎসল্য ও দাম্পত্য প্রেম, এই দুইটীর ন্যায় আমাদের সুপরি-চিত ভাব আর নাই। এই অপত্যবাৎসল্য ও দাম্পত্য প্রেমে আমরা দুই প্রকার অবস্থা দেখিতে পাই। কোনও সময়ে বা জননীর আচরণ দেখিয়া বোধ হইতেছে, তাঁহার অপত্যবাৎসল্য নামমাত্র আছে। সন্তান কাঁদিতেছে, অঞ্চল ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে, জননী গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিয়া তাহার প্রতি একবার ফিরিয়াও দেখিতেছেন না, বরং রোরুদ্যমান শিশুর হস্ত হইতে স্বীয় অঞ্চল আকর্ষণ পূর্ব্বক কার্য্যান্তরে গমন করিতেছেন। দেখিয়া মনে হইতে পারে, কবিরা যে মাতৃস্নেহের বর্ণনা করিয়া-

ছেন, তাহা কোথায় ? তাহা কি সকলি অত্যুক্তি ? কিন্তু আবার সময়ান্তরে দেখিতেছি, যে জননী সেই শিশুকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিতেছেন এবং তাহাকে স্নেহের বন্যাতে ডুবাইয়া দিতেছেন ! মাতৃস্নেহ উছলিয়া পড়িতেছে ! দাম্পত্য প্রেমেও এইরূপ ; এক সময়ে পতি কার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছেন সমীপাগতা পত্নীর কথা শুনিয়াও শুনিতেছেন না, এমন কি হয় ত "আঃ কি কর" বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতেছেন। সময়ান্তরে আবার সেই পত্নীকে ভালবাসার তরঙ্গে ডুবাইয়া দিতেছেন। ইহা প্রত্যেকেই স্বীয় স্বীয় জীবনে ও অপরের জীবনে প্রতিদিন লক্ষ্য করিতেছেন। কেন যে ভাববিশেষের হ্রাস বৃদ্ধি হয়, ভাবস্রোতে জোয়ার ভাঁটা খেলে, তাহা আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করিতে পারি না। মাতৃস্নেহের যে উচ্ছ্বাসের কথা অগ্রে উল্লেখ করা গিয়াছে, সে উচ্ছ্বাস যে কেন এক মুহূর্ত্তে আবির্ভূত হয় এবং অপর মুহূর্ত্তে হয় না তাহা নির্ণয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখা যায়, যে অতি সামান্য কারণেই ঐ উচ্ছ্বাস অনেক সময়ে ঘটিয়া থাকে। শিশু টলিতে টলিতে আসিয়া তাহার অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত ভাষাতে এমন একটী শব্দ উচ্চারণ করিল যাহা জননীর কর্ণে অতীব মিষ্ট বোধ হইল, অমনি সেই শিশুর প্রতি তাঁহার স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। অথবা সে জননীর প্রতি নিজের ভালবাসা সূচক একটী কোনও সামান্য কার্য্য করিল, যাহাতে জননীর ভালবাসা একেবারে লম্ফ দিয়া উঠিল।এ বিষয়ে ভাবের প্রকৃতি বায়ুতাড়িত জলের প্রকৃতি হইতে কিছুমাত্র বিভিন্ন নহে।

এই দেখিতেছি নদীবক্ষে জলরাশি ধীর স্থির রহিয়াছে, দেখিতে দেখিতে কোন দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া আসিল অমনি সেই ধীর স্থির জলরাশি নৃত্য করিয়া উঠিল। ভাবের এই জোয়ার ভাঁটাতে আমরা নিরন্তর আন্দোলিত হইতেছি।

ভাবে তৃতীয় স্বধর্ম্ম ইহা সংক্রামক। ইহা সংস্পর্শ নিবন্ধন এক হৃদয় হইতে হৃদয়ান্তরে গিয়া থাকে। ভাবের সংক্রামকতা যে কিরূপ আশ্চর্য্য তাহা স্মরণ করিলে অবাক্ হইতে হয়। জগতে দশজনে মিলিয়া যত কিছু সদনুষ্ঠান হইতেছে, তাহার সকলেরই মূলে ভাবের সংক্রামকতা বিদ্যমান রহিয়াছে। এক হৃদয়ের উৎসাহ, দশ হৃদয়ে ছড়াইয়া পড়িতেছে। জগতের মহাজনগণ এক এক জনে মানব সমাজে যে সুমহৎ বিপ্লব উৎপন্ন করিয়াছিলেন, তাহারও মূলে এই ভাবের সংক্রামকতা। ইতিবৃত্তে দেখিতে পাই, ভাবের এই সংক্রামকতা নিবন্ধন এক এক দেশের সমস্ত প্রজা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে; তুমুল রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে। ১৮৫৭ সালে এদেশে যে সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল তাহার মূলে এই ভ্রান্ত সংস্কার বিদ্যমান ছিল, যে ইংরাজগণ ছলে বলে এদেশের লোকের জাতি ও ধর্ম্ম নষ্ট করিতে চান। এ প্রকার সংস্কারের কোনও মূল ছিল না। তথাপি এই সংস্কার ও তজ্জনিত বিদ্বেষবুদ্ধি দশ হৃদয় হইতে শত হৃদয়ে, শত হৃদয় হইতে সহস্র সহস্র হৃদয়ে ছড়াইয়া পড়িল, ও দেখিতে দেখিতে প্রকাণ্ড বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিল। ইহা অপেক্ষা ভাবের সংক্রামকতার উৎকৃষ্ট-তর উদাহরণ আর কি দেওয়া যাইতে পারে।

অতএব আমরা দেখিতেছি ভাব ত্রিবিধ গুণসম্পন্ন ;—ভাব পরিবর্ত্তনশীল, ভাব হ্রাস-বৃদ্ধি-সহ ও ভাব সংক্রামক। জ্ঞান এ প্রকার নহে। জ্ঞানে পরিবর্ত্তন নাই, হ্রাস বৃদ্ধি নাই, সংক্রামকতা নাই। মনে কর তুমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছ যে দুই প্রকার বাষ্পের সংযোগে জলের উৎপত্তি হয়। তুমি যত দিন বাতুল না হইতেছ, বা অন্য কোনও কারণে স্মৃতি-শক্তি-বিহীন না হইতেছে, ততদিন এ জ্ঞান কি প্রকারে তোমার চিত্ত হইতে বিলুপ্ত হইতে পারে ? বা অন্য আকারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে ? যদি মৃত্যু শয্যাতে শয়ানও হয় তথাপি এ জ্ঞান তোমার চিত্তকে অধিকার করিয়া থাকিবে এবং তোমাকে সেই একই সাক্ষ্য দিতে হইবে। এইরূপ জ্ঞানে হ্রাস বৃদ্ধি নাই। জ্ঞান সংক্রামকও নহে ; অর্থাৎ সংস্পর্শ নিবন্ধন এক চিত্ত হইতে অপর চিত্তে যায় না। জ্ঞান গুরু হইতে শিষ্যে গমন করে বটে, কিন্তু তাহা সংস্পর্শ নিবন্ধন নহে, শিক্ষা নিবন্ধন, অর্থাৎ শিষ্যকে জ্ঞানার্জ্জনীবৃত্তি-নিচয়ের চালনা দ্বারা সে জ্ঞানকে লাভ করিতে হয়।

আমরা আত্মার বহির্ভাগ দ্বারা জগতকে ও জনসমাজকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছি, অন্তর্ভাগ দ্বারা ধর্ম্মজগতকে ও পরমাত্মাকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছি। আমাদের অধিকাংশ হর্ষ ও বিষাদ সম্পূর্ণ বাহিরের পদার্থ। অনেক সময়ে দেখি বাহিরে যখন যেরূপ বায়ু উঠিতেছে, আমাদের হৃদয়সাগরেও তদনুরূপ তরঙ্গ উঠিতেছে। আমরা নিরন্তর ভাবের দোলায় দুলিতেছি। শিশুরা অনেক সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া বিবাদ করে ও

মহা দুঃখ ভোগ করে। একটী ভগ্ন কাচ খণ্ডের জন্য এত শোক করে যে, রাজ্যেশ্বর রাজাদিগের সমগ্র রাজ্যটী বিনষ্ট হইলেও যেন তত দুঃখ হয় না। শিশুদিগের এই দুঃখ দেখিয়া প্রবীণেরা অনেক সময়ে কৌতুক করিয়া থাকেন। কিন্তু জ্ঞানীদিগের দৃষ্টিতে জগতের অধিকাংশ বয়ঃপ্রাপ্ত নরনারীর দুঃখ ও এইরূপ অতি সামান্য বিষয়ের জন্য দুঃখ বই আর কিছুই নহে। উপনিষদকার ঋষিগণ বলিয়াছেন—"বালকেরাই নিকৃষ্ট কামনার বিষয়ে আসক্ত হইয়া বিস্তীর্ণ মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হয়।" তাঁহারা অধিকাংশ বিষয়ী লোককে এই বালকশ্রেণীর মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। বাস্তবিক আমাদের অধিকাংশ হর্ষ ও বিষাদ বালকের হর্ষ বিষাদের ন্যায় ক্ষুদ্র-কামনা-সম্ভূত। এই সকল হর্ষ ও বিষাদ পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ-ধর্ম্ম-সম্পন্ন। ইহারা পরিবর্ত্তনশীল, হ্রাস-বৃদ্ধি-সহ ও সংক্রামক। এই সকল অস্থায়ী ভাব-তরঙ্গের আঘাতে আমাদের চিত্ত সর্ব্বদাই চঞ্চল হইতেছে। চিত্তের চঞ্চলতা-নিবন্ধন আমরা অনেক সময়ে জীবনের সুখও ভাল করিয়া ভোগ করিতে পারিতেছি না, নিজ নিজ কার্ত্তব্যও সুচারুরূপে সাধন করিতে পারিতেছি না, এবং ঈশ্বরের শ্রমন মননেও সমুচিতরূপে নিযুক্ত হইতে পারিতেছি না। স্থিরচিত্ততা না হইলে জীবনের সুখটাও ভাল করিয়া ভোগ করা যায় না। যদি তুমি একটী কুকুরকে ডাকিয়া এক মুষ্টি অন্ন দেও, কিন্তু অদূরে ইষ্টক হস্তে একটী বালক দণ্ডায়মান থাকে, তবে কি সে স্বচ্ছন্দচিত্তে সেই অন্ন মুষ্টি আহার করিতে পারে? ভয়জনিত উদ্বেগে তাহার আহারের সুখ অর্দ্ধেকেরও

অধিক নষ্ট করিয়া ফেলে। সেইরূপ জানিও প্রসন্ন ও সুস্থির-চিত্ত না হইলে জীবনের সুখও ভাল করিয়া ভোগ করা যায় না। জীবনের কর্ত্তব্যপালন ও ঈশ্বরের শ্রমন মনন ত পরের কথা। ঈশ্বরের উপাসনা মন্দিরের বায়ু প্রশান্ত ও সুগন্ধি। বাহিরের আন্দোলন ও তরঙ্গ সেখানে নাই, বাহিরের উত্তাপও সেখানে নাই। স্থির ও প্রশান্ত মন্দিরে প্রেমালোকে তাঁহাকে দর্শন করিতে হয়। আত্মার সেই অন্তঃপুর অতি নির্জ্জন পুর। আমরা যতক্ষণ বহিঃপ্রাঙ্গণে থাকি ততক্ষণ হর্ষ শোকের আন্দোলন অনুভব করি। সে আন্দোলনকে অতিক্রম না করিলে সে পুরে প্রবেশ করিতে পারা যায় না।

এই জন্যই উপনিষদকার ঋষিগণের ন্যায় সর্ব্বদেশের সাধু-গণ এই চিন্তা করিয়াছেন যে, এই হর্ষ শোকের আন্দোলন ও আঘাতকে অতিক্রম করা যায় কিরূপে? এমন কি কোনও সঙ্কেত আছে যাহা একবার জানিলে এই ভাবের পরিবর্ত্তন, হ্রাস বৃদ্ধি ও সংক্রামকতার মধ্যে একটা স্থির ভূমি প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটী সঙ্কেত এই যে, আমাদের ঈশ্বর-প্রীতিকে সত্য জ্ঞানের ভিত্তির উপরে স্থাপন করিতে হইবে। সর্ব্বত্র ও সর্ব্ব-বিষয়ে সত্য জ্ঞান প্রত্যক্ষ-জনিত। জ্ঞান দুই প্রকার আছে,— প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ: পরোক্ষ জ্ঞান পরাধীন, প্রত্যক্ষ জ্ঞান স্বাধীন। যাহা তুমি শুনিয়া জানিয়াছ, তাহার জন্য তোমাকে সর্ব্বদাই পরের উপরে নির্ভর করিতে হয়। সর্ব্বদাই অমুক গুরুর মুখে শুনিয়াছি বা অমুক শাস্ত্রে আছে এইরূপ পরের দোহাই দিতে হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রকৃতি অন্য

প্রকার। "নেহাভিক্রম নাশোস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে"—"এ জ্ঞানে অভিক্রম বা নাশ নাই অথবা কোনও প্রত্যবায় নাই।" তাহা তোমার নিজস্ব ধন, আপনার সম্পত্তি, সজন নির্জ্জনের সঙ্গী। ব্রহ্ম বিষয়ে যদি এরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা হইলে আর বাহিরের হর্ষ শোকের তরঙ্গের উপরে নিরন্তর আন্দোলিত হইতে হয় না। তখন ধর্ম্মভাব ধর্ম্মজীবন অপর দশজনের ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মজীবনের সংস্পর্শের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে না। তুমি যেখানেই থাক, তোমার অন্তরে এমন একটী কূপ রহিয়াছে, যাহা হইতে সুস্নিগ্ধ বারি সর্ব্বদাই উঠিতেছে। আমরা যতদিন এইরূপ স্বাধীন ও অক্ষয় ধর্ম্ম-জীবন লাভ করিতে না পারি, ততদিন নিরাপদ নহি। ততদিন হর্ষ শোকের বাহিরের তরঙ্গের উপর আন্দোলিত হওয়া আমা-দের পক্ষে অনিবার্য্য। সকল বিষয়েই মানুষ স্বাধীন বস্তু চায়। এমন বিদ্যা লইয়া কে সন্তুষ্ট হয় যে বিদ্যার জন্য সর্ব্বদাই অপরের নিকট যাইতে হয়। যে বিদ্যা আত্মার জ্ঞান-সম্পত্তিকে বৃদ্ধি করে, বুদ্ধি বৃত্তিকে মার্জ্জিত করে, বিচার শক্তিকে বিকাশ করে ও কার্য্যকুশলতাকে উৎপন্ন করে, তাহাই স্বাধীন বিদ্যা। নতুবা যে বিদ্যা দ্বারা মানবের বুদ্ধি-বৃত্তি মার্জ্জিত না হইয়া আরও জড়িত হয়, যদ্দ্বারা বিচার শক্তি সবল না হইয়া বরং খঞ্জ হইয়া যায়, যদ্বারা সংসারের কোনও ইষ্ট সাধন করিতে পারা যায় না, যাহার প্রয়োগের জন্য সর্ব্বদাই গ্রন্থ বিশেষের বা মনুষ্য বিশেষের শরণাপন্ন হইতে হয়, তাহা স্বাধীন বিদ্যা নহে। যে ধন নিজে যথেচ্ছ ব্যবহার

করিতে পারা যায় না, তাহা স্বাধীন ধন নহে। ধর্ম্ম বিষয়েও সেইরূপ। যে ধর্ম্ম আমার চরিত্রের সম্পত্তি, যাহা আমার জ্ঞানে, প্রেমে, অনুষ্ঠানে অনুপ্রবিষ্ট, যাহা আমার আত্মার ও জীবনের অন্ন পান-স্বরূপ তাহাই আমার স্বাধীন বস্তু। এইরূপ ধর্ম্মই প্রার্থনীয়।

অধ্যাত্ম-যোগ।

(দ্বিতীয় উপদেশ)

"তন্দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং,
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরোহর্ষশোকৌ জহাতি।"

উপনিষদঃ—

অর্থ—"সেই দুর্দ্দর্শ পুরাতন পুরুষ হৃদয়-গুহাতে গূঢ়রূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন. ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্মযোগ দ্বারা তাঁহাকে জানিয়া হর্ষ ও শোককে অতিক্রম করিয়া থাকেন।"

যে অধ্যাত্ম-যোগ দ্বারা ঈশ্বরকে জানিতে হইবে, সে অধ্যাত্ম-যোগ বস্তুটা কি? প্রথম দেখা যাউক, আমরা যোগ বলিলে কি বুঝি। যোগের প্রথম অর্থ সন্নিকর্ষ বা সংস্পর্শ। দুইটী বস্তুর মধ্যে যে ব্যবধান আছে, তাহা যখন অন্তর্হিত হইতে থাকে, যেখানে দশ হস্ত পরিমাণ ব্যবধান ছিল, সেখানে যখন পাঁচ হস্ত হইল, সেই পাঁচ হস্ত যখন আবার দুই হস্ত হইল, দুই হস্ত অর্দ্ধ হস্ত হইল, তখন আমরা বলি উক্ত উভয় পদার্থ পরস্পরের সন্নিকৃষ্ট হইতেছে। অবশেষে সে ব্যবধানও যখন একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল, আমরা বলিলাম, তাহারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইল। বলা বাহুল্য যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে যোগ তাহা এরূপ কোনও প্রকার দেশগত বা ব্যবধানগত যোগ নহে। যিনি দেশের প্রত্যেক অণুকে ও কালের প্রত্যেক মুহূর্ত্তকে আপনার সত্তার দ্বারা পূর্ণ করিয়া

বিদ্যমান রহিয়াছেন, যিনি সূর্য্যালোকের প্রত্যেক কম্পনে এবং চিন্তা ও ভাবের প্রত্যেক ক্রিয়াতে সমান ভাবে বিরাজিত আছেন, তাঁহার আবার দূর ও নিকট কি? তাঁহার পক্ষে আবার ব্যবধান কি যাহা অন্তর্হিত হইবে? একদিকে ইহা সত্য কেহই বা কিছুই তাঁহা হইতে দূরে নয়; এবং সকলেই তাঁহার সহিত ঘনিষ্টভাবে যুক্ত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার ও আমাদের মধ্যে আকাশেরও ব্যবধান নাই।

যোগের আর এক প্রকার অর্থ এদেশের প্রচলিত আছে। তাহার অর্থ মিশ্রণ বা একীকরণ। "মিশে নদী জলধিতে হয় একাকার" একটী প্রচলিত ব্রহ্মসঙ্গীতের এই অংশে সেই যোগের ভাব কিঞ্চিৎ ব্যক্ত হইয়াছে। যেমন দিগন্ত ব্যাপিয়া আকাশ আছে, একটী ঘটের মধ্যেও আকাশ আছে। ঘটের মধ্যে যে আকাশ আছে, তাহাও ঐ দিগন্তব্যাপী আকাশের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র; একই বস্তু দুই স্থানে দুই ভাবে ব্যাপ্ত। এই মুহূর্ত্তে ঘটটী ভাঙ্গিয়া ফেল, ঘটাকাশ আর ঘটাকাশ রহিল না, আকাশে আকাশ মিশিয়া গেল, অনন্ত আকাশের সহিত ক্ষুদ্রাকাশ একীভূত হইল। যোগের দ্বিতীয় ভাবাপন্ন ব্যক্তিরা বলেন যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা মূলে এক বস্তু;—শরীর ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেল, দুই আত্মাতে এক হইয়া গেল। অনেকে ব্রহ্মে লীন হওয়ার অর্থ এই প্রকার বুঝিয়া থাকেন। গীতাকার বলিয়াছেন,— "অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত।" হে ভারত! ভূত সকল আদিতে অব্যক্ত, অন্তেও অব্যক্ত, কেবল মধ্যাবস্থাতে ব্যক্তভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। অর্থাৎ মেঘ

যেমন অদৃশ্য বাষ্পরাশি হইতে সমুত্থিত হইয়া ক্ষণকাল দৃশ্য থাকিয়া পরে বৃষ্টিধারা রূপে অবতীর্ণ হইয়া ধরিত্রীর গর্ভে ও নদ নদী, সরোবর ও সাগরের জলরাশির মধ্যে পড়িয়া আবার বাষ্পাকার অবলম্বন করে, এই জগৎও তেমনি অদৃশ্য হইতে উৎপন্ন হইয়া অদৃশ্যে বিলীন হইয়া থাকে। জীবাত্মাও এইরূপে পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া যায়। এই যোগের ভাবের মধ্যেও সূক্ষ্মভাবে জড়ীয় ভাব নিহিত রহিয়াছে। এরূপ যোগের কল্পনা যাঁহারা করেন, তাঁহারা যেন মনে করেন, যে শরীরটা একটা শিশি ও আত্মাটা একটা আরক; যেমন শিশি হইতে আরকটা ঢালিয়া দেওয়া যায়, তেমনি যেন শরীর হইতে আত্মাটাকে ঢালিয়া দেওয়া হইবে— আরকে আরক মিশিবে। কিন্তু অধ্যাত্ম-যোগের অর্থ এ প্রকার নহে।

অধ্যাত্ম-যোগ অর্থাৎ আত্মাকে অধিকার করিয়া বা আত্মাকে আশ্রয় করিয়া যে যোগ। শরীর সম্বন্ধে যেমন দূর, নিকট, সংযোগ, বিয়োগ প্রভৃতি শব্দ আমরা সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকি, আত্মা সম্বন্ধেও সেইরূপ দূর নিকট সংযোগ ও বিয়োগ প্রভৃতি শব্দ সর্ব্বদা ব্যবহার করি। ব্যক্তি বিশেষের নাম করিলে বলিতেছি,—"উনি আমার কাছের লোক" কাহারও বা নাম হইলে বলিতেছি'—'উনি অনেক দূরের লোক।' কেবল যে এ প্রকার ভাষা ব্যবহার করিতেছি তাহা নহে, অন্তরেও মানুষে মানুষে দূরত্ব ও নৈকট্য সম্বন্ধে তারতম্য অনুভব করিতেছি। এ সংসারে

অদ্যাবধি যত লোকের সহিত আমাদের আলাপ পরিচয় হইয়াছে, সকলের সম্বন্ধে আমাদের হৃদয়ের ভাব কি সমান? চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে তাহা নহে, মানুষ সম্বন্ধে মানুষের এই ভাবের তারতম্য অতীব বিচিত্র। একবার চিন্তা করিয়া দেখ, যাহাদের সঙ্গে এক গ্রামে, এক ভবনে জন্মিয়াছি, বহুদিন এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছি, তাঁহারা সকলে আজ কোথায়? সে সকল বালক বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ ও রমণী হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহারা এক জগতে, আর হয়ত আমরা আর এক জগতে? এ কথা বলিবার অভিপ্রায় এ নহে যে, তাঁহারা আজ এ পৃথিবীতে নাই বা তাঁহারা অনেক দূরদেশে গিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা হয়ত এই দেশেই আছেন, হয়ত হাতের নিকটই আছেন, হয়ত সর্ব্বদা দেখিতেও পাই, কিন্তু চিন্তা, ভাব, রুচি প্রবৃত্তি আকাঙ্ক্ষাতে কি প্রভেদই ঘটিয়াছে! সেই জন্যই বলিতেছি, যেন দুই দল লোক দুই স্বতন্ত্র রাজ্যে বাস করিতেছে। এই অর্থে বলিতে পারি, আমাদের পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি পরমাত্মীয়গণ যে জগতে বাস করিতেছেন, আমরা হয়ত আর সে জগতের অধিবাসী নহি; এতই দূরত্ব ঘটিয়াছে। আবার অপর দিকে এ কাহারা যাঁহারা আজ চারিদ্দিকে ঘিরিয়া বসিয়াছেন? ইঁহারা কোথায় জন্মিলেন, কোথায় বাড়িলেন, কি করিয়া এত নিকটে আসিলেন। ইহারা ত তবু নিকটে আছেন; দেশ বিদেশে, সাগর পারে, যে সকল নিকটের লোক

রহিয়াছেন, তাঁহাদের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখ। তাঁহারা দূরে থাকিয়াও নিকটে। আবার বর্ত্তমান হইতে পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখ যাজ্ঞবল্ক্য, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি ব্রহ্মবাদী ও ব্রহ্মবাদিনিগণ, শাক্য, যীশু, মহম্মদ, নানক, পল, চৈতন্য *প্রভৃতি মহাপুরুষগণ অতীতের অন্ধকারকে হরণ করিয়া উজ্জ্বল তারকার ন্যায় জ্বলিতেছেন। ইঁহাদের নাম যখন স্মরণ কর, ইঁহাদের বিষয় যখন চিন্তা কর, ইঁহাদের উপদেশ সকল যখন পাঠ কর, তখন কি ইঁহাদিগকে আপনার লোক, নিকটের লোক বলিয়া অনুভব কর না? তখন কি ভাব ইহারা কিরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন? কি আহার করিতেন? কৃষ্ণবর্ণ কি গৌরবর্ণ ছিলেন? কোন্ ভাষার কথা কহিতেন? ইত্যাদি, ইত্যাদি। ইহার কিছুইত চিন্তা কর না। আত্মায় আত্মীয়তা নামে একটা ব্যাপার আছে, যাহাতে দেশ, কাল, অশন বসন প্রভৃতির প্রভেদ ভুলাইয়া দেয়। একজন বিদেশীয় ও বিজাতীয়ের দৃষ্টান্ত দি। যীশুর নাম অনেকেই করিয়া থাকি, সত্য করিয়া বল, আজ যদি যীশু এই মুহূর্ত্তে এই সভা মধ্যে উপস্থিত হন, তোমরা সকলে কি বল,—"মাগো এ যে দেখি একটা য়িহুদী আসিয়া উপস্থিত হইল?" না সকলে বল "আসুন আসুন, বসুন বসুন, আপনি যে আমাদের পরমাত্মীয়, আমরা যে আপনাকে ভালবাসি, কি করিয়া ঈশ্বরকে সমুদায় হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতে হয় ও তাঁহার চরণে সমুদায় মন প্রাণ অর্পণ করিতে হয় তাহা আমাদিগকে আর একবার বলুন।"

দেখ আত্মাতে আত্মাতে কি আশ্চর্য্য নৈকট্য ও আত্মীয়তা জন্মিয়া থাকে। আত্মার এই নৈকট্য ও আত্মীয়তা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। আমাদিগের দেশে সন্ন্যাসী ও পরমহংস-দিগের মধ্যে এক প্রথা প্রচলিত আছে যে, তাঁহারা যখন সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত হন, তখন স্বীয় স্বীয় নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীকে তাহার পুরাতন নাম ধাম বা জাতি বংশাদির পরিচয় জিজ্ঞাসা করা শিষ্ট-রীতিবিরুদ্ধ। সন্ন্যাসিগণ সেরূপ প্রশ্নের উত্তর দেন না; পরন্তু তদ্দ্বারা আপনাদিগকে অপমানিত মনে করিয়া থাকেন। এজন্য এদেশে কেহই সন্ন্যাসীদিগের পিতা মাতার নাম বা জাতি কুলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন না। যদি বা কেহ অজ্ঞাতবশতঃ এরূপ প্রশ্ন করেন, তাহা হইলে সন্ন্যাসিগণ পিতার নাম বলিবার সময় নিজ দীক্ষাগুরুর নাম এবং বংশের নাম করিবার সময় নিজ সম্প্রদায়ের নাম করিয়া থাকেন। ইহার কারণ এই পরমহংসগণ মনে করেন যে, দীক্ষা গ্রহণান্তে তাঁহাদের পূর্ব্বকার অবিদ্যাময় জীবনের মৃত্যু হয় এবং নূতন জ্ঞানময় জীবনের জন্ম হয়। এই ভাব এক কালে বা এক দেশে আবদ্ধ নহে। মহাত্মা শাক্যসিংহের জীবনের একটী ঘটনার কথা অনেকে শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। তিনি নবালোক প্রাপ্ত হইয়া যখন স্বীয় নবধর্ম্ম প্রচারার্থ বহির্গত হইলেন, তখন এই নিয়ম করিলেন যে কোনও নগরের নিকটে গিয়া নগর-সন্নিকটস্থ কোনও বনে বা উদ্যানে সশিষ্যে বাস করিতেন। নগরবাসিগণ দলে দলে তাঁহার উপদেশ শ্রবণার্থ আসিত।

যদি আগন্তুকদিগের মধ্যে কেহ তাঁহার ও শিষ্যগণের আহারাদির বন্দোবস্ত করিত ভালই, নতুবা তিনি স্বয়ং সশিষ্যে ভিক্ষাপাত্র হস্তে নগরবাসিগণের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার্থ ভ্রমণ করিতেন। একবার সিদ্ধার্থ সশিষ্যে নিজ পিতার রাজধানীর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। এক দিন তাঁহার পিতা সংবাদ পাইলেন যে, সিদ্ধার্থ সশিষ্যে তাঁহারই প্রজাগণের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন। শুনিয়া রাজা আপনাকে অতিশয় অপমানিত বোধ করিলেন এবং শাক্যসিংহকে এ প্রকার কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। পরে নিজে আসিয়া বুদ্ধকে কহিলেন, "হে পুত্র, তুমি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ সে বংশে কে কবে মুষ্টি-ভিক্ষার দ্বারা প্রাণ ধারণ করিয়াছে?" বুদ্ধ কহিলেন;—"মহারাজ! আমি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সে বংশে সকলেই ভিক্ষুক।" ইহাতে রাজা শুদ্ধোদন অতিশয় কুপিত হইলেন। তখন বুদ্ধ বুঝাইয়া বলিলেন যে, তিনি নির্ব্বাণপ্রাপ্ত বুদ্ধবংশের কথাই বলিয়াছেন। মহাত্মা যীশুর জীবনেও এইরূপ একটী ঘটনা আছে। একবার তিনি শিষ্যসমভিব্যাহারে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে একজন আসিয়া বলিল,—"আপনার মাতা ও ভাই ভগিনীগণ বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।" শুনিয়া তিনি বলিলেন, "কে আমার মা, কে আমার ভাই ভগিনী, ইহারাই আমার মা ও আমার ভাই ভগিনী" এই বলিয়া সম্মুখস্থ শিষ্যমণ্ডলীকে দেখাইয়া দিলেন। এ সকল

কথা আপাততঃ হৃদয়ের কঠোরতার প্রকাশক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ইহার মধ্যে একটী গভীর সত্য নিহিত আছে। আত্মাতে আত্মাতে এক প্রকার যোগ স্থাপিত হয়, যাহা রক্তের সম্বন্ধকে অপেক্ষা করে না।

কিন্তু যে অধ্যাত্ম-যোগ দ্বারা ঈশ্বরকে জানা যায়, তাহা আরও গভীর বস্তু। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে আত্মার প্রতিষ্ঠা-ভূমি রূপে লক্ষ্য করা, প্রেম দ্বারা তাঁহাকে প্রেমাস্পদ রূপে অবলম্বন করা ও ইচ্ছাদ্বারা তাঁহাকে অধিপতিরূপে বরণ করাই অধ্যাত্ম-যোগ। আর একটু ভাঙ্গিয়া বলা আবশ্যক। আত্ম-জ্ঞানের মূলেই পরমাত্ম-জ্ঞান নিহিত। আত্মার আশ্রয় ভূমি যে তিনি তাঁহার জ্ঞানকে পরিহার করিয়া আত্ম-জ্ঞান সম্ভব নহে। পরমাত্মা হইতে বিচ্যুত করিয়া আত্মার যে জ্ঞান তাহা আংশিক জ্ঞান এবং প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞান শব্দের বাচ্য নহে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে এ বিষয়ের একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। যখন মানুষ কোন দুন্দুভির শব্দ শ্রবণ করে, তখন সেই শব্দ-মাত্রের জ্ঞানকে কি তাহার পূর্ণজ্ঞান বলা যাইতে পারে? তাহা পারে না। যখন সে স্বচক্ষে দুন্দুভিকে ও সেই সঙ্গে বাদককে ও বাদন-প্রক্রিয়াকে দর্শন করে, তখনি তাহার জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অথবা মনে কর যে ব্যক্তি কেবল দূর হইতে ইন্দ্রধনু দেখিতেছে, ও তাহার বিচিত্র বর্ণ দর্শন করিয়া পুলকিত হইতেছে, কিন্তু তদতিরিক্ত আর কিছু জানে না, সে কি ইন্দ্রধনুকে জানে? বৃষ্টিধারার বিন্দু সকলের মধ্যে সূর্য্যকিরণ

প্রতিফলিত হইয়া কিরূপ বিচিত্র বর্ণ উৎপন্ন করে, যখন সে তাহা প্রত্যক্ষ করে, কাচখণ্ডে সূর্য্য কিরণ ধরিয়া দেখে, এবং সেই সঙ্গে মেঘ ও বৃষ্টির প্রকৃতি এবং সূর্য্যকিরণের স্বভাব ও কার্য্যের বিষয় অবগত হয়, তখন তাহার জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়! আত্ম-জ্ঞান সম্বন্ধেও সেইরূপ। যে আত্মা জগতরূপ বহিঃপ্রাঙ্গণে ক্রীড়া করিতেছে, অভিনয়কারী নটের ন্যায় নানা বেশ ধারণ করিতেছে, হর্ষ শোকের আন্দোলনে আন্দোলিত হইতেছে, স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকুলের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে, ইহাকেই যদি আত্মা বলিয়া জান, এই জীবনকেই যদি একমাত্র জীবন মনে কর, ইহার অতিরিক্ত যদি কিছু না জান, তবে আত্মাকে জানাই হইল না। যেমন ইন্দ্রধনুকে প্রকৃতভাবে জানিবার জন্য মেঘে ও বৃষ্টিতে প্রবেশ করিতে হয়, সূর্য্য-কিরণের প্রকৃতির মধ্যে নিমগ্ন হইতে হয়, তেমনি আত্মাকে প্রকৃতভাবে জানিতে হইলে পরমাত্ম-স্বরূপে নিমগ্ন হইতে হয়। যখন আমরা জ্ঞান-নেত্রে দেখিতে পাই, যে পরমাত্মা হইতে আত্মাকে বিযুক্ত করিয়া চিন্তা করিবার যো নাই, এককে দেখিতে গেলেই অপরকে দেখিতে হয়, এককে ভাবিতে গেলেই অপরকে ভাবিতে হয়, যখন বুঝিতে পারি যে, এই জীবাত্মা জগতের দিকে সীমাবদ্ধ, কিন্তু তাঁহার দিকে অনন্তের সহিত মিশ্রিত, তখন অধ্যাত্ম-যোগের প্রথম সোপানে পদার্পণ করি।

সত্য জ্ঞান ভিত্তি স্থাপন করিলে প্রেম তদুপরি কার্য্য করিতে আরম্ভ করে। তাঁহার মঙ্গল ভাব প্রেমের উপজীব্য পদার্থ। সেই মঙ্গল ভাবের স্মরণে, চিন্তনে ও কীর্ত্তনে যখন

সমগ্র মনের গতি তাঁহার অভিমুখে প্রবাহিত হয়, তাহারই নাম ভক্তি। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন,—"মনো গতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোম্বুধৌ।" অর্থাৎ গঙ্গার জলরাশি যেমন অবিচ্ছিন্ন গতিতে সাগরাভিমুখে প্রবাহিত, তেমনি মনের গতি যখন অবিচ্ছিন্নভাবে ও স্বাভাবিকরূপে তাঁহার অভিমুখে প্রবাহিত হয়, তখনই তাহা ভক্তি নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। এই ভক্তি অধ্যাত্ম-যোগের দ্বিতীয় সোপান।

জ্ঞান যাঁহাকে পরম সত্য বলিয়া ধরিল, প্রেম তাঁহাকে প্রেমাস্পদ বলিয়া আলিঙ্গন করিল, এখানেও অধ্যাত্ম-যোগের পরিসমাপ্তি হইল না। তাঁহার সহিত আমাদের আর এক যোগ সম্ভব। তাহা ইচ্ছার যোগ। প্রেমের এই এক আশ্চর্য্য মহিমা যে, ইহা মানুষকে স্বাধীন রাখিয়াও পরাধীন করে। মানবাত্মা অজ্ঞাতসারে প্রেমাস্পদের ইচ্ছার সহিত আপনার ইচ্ছাকে একীভূত করে, এবং তাঁহাতেই আনন্দ লাভ করে। যতক্ষণ প্রীতি হৃদয়ে পদার্পণ করে না, ততক্ষণ বাধ্যতা ঘোর ভার-স্বরূপ বোধ হয়। যে শাসনশক্তি বাহির হইতে আসে ও প্রেমহীন হৃদয়কে শাসন করে, তাহাতে ঘোর দাসত্ব, কিন্তু যে শাসনশক্তি প্রেম হইতে জন্মগ্রহণ করে, ও অন্তর হইতে উদ্ভূত হয়, তাহাতেই মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। ভগবদিচ্ছা ধর্ম্মনিয়মরূপে মানবাত্মাতে নিহিত রহিয়াছে এবং প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যেক আত্মাকে অধীন করিতে চাহিতেছে। প্রীতির অভাবে আমাদিগকে কতবার এই বলিয়া দুঃখ করিতে হইতেছে,—জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তিঃ জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ,—

হায় হায়! ধর্ম্মকে জানি অথচ তাহাতে প্রবৃত্তি হয় না। অধর্ম্মকে জানি অথচ তাহা হইতে নিবৃত্তি হয় না। এমন কেন হয়? বিশ্বাস ও প্রেমের অভাবই ইহার প্রধান কারণ! তাঁহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলে ও তাঁহাতে অকপট প্রীতি স্থাপন করিলে আমাদের ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছার অধীন হইতে থাকে। আমরা অনেক সময় এই তত্ত্ব জানিয়াও তাঁহার অধীন হইতে পারি না। যতই আমাদের প্রকৃতি তাঁহার ইচ্ছার অধীন হইতে থাকে, ততই তাঁহার সহিত আমাদের যোগ গাঢ়তর হইতে থাকে। জ্ঞান যাহাকে সত্যং বলিয়া ধরিয়াছিল, প্রেম তাঁহাকে শিবং বলিয়া ধরিল, অবশেষে ইচ্ছা তাঁহাকে সুন্দরং অর্থাৎ পবিত্র স্বরূপ প্রভুরূপে প্রাপ্ত হইল। জ্ঞান, প্রীতি ও ইচ্ছা এই তিন লইয়াই মানবাত্মা। সত্যং শিবং সুন্দরং এই ত্রি-স্বরূপাত্মক মন্ত্রই যোগের প্রধান মন্ত্র। এই ত্রিবিধ যোগে আমরা যখন তাঁহার সহিত সংযুক্ত হই, তখন অধ্যাত্ম-যোগ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর করুন এই ত্রিবিধ যোগে আমরা তাঁহার সহিত যুক্ত হইতে পারি।

দিবীব চক্ষুরাততং।

তদ্বিষ্ণোঃ পরং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরা-
ততং !—ঋগ্বেদ।

অর্থ—"চক্ষু যেমন আকাশে বিস্তৃত পদার্থকে দর্শন করে তেমনি পণ্ডিতগণও সেই সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের পরম পদকে দর্শন করিয়া থাকেন।"

পূর্ব্বোক্ত বেদমন্ত্রটী এতদ্দেশে সুপ্রসিদ্ধ। প্রতিদিন সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ বিবিধ প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান উপলক্ষে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। এই মন্ত্রটির তাৎপর্য্য কি তাহা আমরা একবার গ্রহণ করিবার চেষ্টা করি। চক্ষু আকাশে বিস্তৃত পদার্থকে যেরূপে দেখে, সাধকগণ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের পরম পদকে সেই ভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই, ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ বিষয়ে মানুষের যেমন নিঃসংশয় প্রতীতি জন্মে, ব্রহ্মবিষয়েও জ্ঞানিগণের সেইরূপ প্রতীতি জন্মিয়া থাকে। যে ঋষি পূর্ব্বোক্ত বচন রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার অন্তরে কি প্রকার জ্ঞানের ভাব বিদ্যমান ছিল ?

আমাদের এ দেশের দর্শনকারগণ তিন প্রকার প্রমাণকে জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ অবলম্বন করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ বা আপ্তবচন। পদার্থ বিশেষ ইন্দ্রিয়গোচর হইলে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান; জ্ঞাত বিষয়কে

হেতুস্বরূপ করিয়া অজ্ঞাত বিষয়ের যে জ্ঞানে উপনীত হওয়া যায়, তাহা অনুমানলব্ধ-জ্ঞান; বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের বাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া যে জ্ঞানে উপনীত হওয়া যায়, তাহা আপ্তবাক্য-জনিত জ্ঞান। আপ্তবাক্য বলিতে এদেশে বেদাদি শাস্ত্রই বুঝাইয়া থাকে। যদিও গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, আপ্তবাক্যও অনুমান মধ্যে আসিয়া পড়ে, তথাপি এদেশীয় দার্শনিকগণ আপ্তবাক্যকে একটী প্রমাণ ও জ্ঞানের একটী দ্বারস্বরূপ বলিয়াছেন বলিয়া উহার উল্লেখ করিলাম। ইহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন যে, বিবিধ প্রমাণলব্ধ জ্ঞানের মধ্যে প্রত্যক্ষ লব্ধ জ্ঞানই সাক্ষাৎ জ্ঞান, অপর দ্বিবিধ প্রমাণলব্ধ জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞান। এক্ষণে প্রশ্ন এই, আমাদের যে ঈশ্বরজ্ঞান তাহা কোন জাতীয় জ্ঞান। জ্ঞানিগণের মধ্যে অনেকে বলিয়াছেন,—"আমাদের ঈশ্বর-জ্ঞান অনুমানলব্ধ জ্ঞান, সৃষ্টি দর্শনে স্রষ্টার অনুমান মাত্র।" এ কথার প্রতিবাদ করিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন,—"অনুমান প্রক্রিয়ার নিয়মানুসারে বিচার করিলে ঈশ্বর সিদ্ধ হয় না।" অতএব শব্দ বা আপ্তবাক্যই একমাত্র প্রমাণ। ঈশ্বর আছেন, একথা আমরা কেন বলি? কারণ ঋষিগণ যোগনেত্রে তাঁহাকে দেখিয়া বেদাদি শাস্ত্রে সাক্ষ্য দিয়াছেন, যে তিনি আছেন। যদি কেহ বলেন ঋষিগণ যদি তাঁহাকে দেখিয়া থাকেন, আমরা কেন দেখিব না? তাহার উত্তরে এই মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ বলিবেন—"তোমাদের যখন যোগনেত্র ফুটিবে, তখন তোমরাও দেখিবে।" একদিকে দেখিতে গেলে এ সকল কথা বড়

নৈরাশ্যজনক। উভয় মতেই বলিতেছে,—"হে মানব তুমি সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরকে জানিতে পার না।' কিন্তু যে ঋষি পূর্ব্বোক্ত বেদমন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার মনে ব্রহ্মজ্ঞানের আর একপ্রকার ভাব ছিল। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বরের যে জ্ঞান, তাহা ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থজ্ঞানের ন্যায় সাক্ষাৎ ও উজ্জ্বল জ্ঞান। "দিবীব চক্ষুরাততং"—চক্ষু আকাশে বিস্তৃত পদার্থকে যেরূপে দেখে ঈশ্বরকে সেইরূপ উজ্জ্বল ও সাক্ষাৎ ভাবে দেখিতে পাইবে। নিগূঢ় ভাবে চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, আমাদের আত্মজ্ঞানই কেবল সাক্ষাৎ জ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থের জ্ঞান যে সাক্ষাৎ জ্ঞান শব্দে বাচ্য তাহাও আত্মজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া; আমরা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের দ্বারা পদার্থসকলের গুণাবলীকেই জানি; তাহাদের স্বরূপ বিষয়ে কিছুই অবগত হইতে পারি না। আবার গুণাবলী যাহা জানি তাহাও আপেক্ষিক অর্থাৎ স্থল ও অবস্থা বিশেষের সঙ্গে তাহার বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ আছে। এইরূপে বিচার করিলেই একমাত্র আত্মজ্ঞানকেই কেবল সাক্ষাৎ জ্ঞানরূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, তবে ঈশ্বর জ্ঞান কি প্রকারে সাক্ষাৎ জ্ঞান শব্দে বাচ্য হইতে পারে? তদুত্তরে বক্তব্য এই আত্মজ্ঞানের মধ্যেই পরমাত্মজ্ঞান নিহিত। যেমন সীমাবিশিষ্ট প্রত্যেক জড়পদার্থের জ্ঞানের মধ্যে দেশের জ্ঞান নিহিত অর্থাৎ দেশের জ্ঞানকে মন হইতে বাদ দিয়া জড়পদার্থের জ্ঞান সম্ভব নহে; যেমন কালের জ্ঞানকে মন হইতে বাদ দিয়া কোনও

ঘটনা বিশেষের জ্ঞান সম্ভব নহে, তেমনি পরমাত্ম-জ্ঞানকে মন হইতে বাদ দিয়া আত্মজ্ঞান সম্ভব নহে। যেমন দেশ ও কালের জ্ঞানকে ভূমিরূপে অগ্রে পাতিয়া তবে তদুপরি সমুদায় পদার্থ-জ্ঞান ও ঘটনা-জ্ঞানকে অঙ্কিত করিতে হয়, তেমনি পরমাত্ম-জ্ঞানকে অগ্রে ভূমিরূপে পাতিয়া তবে আত্মজ্ঞানকে ধারণা করিতে হয়। যে জ্ঞানক্রিয়ার দ্বারা আত্মাকে জানা যায়, সেই জ্ঞানক্রিয়া দ্বারাই আত্মার প্রতিষ্ঠাভূমি যে পরমাত্মা তাঁহাকেও জানা যায়। এই যে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং ইহার তাবৎ অবস্থা ও ঘটনা, এতৎ সম্বন্ধে তিনটী ভাবের একটী মাত্র সত্য হইতে পারে। হয় বল, সকলে এক সত্যেরই বিকাশমাত্র, না হয় বল তাহারা প্রত্যেকটীই স্বতন্ত্রভাবে সত্য, নতুবা বল কোনটীই সত্য নহে; সকলগুলিই স্বপ্ন। যদি সকলগুলিই স্বপ্ন হয়, তবে তাহারা কাহার স্বপ্ন? এ স্বপ্নের দ্রষ্টাও কি স্বপ্নময়? এ মত অতিশয় হাস্যজনক। যদি বল প্রত্যেকটীই সত্য, তাহাও বলিতে পার না, কারণ যাহা সত্য, তাহা স্বতন্ত্র ও নিত্য। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের কোনও বিষয়ই নিত্য নহে, স্বতন্ত্র নহে। তাহারা বিকার ও পরিবর্ত্তনশীল তবে বলিতে হইতেছে মূলে এক সত্য আছে তাহার ভাব যদি অগ্রে হৃদয়ে না লও, তবে অপর সকলের তাৎপর্য্য কিছুই থাকে না। যেমন গণনা প্রক্রিয়াতে লক্ষ শূন্য যোগ করিলে তাহার কোনও মূল্য থাকে না, কিন্তু অগ্রে এক ধর, পরে শূন্য যোগ কর প্রত্যেক শূন্যের মূল্য দেখিবে, তেমনি জগতের জ্ঞানসমষ্টির অগ্রে মূলীভূত সত্যরূপে সেই একক ধর

তৎপরে তদনুযায়ী যত জ্ঞান আরোপ করিবে সকলই তাৎপর্য্যশালী হইবে!

"দিবীব চক্ষুরাততং" এই উক্তিটীকে আমরা আর এক ভাবে গ্রহণ করিতে পারি। চক্ষুর দর্শনক্রিয়ার বিষয়ে চিন্তা করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা দেখি যে, দর্শন ক্রিয়ার মধ্যে দ্রষ্টব্য পদার্থ ও দ্রষ্টা যে চক্ষু এই উভয়ের মধ্যে পরস্পরের সহিত কি আশ্চর্য্য উপযোগিতা আছে? দ্রষ্টব্য পদার্থের রূপ এমনি, তাহার আলোক-রেখার প্রসারণের রীতি এমনি, যে, তাহা অদ্ভুতরূপে চক্ষুরই উপযোগী, আবার চক্ষের গঠন ও প্রকৃতি এমনি যে তাহা পদার্থ দর্শনের উপযোগী। প্রত্যেক দর্শনক্রিয়াতেই চক্ষু ও দ্রষ্টব্য পদার্থের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়। তেমনই আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যেও আশ্চর্য্য উপযোগিতা আছে। জীবাত্মা তাঁহারই জন্য তিনিও জীবাত্মার জন্য; এবং তাঁহাকে জানিলেই আত্মা তাঁহার সহিত অভেদ্যযোগে আবদ্ধ হয়।

আকাশে বিস্তৃত পদার্থকে চক্ষু যে ভাবে দেখে, সেইভাবে পরমাত্মাকে দেখিতে হইবে; এ উপদেশ বড় সামান্য নহে। একবার চিন্তা কর, কোনও বস্তুকে চক্ষুর দ্বারা একবার দেখিলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়। মনে কর, তুমি স্বীয় বাসভবন করিবার জন্য একটী ভবন ক্রয় করিয়াছ। তুমি সেই ভবনে বাস করিতে যাইতেছ। গিয়া দেখিলে যে, সে ভবনের প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ আছে। সে বৃক্ষটী দেখার পর আর কি তুমি এমনভাবে সে প্রাঙ্গণে গতায়াত করিতে পার, যেন বৃক্ষটী

তথায় নাই? তাহা কখনই পার না, গতায়াত করিবার সময় তোমাকে বৃক্ষটী পরিহার করিয়া চলিতে হয়, যেন তাহার দেহে তোমার মস্তক আহত না হয়। তৎপরে তুমি যখন অন্ধকার রাত্রে সেই ভবনে প্রবেশ কর, হাতড়াইয়া দেখ, বৃক্ষটী কোথায় আছে। অর্থাৎ সেই প্রত্যক্ষ-জনিত জ্ঞান তোমার স্মৃতিতেও প্রবেশ করে। এইরূপে সেই জ্ঞান তোমার আত্মার স্থায়ী জ্ঞান-সম্পত্তির অঙ্গীভূত হইয়া যায়। তৎপরে তুমি যখন রাত্রে শয়ন করিয়া সেই ভবনের নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে চিন্তা কর, তখন সে বৃক্ষটীকে মন হইতে ফেলিয়া দিয়া চিন্তা করিতে পার না। তাহা তোমার মনের অন্তরতম স্তরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে; এইরূপ চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, আমরা যাহাকে সত্য বলিয়া দেখি বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহা আমাদের মনে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত দেখিবার জন্য বহুদূর গমন করিতে হইবে না। এই যে ব্রহ্মমন্দিরে সকলে উপাসনার্থ সমবেত হইয়াছেন, ইহার মধ্যে কোন্ জ্ঞান, কোন্ বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা কি সকলে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? দেশ বলশালী ও শাসনক্ষম রাজাদিগের দ্বারা শাসিত, এ বিশ্বাস অন্তরে নিহিত না থাকিলে কি কেহ এখানে এরূপে সমবেত হইতে পারিতেন? বর্ত্তমান সপ্তাহের মধ্যেই যদি সংবাদ আসে যে, সিপাহীগণ আবার বিদ্রোহী হইয়া ইংরাজদিগকে হত্যা করিতেছে এবং বহুদেশ জয় করিয়া কলিকাতার অভিমুখে আসিতেছে, তাহা হইলে কি আগামী রবিবারে এত লোক এই মন্দিরে উপস্থিত

হইবেন? দেখুন তবে বর্ত্তমান রাজাদিগের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব কেমন আমাদের কার্য্যের অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে স্থিতি করিতেছে!

চক্ষু যেমন আকাশে বিস্তৃত পদার্থকে দেখে, সেরূপ উজ্জ্বলভাবে যদি আমরা ঈশ্বরকে দেখিতে পাই, তাহা হইলে কি বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব আমাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে না? আমরা তাঁহাতে সত্য বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি কি না তাহা তিনটী প্রশ্নের দ্বারা বিচার করা যাইতে পারে। প্রথম—আমরা তাঁহার সান্নিধ্য অনুভব করি কি না? দ্বিতীয়—তাঁহার বিধাতৃত্বের প্রতি ঐকান্তিক নির্ভর আছে কি না? তৃতীয় তাঁহাকে নিয়ন্তা ও অধিপতিরূপে অনুভব করি কি না?

আমরা তাঁহাকে কিরূপে অনুভব করিতেছি? একজন তাঁহার সত্তাতে বিশ্বাস করিয়াও তাঁহাকে দূরে রাখিতে পারে। তিনি কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলায় বিশ্বাস করিয়াও তাঁহাকে দূরে দেখিতে পারেন। তিনি কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলার অপর পার্শ্বে আছেন এরূপ ভাবিতে পারেন। যন্ত্র-নির্ম্মাতা যেরূপ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহা চালাইয়া দিয়া নিজে দূরে যায়, তেমনি তিনি জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া ইহাকে চালাইয়া দিয়া দূরে গিয়াছেন, ইহা কেহ মনে করিতে পারেন। আমরা কি তাঁহাকে সেইরূপ দূরস্থ বলিয়া অনুভব করিতেছি, অথবা তাঁহাকে নিকটস্থ ও আত্মার আশ্রয়-ভূমি বলিয়া অনুভব করিতেছি? জীবনের সুখ দুঃখ পাপ প্রলোভনের মধ্যে যদি সেই পরমাশ্রয় পরমেশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব করিতে না পারা যায়, আত্মাকে তাঁহার ক্রোড়ে নিহিত

বলিয়া না দেখা যায়, তাহা হইলে তাঁহার সত্তা ও স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলি বা যাহা কিছু শুনি সকলি বৃথা বোধ হয়। ফলতঃ তাঁহার সহিত এইরূপ নৈকট্য স্থাপনের উদ্দেশেই দর্শনাদি রচনা ও শাস্ত্রাদির বিচার; যদি সেই ফলই না ফলে, তবে দর্শনের বিচার ও শাস্ত্রের আলোচনা সকলি বৃথা। একজন যদি সমুদায় রাগ রাগিণীর মাত্রা ও স্বরলিপি প্রভৃতি জানে কিন্তু নিজে কণ্ঠে একটী রাগ বা রাগিণী গাইতে না পারে, তবে তাহার স্বরলিপি জানা যেমন বৃথা, তেমনি ঈশ্বরের সত্তা ও স্বরূপাদি বিষয়ে জ্ঞান থাকিয়াও যদি তাঁহার নৈকট্য অনুভব না করা যায়, যদি সেই নৈকট্য-জ্ঞান আমাদের চিন্তা ও কার্য্যে প্রবেশ না করে, তবে সে জ্ঞানও বৃথা? অথচ ইহা কি লজ্জার সহিত স্বীকার করিতে হয় না যে আমরা অনেক সময়েই তাঁহার সান্নিধ্য বিস্মৃত হইয়া থাকি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন আমরা কি সৃষ্টির রচনা-প্রণালীতে, মানবের ইতিবৃত্তে ও নিজ নিজ জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে তাঁহার হস্ত দেখিতে পাই? বর্ত্তমান সময়ে নানা কারণে তাঁহার বিধাতৃত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা দুষ্কর হইয়া উঠিতেছে। প্রথমতঃ—অদ্বৈতভাবাত্মক জ্ঞানের বহুল প্রচার হওয়াতে তাঁহাকে জ্ঞানক্রিয়াসম্পন্ন পুরুষরূপে ধারণা করার ভাব ম্লান হইয়া যাইতেছে; দ্বিতীয়তঃ সৃষ্টিরাজ্যে বিবর্ত্তন-প্রক্রিয়ার মত প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে তাঁহাকে বিধাতারূপে দেখা কঠিন হইয়া পড়িতেছে। অথচ তাঁহার মঙ্গলভাবই প্রেমের উপজীব্য

বস্তু। তাঁহাকে মঙ্গলময় বিধাতারূপে প্রতীতি না করিলে প্রেম তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারে না।

তৃতীয় প্রশ্ন আমরা কি তাঁহার নিয়ন্তৃত্বে বিশ্বাস করি? আমরা কি সত্য সত্যই তাঁহাকে ধর্ম্মাবহ ও পাপনুদরূপে দর্শন করিয়া থাকি? অর্থাৎ আমরা কি মনে করি যে, দ্বিতল বা ত্রিতল প্রাসাদ হইতে লম্ফ দিলে যেমন ভূপৃষ্ঠে পতিত হওয়া অনিবার্য্য, অগ্নি-শিখা প্রজ্বলিত হইলে যেমন ঊর্দ্ধমুখে উত্থিত হওয়া অনিবার্য্য, জলরাশি ঢালিয়া দিলে নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হওয়া যেমন অনিবার্য্য, তেমনি এ জগতে সত্যের ও ধর্ম্মের জয় হওয়া অনিবার্য্য। ধর্ম্মে এরূপ সুদৃঢ় প্রতীতি স্থাপন করিতে না পারিলে তাঁহাকে নিয়ন্তা বলিয়া স্বীকার করা হয় না। জগতে অনেক প্রকার নাস্তিক আছে, কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাস্তিক সেই, যে অসত্য, অধর্ম্ম বা অসাধুতাচরণ করিয়া জয়লাভ করিবার আশা করে; কারণ সে আপনার ব্যবহার দ্বারা বলে, "ঈশ্বর বলিয়া কোথাও কিছু নাই, এ *পৃথিবীতে জয় পরাজয় কেবল মানুষের চাতুরীর খেলা মাত্র।*"

ঈশ্বর নিকটে, অন্তরে বাহিরে, তিনি মঙ্গলময় বিধাতা ও তিনি ধর্ম্মের নিয়ন্তা, এই তিনটী বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্তি না পাইলে ঈশ্বরের সহিত অধ্যাত্মযোগের প্রথম সোপানে আরোহণ করা যায় না; ধর্ম্মজীবনের ভিত্তিই স্থাপিত হয় না। আমরা দেখিতে পাই, আমাদের জীবনের যত কিছু দুর্গতি তাহার মূলে এই তিনটীর অভাব; আমরা তাঁহার সান্নিধ্য অনুভব করি না, তাঁহার বিধাতৃত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না,

এবং তাঁহার নিয়ন্তৃত্বের উপর নির্ভর করিতে পারি না। এইগুলির দ্বারাই জ্ঞান সফলতা প্রাপ্ত হয়। করুণাময় বিধাতা করুন আমরা এই তিনটীকে জীবনে লাভ করিয়া প্রকৃত আস্তিক নামের উপযুক্ত হইতে পারি।

ধর্ম্মের বহিঃপুর ও অন্তঃপুর।

আত্মক্রীড়আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্—উপনিষদ।

অর্থ—ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন পরমাত্মাতে রমণ করেন ও ক্রিয়াবান্ হয়েন।

সকল বিষয়েরই একটা বহিঃপুর ও একটা অন্তঃপুর, একটা বাহির পিঠ ও একটা ভিতর পিঠ আছে। যেমন রঙ্গ-ভূমিতে একটা সাজঘর থাকে, যেখানে নটগণ স্বীয় স্বীয় কার্য্য সমাধা করিবার জন্য সজ্জিত হয়, আবার একটা বহিঃ-প্রাঙ্গণ থাকে যেখানে দর্শকবৃন্দ সমাসীন হইয়া অভিনয় কার্য্য দর্শন করিয়া থাকেন, তেমনি এই ব্রাহ্মাণ্ডের প্রায় সকল পদার্থের ও সকল ঘটনারই একটা সাজঘরের দিক ও একটা দর্শকের দিক আছে। মনে কর তুমি কোনও রঙ্গভূমির দর্শক বৃন্দের মধ্যে সমাসীন হইয়া অভিনয় কার্য্য দর্শন করিতেছ। তুমি দেখিতেছ যে শকুন্তলাকে পতি-গৃহে প্রেরণের পূর্ব্বে কণ্বমুনি একাকী স্নানান্তে বনমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া স্বগত কিছু বলিতেছেন। চিত্রকরের শিল্প-চাতুরী বশতঃ সেই চিত্রপটস্থিত বন তোমার চক্ষে প্রকৃত অরণ্য বলিয়া বোধ হইতেছে, এবং সেই পলিত-কেশ শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধকে তোমার প্রকৃত কণ্বমুনি বলিয়াই ভ্রান্তি জন্মিতেছে। কে সে ব্যক্তি? এরূপ শুক্ল কেশ ও দীর্ঘ শ্মশ্রু কিরূপে হইল, এরূপ ভ্রান্তি কিরূপে উৎপাদন করিতেছে? তাহার কিছুই তুমি জান

না। কিন্তু যে ব্যক্তি সাজঘরে বসিয়া ঐ সকল নটকে স্বীয় স্বীয় পরিচ্ছদ পরাইয়া দিতেছে, সে ব্যক্তি উহাদের প্রত্যেকের নাম, ধাম, ও প্রত্যেককে সজ্জিত করিবার প্রণালী প্রভৃতি সমুদায় জানে। এই ব্রহ্মাণ্ডে কি অনেক পরিমাণে এই প্রকার ব্যাপার চলিতেছে না? মনে কর একজন বর্ণজ্ঞান-বিহীন সরল-মতি কৃষক একদিন অপরাহ্নে সমুদিত ইন্দ্রধনুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে। তাহার সমুজ্জ্বল ও বিচিত্র বর্ণ-বিন্যাস দেখিয়া সে চমৎকৃত হইয়া যাইতেছে। তাহার বোধ হইতেছে যে ঐ ধনুর এক কোটি যেন কিয়দ্দূরে ভূমিকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। সে সাজঘরের সংবাদ কিছু জানে না। কিরূপে যে মেঘমুক্ত জলকণার মধ্যে সূর্য্যালোকে প্রতিফলিত হইয়া ঐরূপ বিচিত্র বর্ণ উৎপন্ন করিয়াছে তাহা সে অবগত নহে। তাহার বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টির পক্ষে উহা সত্য ধনু বলিয়াই বোধ হইতেছে। কতিপয় বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তি যেন প্রকৃতির সাজঘরে প্রবেশাধি-কার লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা সাজঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছেন ঐ ধনু কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, উহার গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে কি কি আছে, সুতরাং তাঁহারা অন্তঃপুরের সংবাদ কিয়ৎ পরিমাণে দিতে সমর্থ।

এক দিকে দেখিতে গেলে একথা বলা অতীব ধৃষ্টতার কার্য্য যে কতিপয় বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তি প্রকৃতির সাজঘরে বা অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। কারণ জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানবের অজ্ঞতার জ্ঞান বরং দিন দিন অধিক পরিমাণে ঘনীভূত হইতেছে। আলোক যতই উজ্জ্বল হয় কৃষ্ণবর্ণ

রেখাটী যেমন ততই অধিকতর উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি জ্ঞানালোকের উজ্জ্বলতা অজ্ঞতার কৃষ্ণবর্ণ রেখাটীকে যেন আরও অধিকতর উজ্জ্বলরূপে দেখাইয়া দিতেছে। বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তি মাত্রেই বলিয়া থাকেন যে, বিজ্ঞান যত জটিল সমস্যার সদুত্তর দিতে সমর্থ হইয়াছে তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক জটিল ও অমীমাংসিত সমস্যাকে চিন্তাপথে উপস্থিত করিয়াছে। সকল বিভাগেই বিজ্ঞান এমন সকল প্রশ্ন দেখিতেছে, যাহার সদুত্তর দেওয়া ইহার সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব মানব বিধাতার সাজঘরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে একথা বলিলে অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা দোষে দোষী হইতে হয়; আমি এরূপ অসঙ্গত কথা বলিতে পারি না। তবে সামান্য প্রাকৃতিক পদার্থের জ্ঞানেরও যে একটা বহিঃপুর ও একটা অন্তঃপুর আছে, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্যই পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের উল্লেখ করা গিয়াছে।

যেমন প্রকৃতি রাজ্যে একটা বহিঃপুর ও একটা অন্তঃপুর দেখা যাইতেছে, তেমনি মানব-মনেরও একটা বহিঃপুর ও একটা অন্তঃপুর আছে। ঐ যে বাহিরের মানুষ দেখিতেছ, যে অন্ন পান গ্রহণ করিতেছে, হর্ষ বিষাদ ভোগ করিতেছে, এ জগতে মিত্রতা শত্রুতা করিতেছে, অর্থোপার্জ্জন, পরিবার পালন, বিষয় বাণিজ্য যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি করিতেছে, ওটা মানুষের বহিঃপুর বা বাহিরের পিঠ; ভিতর পিঠে ও মানুষটা কিরূপ তাহা কে জানে? ঐ সকল কার্য্যের পশ্চাতে কোন্ কোন্ শক্তি, কোন্ কোন্ ভাব প্রচ্ছন্ন আছে তাহা কে বলিতে পারে? হৃদয়ের গভীরতম অন্তরতম তলে যে সকল উৎস লুক্কায়িত আছে, এবং যে সকল

উৎস হইতে ঐ বিচিত্র বর্ণের কার্য্য সকল উৎসারিত হইতেছে, তাহাদের প্রকৃতি কে নির্দ্দেশ করিতে পারে? যেমন কতিপয় বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তি কিয়ৎ পরিমাণে প্রকৃতির সাজঘরে প্রবেশ করিয়াছেন, ও অন্তঃপুরের সংবাদ কিয়ৎ পরিমাণে দিতে পারেন, তেমনি মনোবিজ্ঞানবিৎ দার্শনিকগণ কিয়ৎ পরিমাণে মানব মনের অন্তঃপুরের সংবাদ দিতে সমর্থ। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যে সকল বিষয় লইয়া আলোচনা করে, তাহাদিগকে দেখা যায়, স্পর্শ করা যায়, পরিমাণ করা যায়, ওজন করা যায়, সুতরাং সে সকল গবেষণার ফলসম্বন্ধে অধিক মতদ্বৈধ হইতে পারে না। যতই আমরা প্রাকৃতিক রাজ্য পরিহার করিয়া অন্তররাজ্যে প্রবেশ করি, এবং সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয় মানসিক প্রবৃত্তি ও ভাব সকলকে গবেষণার অধীন করি, ততই নিঃসন্দিগ্ধ ফলে উপনীত হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে। এই কারণে মনোবিজ্ঞানবিৎ দার্শনিকগণ অদ্যাপি ঐক্যমত লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। এতদ্দেশে ও অপরাপর দেশে দার্শনিকদিগের বাদ প্রতিবাদে জাতীয় সাহিত্য পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বহুকাল হইল এদেশে শঙ্কর, কপিল, চার্ব্বাক প্রভৃতি দর্শনকারগণ যে সকল মত অবলম্বন করিয়া বাদ প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, অদ্যাপি ইউরোপখণ্ডে সেই সকল মতের অনুরূপ মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ বাক্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। তাহা হইলেও একথা স্বীকার করিতে হয় যে এই সকল মনস্তত্ত্ব আলোচনার ফলস্বরূপ, মানবাত্মার স্বরূপ ও ধর্ম্মাদি সম্বন্ধে কতিপয় গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা এই সকল তত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞ তাঁহারা

মানব মনের অন্তঃপুরের সংবাদ কিছু জানেন একথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাও যৎসামান্য।

এইরূপ শিল্প-সাহিত্যাদির ও একটা বহিঃপুর ও একটা অন্তঃপুর আছে। মনে কর তুমি কোনও সুচিত্রকরের চিত্রিত একখানি চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আছ; দেখিতে দেখিতে তোমার মন তাহাতে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে; তোমার বোধ হইতেছে দূরে দুইটী পাহাড় দণ্ডায়মান; তাহার মস্তকে নবোদিত সূর্য্যের কিরণ জাল পড়িয়াছে; কিন্তু পাদদেশে এখনও নৈশ অন্ধকারের ছায়া রহিয়াছে; সম্মুখে একটী বহুদূর বিস্তৃত হ্রদ, তাহার নিবাত নিষ্কম্প জলরাশিতে তীরবর্ত্তী তরুরাজি প্রতিফলিত হইতেছে। অথচ সেই সমুদায় ব্যাপার একই পটের এক পৃষ্ঠে অঙ্কিত। তুমি ছবি দেখিতেছ ও মনে মনে তাহার প্রশংসা করিতেছ, কিন্তু অন্তঃপুরের সংবাদ কিছু জান না। যে অদ্ভুত শিল্প-চাতুর্য্যের গুণে ঐ অদ্ভুত ভ্রান্তি উৎপাদিত হইতেছে, তাহার কোনও জ্ঞান তোমার নাই। কতিপয় শিল্পীই জানেন, কি প্রকারে ঐরূপ সমাবেশ নিবন্ধন ঐরূপ কোনওটী দূরে, কোনওটী নিকটে, কোনওটী উচ্চ, কোনওটী নিচু দেখাইতেছে। তাঁহারা যেন চিত্র-বিদ্যার সাজঘরে প্রবেশ করিয়াছেন।

সংগীত সম্বন্ধেও এইরূপ। মনে কর, কোনও স্থানে সুপ্রসিদ্ধ গায়ক ও বাদকগণ সমবেত হইয়া গীতবাদ্যে রত হইয়াছেন; তুমি শ্রোতাদিগের মধ্যে উপবিষ্ট আছ; সেই অপূর্ব্ব তানলয় সম্বলিত সংগীতলহরী তোমার মনে এক

অলৌকিক চমৎকারিত্ব রসের সৃষ্টি করিতেছে। সংগীত-তরঙ্গের কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে তোমার হৃদয়ের ভাবরাশিও যেন আন্দোলিত হইতেছে। তোমার সর্ব্বেন্দ্রিয় যেন এক বিচিত্র সুধারসে আপ্লুত হইতেছে। এইমাত্র তুমি অনুভব করিতেছ, আর অধিক কিছু জান না। কিন্তু যে সংগীত বিদ্যাভিজ্ঞ গায়ক ও বাদকগণ এই অপূর্ব্ব রসের আবির্ভাব করিতেছেন তাঁহারা ইহার অতিরিক্ত আরও কিছু জানেন; তাঁহারা সেই স্বর-লহরীর প্রত্যেক কম্পনের নিয়ম ও প্রণালী অবগত আছেন; অতএব তাঁহারা সেই সংগীতের ভিতর পিঠ দেখিতেছেন।

এইরূপ সকল বিষয়েই। এইরূপ ধর্ম্মেরও একটা বহিঃপুর ও একটা অন্তঃপুর আছে। বহিঃপ্রাঙ্গন হইতে দেখ ধর্ম্ম কতকগুলি অর্থশূন্য ক্রিয়ামাত্র। আমরা অনেক সময় নিকৃষ্ট প্রাণীদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া থাকি। আমরা তাহাদের ভাষা বুঝি না বা মনের ভাব বিষয়ে অভিজ্ঞ নহি। কেবল তাহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাহাদের মানসিক অভাব বা আকাঙ্ক্ষার অনুমান করিয়া থাকি। যখন দেখি কোনও পক্ষী বাসা বাঁধিবার জন্য কুটী বহিতেছে, তখন বলি ডিম পাড়িবার সময় হইয়াছে। তাহার বাসা বাঁধাটা একটা স্বাভাবিক অভাবের জ্ঞাপক। সেইরূপ মনে কর তুমি কোনও অপর-লোকবাসী উন্নত জীব, তুমি দূর হইতে মানবের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছ। তুমি দেখিতেছ কতকগুলি জাহাজ নদীতীরে আসিয়াছে, আর দলে দলে পিপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায়

মানব-শ্রেণী নানা প্রকার দ্রব্য বহিয়া লইয়া যাইতেছে। আমরা পিপীলিকাদিগের খাদ্য বহন দেখিয়া যেমন বিচার করি, সেইরূপ তুমি বিচার করিতেছ, এগুলি ইহাদের খাদ্য অথবা অপর কোন প্রকার প্রয়োজনীয় বস্তু হইবে, নতুবা যত্নপূর্ব্বক বহিয়া ঘরে লইয়া যাইবে কেন? এইরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে তুমি কতগুলি দেবমন্দির, মসজিদ, গির্জ্জা ও অপরাপর প্রকার ভজনালয় দর্শন করিলে। তুমি আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেছ ইহারা এখানে কি করিতেছে? কাহাকে লক্ষ্য করিয়া কথা বলিতেছে? এ ব্যাপারটা কি? এ সকল কার্য্য কোন্ স্বাভাবিক অভাবের জ্ঞাপক? বহিঃপ্রাঙ্গণ হইতে দেখিলে ধর্ম্মের এই সকল ক্রিয়ার ন্যায় অর্থশূন্য ক্রিয়া আর কি হইতে পারে? কিন্তু এই সকল ক্রিয়ার অন্তরালে একটা অন্তঃপুর আছে, একটা সাজঘর আছে, যেখান হইতে এই সকল ক্রিয়া উৎপন্ন হইতেছে। সেই মূলীভূত আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতি কি তাহা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া চিন্তাশীল ভাবুকগণ বিস্ময়ান্বিত হইয়াছেন। এই স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা মানবকে অপরাপর জীব হইতে পৃথক করিতেছে। মানব অনন্ত-মুখীন জীব। এই অনন্ত-মুখীনতা মানবের প্রকৃতি-নিহিত। এই আকাঙ্ক্ষাই শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা বিশ্বাস ও প্রেমে পরিণত হইয়া থাকে। তখন আত্মা সেই পরাৎপর পরম পুরুষে ক্রীড়া করিয়া থাকে ও তাঁহাতেই রমণ করে। এই প্রেমই ধর্ম্মের অন্তঃপুর আর ক্রিয়া ধর্ম্মের বহিঃপুর। ধর্ম্মের অন্তঃপুরে প্রেম, বহিঃপুরে ক্রিয়া; একথা বলিবার

অভিপ্রায় এরূপ নহে যে ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ যাঁহারা জানিয়াছেন তাঁহাদের আর বহিরঙ্গের প্রয়োজন নাই। বৃক্ষের বীজ যেমন কোষ ভিন্ন বাঁচে না, তেমনি ধর্ম্মের প্রাণ-ভূত বিশ্বাস ও প্রীতি ক্রিয়া ভিন্ন প্রায় বাঁচে না; এই জন্য ধর্ম্মভাবের পরিপোষণার্থ আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা, সদনুষ্ঠান প্রভৃতি নানা প্রকার বাহ্য ক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে কেবলমাত্র বাহ্যক্রিয়া থাকিলেই ধর্ম্ম হয় না। যেখানে অন্তরে প্রেম আছে, সেইখানেই বাহ্য-ক্রিয়া ধর্ম্মের পরিপোষক। অন্যত্র ক্রিয়া সকল বরং ধর্ম্মের উন্নতিকে রোধ করিয়া থাকে। যাঁহারা ধর্ম্মের প্রকৃত পথ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা এক দিকে আত্মক্রীড় ও আত্মরতি অপর দিকে ক্রিয়াবান অর্থাৎ সদনুষ্ঠান-সম্পন্ন হন; কিন্তু যাঁহারা কেবল ক্রিয়ামাত্রকেই অবলম্বন করিয়া আছেন, তাঁহারা যেন নিরন্তর ধর্ম্মের বহিঃপুরেই বাস করিতেছেন।

এ জগতে আমরা যত লোককে ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত দেখিতেছি, তাহাদের অধিকাংশই ধর্ম্মের বহিঃপুরে বাস করিতেছে, অর্থাৎ ধর্ম্মের বাহ্য-ক্রিয়া সকলের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহারা বাহিরের প্রাঙ্গণের উত্তপ্ত বায়ুর মধ্যে বাস করিয়া কোলাহল ও বিবাদ বিসম্বাদ করিতেছে। অন্তঃপুরস্থ সুস্নিগ্ধ বায়ু ও নির্ম্মল আলোকে যখন প্রবেশ করিবে, তখন হয় ত ঐ বিবাদ বিসম্বাদ ও উত্তেজনা অনেক পরিমাণে প্রশান্ত হইবে। ধর্ম্মের অন্তঃপুরের এই সুস্নিগ্ধ বায়ু যাঁহারা সম্ভোগ করিয়াছেন ও ইহার নির্ম্মল আলোক যাঁহারা চক্ষে দেখিয়াছেন,

তাঁহারাই ধর্ম্মজীবনের গূঢ় সন্ধান পাইয়াছেন। তাঁহারা ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন না। তাঁহাদের ধর্ম্ম আর শাস্ত্র বা গুরুমুখের উপরে নির্ভর করিতেছে না। শাস্ত্র ও গুরু তাঁহাদের অন্তঃস্থ ধর্ম্মের সাক্ষী ও সহায় মাত্র। তাঁহাদিগকে মরুভূমিতেই রাখ, আর সজন নগরেই রাখ, সর্ব্বত্র তাঁহারা ধর্ম্মে সঞ্জীবিত। তাঁহারা জলপার্শ্বে রোপিত বৃক্ষের ন্যায় সর্ব্বদাই হরিদ্বর্ণ ও সর্ব্বদাই সুন্দর। আমরা যতদিন ধর্ম্মের এই স্থায়ী ভূমি প্রাপ্ত না হই, ততদিন কোনও ক্রমেই সন্তুষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

ভূমিকা।

১৮৯৫ সাল হইতে কয়েক বৎসর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলাম তাহার অধিকাংশ পূর্ব্বে "ধর্ম্মজীবন" নামে নানা খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এবারে যে কয়েক খণ্ডে শেষ হইবে, তাহার প্রথম খণ্ড এই। এখন আমার শরীর রুগ্ন ও ভগ্ন, তাহা না হইলে আরও সন্তোষজনক রূপে মুদ্রিত করিতে পারিতাম; তাহা হইল না। ইতি

১০ই অক্টোবর, ১৯১৩ }
কলিকাতা। }

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।